ভাব-অভাবের গল্প

ভাব-অভাবের গল্প

কল্যাণশ্রী চক্রবর্তী

যোগমায়া প্রকাশনী
৬০ পটুয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৩

প্রকাশক : শ্রীমতী শ্যামলী ঘোষ
এল. আই. জি. বিল্ডিং ।। ব্লক-সি, ফ্ল্যাট-৩
৪৯ নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড। কলকাতা-৭০০০১১

মুদ্রণ : মাদার প্রিন্টার্স / সত্যরঞ্জন জানা
৩৮ এইচ/১৮/১, মানিকতলা মেন রোড
কলকাতা-৫৪

বাঁধাই : ক্যালকাটা বাইণ্ডার্স
১।১এ, ডাঃ অমল রায়চৌধুরী লেন। কলকাতা-৯

রবি রায়

জীবন গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

সূচী □

একটি মিষ্টি মেয়ের গল্প

সত্যিই মিষ্টি মেয়ে। সবদিক দিয়ে। রঙ-এর কথা বললে বলতে হয়—এক কথায়ঃ মিষ্টি রঙ। মুখখানা মিষ্টি, দেহটি মিষ্টি, নামটিও,—লিলি। বেশ মিষ্টি নাম। বিদেশী নাম যদিও, তবু মিষ্টি তো। তবে সবচেয়ে মিষ্টি তার ব্যবহার। কিন্তু ক'জনই বা মিশেছে ওর সঙ্গে তেমন করে, আমাদের বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে! বোঝবার চেষ্টাই বা ওকে করেছে ক'জন। তবে ওর ভাগ্য ভাল, পৃথিবীতে সবচেয়ে যার বেশি করে ওকে বোঝা উচিত, সেই বুঝতে পেরেছে। পেরেছিল সব্বাইয়ের আগে। বুঝবার হয়তো সহজাত শক্তি ছিল তার। মন সন্ধানে সত্যি সে ডুবুরী, সাঁতারু নয়। তা না হলে কতই তো ঝলমলে দ্বীপ ছিল; সব ছেড়ে দারুচিনি বনানী ঘেরা দ্বীপ খুঁজে বার করল কি করে।

আর যাকে নিয়েই হোক, লিলিকে নিয়ে কোনদিন গল্প লিখব তা কল্পনাও করিনি। করা সম্ভবও নয়। সাধারণ মেয়ে। মিষ্টি মেয়ে। ওকে নিয়ে আর যাই হোক, গল্প লেখা যায় না। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। না আছে জীবনের বৈচিত্র্য, না আছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। খাও-দাও, ঘরের কাজ করো, আর করতে হয় করো একটু-আধটু পড়াশুনো। কি-ই বা লেখবার আছে এদের নিয়ে।

এ ভাবনা আমার আগের—অনেক আগের। তখন আমি সবে লেখার মকশ করছি। একেবারে নিভৃতে। আমার পড়ার টেবিলে। পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে। এ বিশ্ব-সংসারে সে খবর কেউ রাখত না, রাখবার কথাও ছিলনা। চরিত্র খুঁজছি। চরিত্র খুঁজছি আর খুঁজছি। চরিত্র সন্ধানে তখন আমি বুঁদ। অনেক মেয়ে-পুরুষই এক বিস্ময় বলে আমার কাছে তখন মনে হয়েছিল। অথচ এরকম কত মেয়ে কত ছেলে দেখেছিলাম, কিন্তু বিস্মিত হবার মতো, অন্ততঃ তখন কিছু দেখিনি তাদের মধ্যে। হয়তো দেখবার মতো চোখ তখন আমার ছিলনা; অর্থাৎ দেখবো বলে মনও ছিল না।

সে সময় একবার মনে হয়েছিল, লিলিকে নিয়ে এবার একটা গল্প লিখি। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখলাম, আর যাকে নিয়েই হোক ওকে নিয়ে অন্ততঃ গল্প লেখা যায় না। ভাল লাগে ওকে, মিষ্টি লাগে, কথা বলায়, হাঁটা চলায়। মাঝে মাঝে মুখে এমন একটা অপরূপ ভঙ্গী কোমলভাবে ফুটে উঠত, ইচ্ছে করত—ইচ্ছে করত তখনি গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরি। জড়িয়ে ধরে,—হ্যাঁ, জড়িয়ে ধরে একটি চুমো খাই। একদিন লিলিকে বলেওছিলাম রসিকতা করে। বলতেই একটু চুপ করে থেকে বলল, তোর যখন খেতে ইচ্ছে করে খাস; আমি এলাও করব তোকে।

—আমার মতো আর কেউ যদি খেতে চায়?

—বিবেচনা করব।

—বিবেচনাটা কি ধরনের হবে?

আমার খেলো প্রশ্নটা শুনে একটু হাসল লিলি, তারপর বলল, অর্থাৎ কোন ছেলে যদি সে রকম সদিচ্ছার প্রস্তাব করে, এইতো?

—অনেকটা।

—কোন্ ছেলের সে সাহস হবে বল? বলে আমার দিকে তাকাল লিলি। তারপর একটু হেসে বলল, কোন্ ছেলেই বা সে প্রস্তাব করবে? কার সঙ্গেই বা আমার তেমন আলাপ আছে। আর সত্যি যদি কেউ চায় তা, তোর কথা ধরে নিয়ে বলছি, আর আমি যদি তাকে এলাও করি, তাহলে আমার কৌমার্যের জয়গান তোরাই তো গাইবি বেশি।

—তুই রাগ করলি?

—রাগ করব কেন। রাগের তো কথা নয়। এতো কথার জন্য কথা। তবে তুই যা প্রশ্ন করলি, সে প্রশ্ন যদি আমি করি?

—আমি ঢালাওভাবে বিতরণ করবো।

এ জানলে কিন্তু কলকাতার ছেলে-বুড়ো সবাই আসবে তোর ওষ্ঠমধু খেতে।

—আমিও আমার ভাঁড়ার থেকে ঢালাওভাবে বিতরণ করে যাব।

—তাহলে দেখবি একসময়, বেমালুম তোর ঠোঁটই নেই।

—তা যাক। কিন্তু তা বলে তোকে অন্ততঃ একজনকে স্বীকার করতেই হবে একদিন।

—বিয়ের পরের কথা বলছিস? হুঁ, অ করতে হবে। উপায় নেই। ওরা বিয়ে করেই ভাবে, বিয়ে করলাম অর্থাৎ মেয়ে উদ্ধার করলাম। আশ্রয় দিলাম, খাওয়া পরা যোগাড়ের জন্য সারাদিন খেটেখুটে এলাম, আর বাড়িতে এসে যদি স্ত্রীর কাছ থেকে একটু ইয়ে না পেলাম, তবে আর কিসের জন্য ইত্যাদি।

কথার ধরনে হেসে ফেললাম। যদিও ও-ও হাসছিল—মিটিয়ে মিটিয়ে। বললাম তুই বড় বেশি ছেলেদের চিনে ফেলেছিস।

আমার কথার ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, মাইরি বলছি পৃথা, ছেলেদের কথা ভাবলে মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় হয়। মনে হয় যেন হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে। কেন হয় বলতে পারব না। তবে হয়। কোন সময় মনে হয়, যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তার কামনার নিঃশ্বাসে আমি হয়তো শুকিয়ে যাব।

—তা সত্যি। অনেক সময় অনেক মেয়ে বিয়ের পর গোলাপের পাপড়ির মতো ঝরে যায়; আবার গাঁদা ফুলের মতো আলো-বাতাস জল পেয়ে ফুলে ফেঁপেও ওঠে।

—বলতে চাস, আমি মোটাও হতে পারি।

বললাম, সাধারণত মেয়েরা বিয়ের জল পড়লে তাইতো হয়।

মধ্যে মধ্যে এ-রকম আলোচনা হতো আমাদের। মধ্যে মধ্যে কেন, প্রায়ই। কুমারী মেয়েদের যেমনটা হয়ে থাকে। কিন্তু এ নিয়ে তো আর গল্প লেখা যায় না।

দ্বিতীয়বার ওকে নিয়ে গল্প লেখার কথা মনে এলো পাঁচ-ছ' বছর পর—এই তো সেদিন। ওকে দেখে। বিয়ে হয়েছে আজ পাঁচ বছর। বিয়ের পর দু বছর এখানেই ছিল। তারপর ওর স্বামী বদলী হয়ে যায় দিল্লী। দিল্লী থেকে আবার এখানে। এই মাস কয়েক হলো ফিরে এসেছে ওরা। এবার দেখে আমার মনে হলো, লিলিকে নিয়ে এখন অন্তত একটা গল্প লেখা যায়। কিছু বৈচিত্র্য— মনের দিক থেকে, এরই মধ্যে লিলির এসে গেছে। যদিও লিলি তা স্বীকার করে না। করবার কথাও নয়। কিন্তু আমার তাই মনে হলো। তাই হালের কথা লিখতে গিয়ে সংযোজন হিসাবে অতীতের কিছু কথা অনিবার্যভাবে এসে যাবেই। রোধ করা যাবে না।

তবু, তাতেও কি একটা গল্প হবে? এটা না হলো নাটকীয়ভাবে আরম্ভ, না হবে নাটকীয়ভাবে শেষ। হয়তো বড় জোর একটা চরিত্র ফুটে উঠবে। মধ্যবিত্ত ঘরের একটি মিষ্টি মেয়ের একটি সাধারণ—অতিসাধারণ মিষ্টি চরিত্র।

এক পাড়ার একই গলিতে আমাদের বাড়ি। পাশাপাশি বাড়ি। ঠিক পাশাপাশি নয়, কাছাকাছি। ওদের আমাদের বাড়ির মাঝখানে আরো খান তিনেক বাড়ি। আমাদের বাড়িটা ঠিক রাস্তার ওপর আর ওদেরটা কয়েক পা ভেতরে ঢুকে। ওদের বাড়িটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল। চারিদিক তার মানুষ সমান উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। গেট দিয়ে ঢুকতেই বড়সড় একটি উঠোন। আমরা যদিও ওটাকে জাম বাগান বলি—এখনো। উঠোনের পুব দিকে ঘেঁষে খুব বড় একটা জামগাছ ছিল। হয়তো এ-জন্যই সবাই এটাকে জামবাগান বলত। এই উঠোন ছিল লিলিদের। ছোটবেলা থেকে এটা আমাদের খেলার তীর্থক্ষেত্র। কত রকমের খেলাই না খেলতাম! এখন সে-সব মনেও করতে পারবো না। তখন হতেই আমি আর লিলি ছিলাম জুটি। অবশ্য আরো অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। তবে এতটা অন্তরঙ্গতা ছিল মাত্র গুটি তিন চারেক—বেনু, রীণা, অতসী, নীতার সঙ্গে। এই উঠোন বা বাগান যাই বলিনা কেন, এখানে আমাদের সঙ্গে সবার খেলার সূত্রে পরিচয় তথা অন্তরঙ্গতা। সেই ছোটবেলা থেকে। কত রাগারাগি, ঝগড়াঝাটি, চুলোচুলি আবার ভাব এই বাগানে বসেই করেছি, ঠিক নেই তার। এই সেদিন—চার-পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত বাগানে খেলেছি। তখন রীতিমত বয়েস হয়েছে। ভনিতা না করে সোজা কথায় বললে বলতে হয়, যুবতী হয়েছি। খেলেছি ব্যাডমিণ্টন।

বড় হয়ে শুধু ব্যাডমিণ্টনই খেলেছি। সমস্ত শীতকালটা জুড়ে। আর কি-ই বা আছে খেলার। আমরা যখন খেলতাম তখন বেশ বুঝতে পারতাম, আশপাশের বাড়ির দোতলা থেকে ছেলে হতে বুড়ো আমাদের খেলা দেখছে। এতে আর বেশ বোঝাবুঝির কি ঃ স্পষ্টই দেখতাম। মাঝে মাঝে চোখা-চোখি হয়ে যেত। চোখাচোখি হতেই ওরা সরে যেতো। বিশেষ করে ছেলেরা—বয়েস-এর ছেলেরা—লজ্জা পেতো হয়তো। মনে নিশ্চয় তাদের

দুর্বলতা ছিল। আর প্রৌঢ়-বৃদ্ধেরা ভাব দেখাত যেন মা-মণিদের খেলা দেখছে। অথচ সবারই চোখে লক্ষ্য করেছি—কি ছেলে কি বুড়োর, যতনা আমাদের খেলা লক্ষ্য করত তারচেয়ে বেশি দেখত আমাদের। চোখ-মুখ নয়। দেখত আমাদের বুক, কোমর, পাছা। বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে। নেহাৎ স্থূলরুচির ব্যাপার। এখন ভাবলে হাসি পায়। হয়তো কখনো একটু লজ্জার ভাবও জাগে। কিন্তু তখন রাগ হতো, বিরক্তি লাগত। কোনদিন লজ্জা করত, অস্বস্তি বোধ করতাম, জানতাম আঁটসাট করে কাপড় পরা, তবু ঘন ঘন বুকের কাপড় টানতে যেতাম এই ভেবে যে ওরা আমাদের বুকের দিকে চেয়ে। কোন কোন দিন লিলিতো লজ্জায় খেলতেই চাইতো না। আমরা অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বশ মানতাম। আবার মাঝে মাঝে কোনদিন বেশ উপভোগও করতাম। খেলার শেষে নিজেদের ভেতরে খুব হাসাহাসি টেপাটিপি করতাম এই নিয়ে, হ্যাংলার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের মাই আর পাছা দেখার ভেতর এমন কি ব্রহ্মসুখ আছে, কে জানে! এসব ভেবে নিজেদের ওজন সম্বন্ধে বেশ একটা কৌতুক শিহরণ অনুভব করতাম। অন্য সময় এদের কাউকে ডাকতাম মেশোমশায়, কাকাবাবু কাউকে আবার অনুদা, কিশোরদা। তখন তাদের ভাবখানা, মা, মা-মণি, বোনটি। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেনা। মনে মনে তখন হাসতাম।

যতদিন এখানে ছিল লিলি ততদিন পর্যন্ত আমাদের জাম বাগানের খেলাধূলা, মেলামেশা অব্যাহত ছিল। ওর বিয়ে হবার পর থেকেই সব ভেঙ্গে গেল। মাঝে মাঝে সেইসব কথা মনে পড়লে মনটা উদাস হয়ে যায়। সেই ছোট বেলার কথা মনে পড়ে যায়ঃ জামবাগানের খেলাধুলো থেকে সবকিছু।

আমি আর লিলি একই স্কুলে পড়তাম। একই ক্লাসে পড়তাম—সেই ক্লাস ওয়ান থেকে। প্রত্যেকদিন স্কুলে যাবার আগে জামগাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকতাম লিলিকে। লিলি আসতো ছুটে। তারপর দুজনে উঠোন পেরিয়ে আরো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ে স্কুলে যেতাম। ধীরে ধীরে এইভাবে কত বছর চিলের মতো হাওয়ায় পাখা মেলে উড়ে গেল,

টেরও পেলাম না। আমরা বেলতলা স্কুল থেকে আশুতোষ কলেজে গিয়ে ঢুকলাম। কত টুকরো টুকরো ঘটনা ঘটে গেছে এরই মধ্যে তা কি সব সত্যি লেখবার মতো!

লিলি বেশি কথা বলত না। রাস্তাঘাটে বেরুলে তো মোটেই নয়। দরকার হলে কথা না বলে তার চেয়ে মুখ বুজে বেশি হাসত। ওতেই যতটুকু ভাব প্রকাশ করা যায়। আমি ওর হাসিটা দেখতাম। বড় মিষ্টি হাসি। মাঝে মাঝে কেন জানি আমি ওর চেহারাটা লক্ষ্য করতাম। মনে হতো, ওর দেহটা মোমের মতো মসৃণ আর হাওয়াহীন মোম শিখার মতো নিটোল উজ্জ্বল অথচ ঠাণ্ডা। আর চোখ দুটো যেন নিস্তরঙ্গ হ্রদের জলের মতো শান্ত ও গভীর। ও ছিল আমার কাছে একজন আর্টিস্টের মডেলের মতো। অথচ ওর দিকে কি ছেলে কি মেয়ে বড় একটা কেউ তাকাত না দেখতাম। আমরা তিনজন—আমি লিলি আর নীতা বেশির ভাগ দিন কলেজে যেতাম। নীতা আর আমার দিকে ছেলেরা বেশি তাকাত,—তাকিয়ে তাকিয়ে যেত। সে তাকাবার আবার কত ধরন। এখন ভাবলে হাসি পায়;—তখনো পেত। মাঝে মাঝে অবশ্য রাগ হতো। পুরুষদের উদ্দেশ্যেই থুতু ছিটোতে ইচ্ছে করত। টেরিয়ে চাওয়া,—যেন আমরা না লক্ষ্য করি। আচমকা সোজাসুজি চাওয়া। ভাবখানা, এমন যেন হঠাৎই এদিকে চোখ পড়ে গেছে। কিন্তু লিলির দিকে কেউ তেমন তাকাত না। আমার কেন জানি এর জন্য দুঃখ হতো। ভাবতাম খাঁটি সুন্দরীকে কেউ চিনলো না।

লিলি কস্‌মেটিক ব্যবহার করতো না। কখনো না। বেরোলে কাপড় পরতো সাধারণ গোছের তাঁতের শাড়ি। পায়ে থাকত স্লিপার। ওর তুলনায় আমি নীতা পারফিউমারী ওয়ার্কসের প্যাকেট বিশেষ। একদিন বললাম লিলিকে, লিলি, তুই একটু-আধটু সাজতে গুজতে পারিস না, পাউডার-টাউডার মাখতে পারিস না?

—কেন! বিস্ময় চোখে তাকাল। পরে একটু হেসে বললো, তবে বুঝি আমায় সুন্দর দেখাবে,—ফর্সা দেখাবে, না?

—হ্যাঁ, তা দেখাবে, খোলাখুলি বললাম। যদিও একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে।

—এতে আমার কিই বা এসে যাবে।

—তোর এতে কিছু আসবেও না যাবেও না; কিন্তু তারজন্যে মাখতে দোষ কি?

—মাখতে যাব কেন? আমার গায়ের চামড়া তো কোন অংশে খারাপ নয়।

—না, খারাপ হবে কেন।

—তা হলে পাউডার মাখতে বললি কেন।

—এমনি। আমরাও তো মাখি, তাই বলছিলাম। এবার আর সত্যি কথাটা বলতে পারলাম না; মুখে জোগাল না। নির্জলা মিথ্যেই বললাম অম্লান মুখে।

—ওঃ।

আবার এই লিলিকেই সাজতে-গুজতে দেখেছি। প্রেমে পড়ে? না, প্রেমে পড়ে না। প্রেমে পড়লে সাজে। কি ছেলে কি মেয়ে। সাজ-গোজ করে ফিটফাট হয়ে থাকে। বিশেষ করে যে সময়টিতে তাদের দেখা হবার কথা। এতে উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ অবশ্যই বাড়ে, সন্দেহ নেই। কিন্তু আবার যদি কোন কারণে কোনদিন বিকর্ষণের কারণ ঘটে, তবে ঐ সাজ-গোজ বা যে গুণগুলি পরস্পরকে প্রবলভাবে একদিন আকর্ষণ করেছিল, সেগুলোও সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ গুলো হচ্ছে তত্ত্বকথা। পড়েছিলাম অনেকদিন আগে এক ইংরাজি ম্যাগাজিনে। লিলিও প্রেমে পড়েছিল একদিন। অথচ তখন একটুও সাজেনি। ভুলক্রমে পাফটাও মুখে কখনো বুলোয় নি। বাড়িতে মিলের সেই আটপৌড়ে শাড়ী আর কলেজ যাবার সময় সেই তাঁতের শাড়ী আর পায়ে সাধারণ স্লিপার। সাজতে দেখলাম সেদিন। ও এখন মা। মা হয়েই সাজতে আরম্ভ করেছে। —সে কি সাজ! দেখে আশ্চর্য হলাম। তখনই আমার মনে হলো, না এবার লিলিকে নিয়ে একটা গল্প লেখা যায়। কিন্তু পরের কথা পরে বলছি।

কলেজে লিলি চুপচাপই থাকতো। যতক্ষণ ক্লাস চলতো ততক্ষণ তো বটেই, অফ পিরিয়ডেও। ও সাধারণত মাঝামাঝি বেঞ্চের এক কোণে বসত। আমার সব সময় ওর কাছে বসা হয়ে উঠত না। হয়ে ওঠা সম্ভবও নয়।

আর নীতা তো কলেজে এসেই আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ। কলেজে আসার পথটুকুতেই যত অন্তরঙ্গতা। তারপর কলেজি গোষ্ঠী। ও আমাদের নয়, অন্য গোষ্ঠীর। যদিও বাড়ি আমাদের পাশাপাশি; কিন্তু স্বভাব-রুচি যাবে কোথায়। ওদের সবচেয়ে যে-আলোচনা বেশি হতো তা ছিল, সিনেমার নট-নটী, শাড়ি, গহনা-ব্লাউজ। আর গুণের মধ্যে ছিল, বেঞ্চে নিজেদের নাম লিখে একটা যোগচিহ্ন এঁকে একটি ছেলের নাম লিখে, সম্ভবতঃ তার পাড়ার কোন আকাঙ্ক্ষিত ছেলে, এমন সব কদর্য কথা লিখত যা ভাবলে কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া সম্বোধনহীন কুৎসিত কথা লিখে রেখে যেত, পরদিন এসে দেখা যেত ছেলেরা ততোধিক উচ্চস্তরের উত্তর দিয়েছে। মনে পড়লে এখন ওদের ওপর ঘৃণা হয়, অথচ ফার্স্ট ইয়ারের অফ পিরিয়ডে হাই বেঞ্চের গায়ে কালি দিয়ে লেখা আর ছুরি দিয়ে কাটা এ সব পত্র পড়ে হাসির কল্লোল তুলে কত সময়ই না কাটিয়েছি! বয়সোচিত যৌন ঔৎসুক্যের উগ্রতা ছিল বলেই হয়তো আমাদের অমন করে টানতো ওদিকে। সোজা কথায় তখন যাকে বলে আমরা ছিলাম নতুন বর্ষার চিংড়ি! অল্পতেই ছরছর করতাম। এখন আমাদের ফোর্থ ইয়ার। অনেক তফাৎ। উচ্ছ্বাস, উৎসাহ অনেক ধীর স্থির হয়ে এসেছে। ফার্স্ট ইয়ারে একটা কিছু উত্তেজনা চাই। উদ্বোধনের চেয়ে উত্তেজনায় ছিল পক্ষপাতিত্ব। এখন উদ্বোধনে।

কলেজ জীবনের কত ঘটনাই না মনে পড়ে। তখন আমাদের ফোর্থ ইয়ার। একদিন নীতাদের দলের একটি মেয়ে—নাম অর্চনা, আমার আর লিলির মাঝে বসেছিল। সে সময় ক্লাস হচ্ছিল, বেশ মনে পড়ে, ফিলসফির। হঠাৎ এক সময় আমার চোখ গিয়ে লিলির ওপর পড়ল। দেখলাম, ও ইশারায় ওর হাত দেখাচ্ছে; অথচ হাত যে ভাবে আছে, সেই এলায়িত-ভাবেই রেখে দিয়েছিল হাই বেঞ্চের ওপর। আমি ওর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি, অর্চনা লিলির হাতের পাশে নিজের হাত রেখে তন্ময় হয়ে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে গায়ের রঙ মেলাচ্ছে। অর্চনার রঙ লিলির চেয়ে কিছুটা গৌর। দেখে কৌতুক বোধ করলাম। করবারই কথা। এ দেখে কে না কৌতুক বোধ করে! আমিও আমার হাতখানা অর্চনার পাশে

রাখলাম। আমার রঙ অস্বাভাবিকভাবে ফর্সা। আমি তা ভালভাবেই জানি। এত গৌর যে, চোখটা আমার একটু কটা মতো আর চুলগুলোও একটু লালচে। আমার হাত ওর হাতে ঠেকতে ও চমকে উঠলো, উঠতে একটু হেসে বললাম, তোর রঙ লিলির চেয়ে একটু ফর্সা; কিন্তু আমার কাছে তোর হাতটা দেখ অর্চনা কেমন কালচে দেখায়! ফিসফিসে গলায় বলেছিলাম।

শুনে সহসা অর্চনার মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। পরে একটু শীর্ণ হেসে বললো, তোর রঙটা ফর্সা বলে দেমাকে তোর মাটিতে পা পড়তে চায় না পৃথা, নারে?

—না, আমার সে বালাই নেই। দেখলাম তুই রঙ মেলাচ্ছিস, তাই বললাম।

অর্চনা কোন উত্তর দেয়নি। দেবার কিইবা আছে।

সেদিন শেষ পিরিয়ডে ছিল ইংরেজী। সওয়া দশটা থেকে এগারোটা। কাজেই ছুটি আমাদের সবার একসঙ্গে। বাড়ি ফেরবার পথে নীতা একসময় বললো, পৃথা তুই নাকি আজ অর্চনাকে কেলেট বলেছিস?

বুঝলাম, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

—অর্চনা বুঝি তোকে তাই বলেছে?

—বলছিল য, তুই নাকি—

—হয়েছে হয়েছে। তুই ওকে বলিস, ওদের সবাইকে ঠুকবার জন্যেই বললাম, লিলি যদি সিনেমায় নামতে চায় তো এখুনি অনেক ডিরেক্টার ওকে লুফে নেবে, আমাকেও। ওর মতো কুমড়োপটাশী চেহারা ঝিয়ের রোলের জন্যও নেবেনা কিছুতে। বলিস, উপস্থাপন করিস তোদের এ্যাসেমব্লিতে। তারপর কি এ্যাক্ট পাশ হয় আমার বিরুদ্ধে, জানাস।

এই ফোর্থ ইয়ারেই যখন পড়ি,—সবে তখন উঠেছি, সে সময় আমার প্রথম নজরে পড়লো! দেখতাম, একটি সুন্দর মতো ছেলে প্রায়দিন বিকেলে লিলিদের বাড়ি আসে। আমার তখন যা বয়েস তাতে কৌতুহল জাগা স্বাভাবিক। তাতে একটি সুন্দর যুবককে নিয়ে। যদিও বয়েস খুব কম মনে হয়েছিল তার। আমার চেয়েও। তবু কৌতূহল বাধা মানে না।

ভাবলাম, জিজ্ঞেস করি একবার লিলিকে। আবার ভাবলাম, থাক। বলবার হলে লিলি নিজেই বলবে। আর তাছাড়া জিজ্ঞেস করলেই বা কি মনে করবে। হয়তো টিপ্পনী কাটতে শুরু করবে। ছেলে দেখলে সেখানে মেয়ে থাকলে অত রস কল্পনা করবার কি আছে। কিন্তু দিন যায়, লিলি কিছু বলবার নামটি করে না। অথচ ছেলেটি মাঝে মাঝে ঠিকই আসছে। আর সইতে না পেরে একদিন কথার মাঝে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা লিলি, ঐ ছেলেটি কে রে?

—কোন ছেলেটি?

মনে মনে বললাম, ন্যাকামি করছো; কিছু জাননা, না। বললাম, ঐ যে প্রায়-দিন বিকেল বেলা আসে। আরে, বলতে বলতেই এসে গেছে: চাপা গলায় বললাম। ততক্ষণে ছেলেটি গেট পেরিয়ে বাগানে ঢুকেছে। ঢুকে আমাদের দিকে চোখ পড়ল। একটু তাকিয়ে মাথা নীচু করে গিয়ে লিলিদের বাড়ি ঢুকল।

—ওঃ, তুই ওরই কথা বলছিলি? ওতো শুভেন্দু: অনলের বন্ধু।

—শুধুই অনলের বন্ধু? ব্যঙ্গ করে বললাম।

লিলি হেসে ফেলল, তবে আমারও বন্ধু হবে নাকি?

—দোষ কি। দেখতে তো এ্যাডনিস। প্রথমে ভায়ের বন্ধু, তারপর নিজের। বন্ধু থেকে বন্ধুত্ব তারপর প্রেমত্ব।

—বলিস কিরে পৃথা! ও প্রেমের বোঝে কি। ও আমায় লিলিদি বলে ডাকে।

—তোকে 'দি' ডাকে বলে যে প্রেম হতে পারবে না, এটা কোন যুক্তি নয়। মানুষের ইতিহাস তা বলেনা। বেট ফেলতে চাও তো ভুরিভুরি প্রমাণ দিতে পারব। তাছাড়া উনিশ-কুড়ি বছরেও যদি সে প্রেমের কিছু না বোঝে তবে তোর এই কুড়ি বছরেই বা কতখানি জেনেছিস?

—আমার কুড়ি বছরে যা জেনেছি ওর তা জানতে তিরিশ বছর লাগবে। মেয়ে-পুরুষে তফাৎ ও-রকমই হয়।

—তা হলে মেয়েরা পেট থেকে পড়েই প্রেম সম্বন্ধে সমঝাতে শুরু করে।

লিলি হেসে বললো, পেট থেকে পড়ে না হোক, খুব অল্প বয়েস থেকেই বুঝতে শুরু করে।

—হু, তাই।

—সে কি, খুব বড় লেখক, যাঁদের আমরা মাথায় করে নাচি, তাদের লেখায় তো পড়েছি, মেয়েরা নাকি ন' বছর বয়স থেকে রসস্থ হতে শুরু করে আর বারো বছরে পেকে ঝুনো হয়ে যায়। একটু থেমে বলতে লাগল লিলি কি জানি কোন দিক লক্ষ্য করে বলেছেন। মনের দিক দিয়ে যদি বলে থাকেন তো কি বলবো ঃ আমি তো চোদ্দ বছরেও তেমন কিছু বুঝতাম না। সাড়ে তের বছরের সময় মাসিক হলো। প্রথম দিন কি ভয়! ভীষণ ভয় পেলাম। কেননা এর কিছুই জানতাম না। শুনিনি কখওন। গ্রামের মেয়ে হলে আলাদা কথা। আমরা শহুরে; তাই মা কোনদিন বলেনি। কি করব ভেবে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলাম। পেট-টেট ফুটো হলো নাকি। মাকে গিয়ে এক সময় চুপিচুপি বললাম। বলতে সে সব বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু কতটুকুই বা তখন বুঝেছি। তারপরও কয়েক বছর ফ্রক পরেছি। দিদি আর দিদিদের মজলিসে তখনও পাত্তা পাইনি। অনেক সময় ওরা বলত. যা তো লিলি, এখান থেকে যা। শুনে তখন লজ্জা হতো, রাগ হতো। অপমান বোধ করতাম এই ভেবে, আমি কিছু বুঝি না, ওরা ধরে নিচ্ছে বলে। মনে মনে বলতাম, আমি আর কিছু বুঝিনা, না। একদিন তো বলেই ফেলেছিলাম, হ্যাঁ, এখন তোমরা অসভ্য কথা বলবে। আমার কথা শুনে ওদের কি হাসি! খিলখিল করে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে দিদি বললো, যা তুই এখন; বেরো এখান থেকে। বুঝলি, এতদূর পর্যন্ত বুঝতাম। আর তুই?

—আমিও ওর বেশি বুঝতাম না। হাসতে হাসতে বললাম।

—আর দেহের দিক দিয়েও যদি লেখকরা বলে থাকেন, তা হলেও বলবো, যোলও ঠিক নয়, আঠার বছরের আগে কোন মেয়ে যথার্থ রসবতী হয় না।

—তা হলে ছেলেরা বিশ বছর বয়সে হাতে খড়ি দেয় নাকি?

—না, তার চেয়েও একটু বেশি। তখন কেবল একটা জিনিসই ভাল

করে বোঝে। অবশ্য সেটা আরো আগে থেকে বুঝতে শেখে বলেই আমার বিশ্বাস।

—সেটুকু বুঝলেই যথেষ্ট।

এরপর কোনখান থেকে কিভাবে লেখা শুরু করা যায়, ভেবে পাচ্ছি না।

তারপর আমরা বি· এ. পরীক্ষা দিলাম। আমার অনার্স ছিল ইংরেজীতে। লিলি-নীতার পাস কোর্স। আমি কোনমতে কেঁদে-কুঁদে ক্লাসটা পেয়ে গেলাম। লিলিও পাস করল। কিন্তু নীতা ফেল করে গেল। আমি ইংরেজী নিয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হলাম; নীতা আবার কলেজে। লিলি আর পড়তে চাইল না।

আমি বললাম, বসে থাকবি লিলি শুধু শুধু। তারচেয়ে পড়াশুনো আরম্ভ কর। এম. এ. টা পাস কর। দু-বছরের তো মামলা। তারপরই তো ক্ষান্তি।

—না, আর ভাল লাগে না। ও বলল।

—লাগালেই লাগবে। কটা আর বছর। বলতে বলতে কেটে যাবে।

—না, আর পারি না।

কেন পারল না, তা ও-ই জানে। পরে অবশ্য আমি একটা কারণ দাঁড় করিয়েছিলাম। কিন্তু তার হয়তো কোন অর্থ নেই।

তারপর বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেছে। তখন জানুয়ারী মাস। শীতকাল। বিকেল বেলা। আমি লিলি জামগাছটার নীচে বসে কথা বলছিলাম। ব্যাডমিন্টন খেলার পর আমরা বাগানে বসে কিছুক্ষণ গল্প করতাম; সন্ধ্যার ঘোর লেগে না আসা পর্যন্ত। খেলার পর বিশ্রামও হতো ওদিকে গল্প-সল্প। রীণা, অতসী, নীতা চলে গিয়েছিল একটু তাড়াতাড়ি। হয়তো সিনেমায় যাবে। আমরা বসে গল্প করছি। কথায় কথায় এক সময় লিলি বলল, তোর সাথে একটা প্রাইভেট কথা আছে পৃথা।

—স্বচ্ছন্দে বলতে পার এখন। প্রাইভেট ভাবেই বসে আছি।

—সত্যি ইয়ার্কি নয়। খুব সিরিয়াস্।

—আমিও।

না তুই এখনো ফাজলামি করছিস। একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে লিলি বলল, দিব্বি রইল, অন্ততঃ আজকে আর কালকে একথা প্রকাশ করবি না। বলে আরো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারলাম, বলবে কিনা দ্বিধা করছে। তারপর একসময় বলেই ফেলল, কাল, আমার বিয়ে।

যেন বোমা পড়ল।

আমার বুকটা ধ্বক্ করে কেঁপে উঠল।

কিছু সময়ের জন্য কথাই বলতে পারলাম না। থ' হয়ে ওর চোখ-মুখ লক্ষ্য করতে লাগলাম ঃ কি বলতে চায় ও—কি বলছে—বলছে যা, তা সত্যি কি-না! চোখ-মুখ দেখে তা মনে হলো না। কথা বলার ধরনেও না। বরং বলার ধরন শুনেই মনে হয়েছিল, বিয়ে যদি হয় তবে ঠিক স্বাভাবিক মতো হচ্ছে না। কিছুটা অস্বাভাবিক। তবু কিছু না বোঝবার ভান করে বললাম, কৈ মাসিমার কাছে বা তোদের বাড়ির আর কারর কাছে তো কিছু শুনিনি এখনো!

—শোনবার তো কথা নয়।

—তবে?

—এখনো কিছু জানানো হচ্ছে না বাড়িতে। বিয়ের পর জানানো হবে।

—সে কি রকম! সত্যি আমার বুক তুরতুর করে কাঁপতে লাগল। আর দম নিতেও কেমন একটা কষ্ট কষ্ট হচ্ছিল।

—শুভেন্দুকে বিয়ে করছি। আলতোভাবে বলল লিলি।

এতে আমার আশ্চর্য হবার কথা নয়। কেননা সবই অনুমান করতে পেরেছিলাম মোটামুটি আগে থেকে। তবু আশ্চর্যবোধ না করে পারলাম না। কেন, কে জানে।

—পরে বাড়িতে অনর্থ ঘটবে না?

—ঘটবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঘটলে আর কি করব। সয়ে নেবেই। ও যদি আমার জন্য বাড়ি-ঘর আত্মীয়-স্বজন ছাড়তে পারে, আমি কেন পারব না। একটু থেমে বলল, আমার আজ হোক কাল হোক এ বাড়ি তো ছাড়তে হবেই।

—কেন?

—বেশ, মেয়ে হয়ে জন্মেছি, একদিন না একদিন শ্বশুরঘর করতে তো যেতে হবেই।

—তা তো হবেই।

এও তো তাই। শ্বশুর বাড়ি না গিয়ে সোজা স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছি।

—তা নয় হলো। কিন্তু তোর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হবে না কেন?

—এ বিয়েয় ওর বাড়িতে মত নেই। সেজন্যই দুঃখ হয়! আমার জন্য ওর সব কিছু হারাতে হবে,—বাড়ি-ঘর আত্মীয়-স্বজন।

—শুভেন্দুর বাবা-মা তোদের বাড়িতে আসেননি?

—অর্থাৎ তাঁরা আমাদের বাড়িতে বয়ে এসে আমাকে কিছু কয়ে গেছে কিনা?

—সাধারণত তাই হয়তো।

—শুভেন্দু আমার সম্বন্ধে কিছু বলে নি। প্রথমে সম্মতি চেয়েছিল। তাতেই তাঁরা ক্ষেপে গিয়েছিলেন। স্বনির্বাচিতা মেয়ে! যখন শুনলেন আমরা অসবর্ণ: আমি বৈদ্য ওরা কায়স্থ, তখন প্রার্থনা একেবারে নাকচ। উঁচু জাতের মেয়ে তারা আনবেন না। স্বঘরের মেয়ে আনবেন। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় পৃথা এখনো এঁদের ধ্যান ধারণা কোথায়!

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপে কাটল আমাদের।

—অনেক বুঝিয়েছি। এ-রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার অনেক আগে। তখন কিছুই বুঝতে চাইত না। বোঝাতে আরম্ভ করলে, অবশ্য আভাসে ইঙ্গিতে যতটা পারা যায়, ওর মুখের ভাব এমন করুণ হয়ে উঠতো, দেখে কেন জানি মায়া হতো। মনে হতো যেন ওকে কোন রকম আমল না দিয়ে তাড়িয়েই দিচ্ছি—ভিখিরির মতো। আবার মাঝে মাঝে কেন জানি রাগও হতো। প্রথম প্রথম কিছু বলত না শুভেন্দু; কিন্তু শেষের দিকে কৈফিয়ৎ চাইত, ঘুরিয়ে কথা বলো না। বলো তোমাকে পেতে হলে আমাকে আরো কি যোগ্যতা অর্জন করতে হবে? দু-একদিন কড়া কথাও শুনিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও ফল হলো না। কড়া কথা যেদিন শোনাতাম ওকে, সেদিন আমার মনও খারাপ হয়ে যেত। নিজের ওপর রাগ হতো। শেষে রাগটা গিয়ে ওর ওপরও পড়ত। কেন বলতে গেলাম ও-কথা;—কেন ও ঘাটাল

আমাকে। আমার সম্মতি দেবার আগের আগের দিনও যখন একই আলোচনার অবতারণা করল, সেদিনও আমি বেশ কড়া করে দু-কথা শুনিয়ে দিই ; এমনকি ওর বয়স-চরিত্র নিয়ে। সমস্ত শুনে ওর মুখখানা এমন হয়ে গেল, যে দেখে আমার ভয় হলো। যাবার সময় বললো, তোমার ভাবনার ধারাগুলো যদি এই খাতেই বইছিল তবে তা আমাকে আগে জানালেই হতো। কথা নয়, যেন এক গুহার ভেতর থেকে ফ্যাস্‌ফেসে উচ্চারণ। শুভেন্দু চলে যেতে আমার ভয় হলো—অনুশোচনা হলো। ভয় হলো, একটা অঘটন কিছু ঘটিয়ে না বসে ; আর অনুশোচনা হলো, কথাগুলো বলার জন্য। কি দরকার ছিল বলার। যখন জানি—মনে মনে, ওকে আমি পছন্দ করি, ভালবাসি আর ও-ও যেটা পুরোপুরি অবগত আমার দুর্বলতা সম্বন্ধে তখন।—ভেবে আমার কান্না আসতে চাইছিল। আর সত্যি চোখের পাতা ভিজে গিয়েছিল। আমাকে না পাবার জন্য এ-জগতে কোন লোকের দুঃখের কারণ ঘটবে এ ভাবনাই আমাকে পাগল করে তুলেছিল। সেদিনই ঠিক করে ফেললাম, শুভেন্দুকে বিয়ে করবো। আমাকে বিয়ে করলে যদি ও সুখী হয় তবে কেন আমি বাধ সাধি। পরদিন শুভেন্দুর অপেক্ষা করতে লাগলাম—অধীরভাবে। কিন্তু ওর আসবার নাম নেই। ক্রমে অস্থির হয়ে উঠলাম। ঘনঘন ঘর বার করতে লাগলাম। আশঙ্কায় বুকের রক্ত আমার হিম হয়ে আসতে লাগল। আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে শান্তা জিজ্ঞেস করল ছোড়দি, কেবল ঘর-বার করছিস কেন ; কি হয়েছে ?

বললাম, কৈ নাতো, কিছু হয়নি তো ! কিন্তু চঞ্চলতা ঢাকবো কি করে ? আমার অবস্থা সম্বন্ধে যে আমিই উদাসীন। কিন্তু অন্যের চোখ এড়াবে কি করে ? অস্থিরতা নজরে পড়বেই। ভেতরের উৎকণ্ঠা কি বাইরে প্রকাশ পাবে না ? অবশ্যই পাবে।

সেদিন আর এলোনা শুভেন্দু। ওরকম ব্যাকুল প্রতীক্ষার মাঝে যদি ও আসত তবে কিভাবে ওকে গ্রহণ করতাম তা এখন বলতে পারব না। তখনও পারতুম না। সারারাত দু-চোখের পাতা জুড়তে পারলাম না। নানান এলোমেলো চিন্তায় কেটে গেল। পরদিন সকালে ভাবলাম অনলকে

দিয়ে ডেকে পাঠাই। কিন্তু পারলাম না লজ্জা আর সঙ্কোচে। কিন্তু সারাদিন গতদিনের মতো ব্যবহার প্রকাশ পেতে লাগল। আজ বুঝতে পারছিলাম সব। সংযত করেও করতে পারছিলাম না নিজেকে। সেদিন শুভেন্দু এলো। তখন সন্ধ্যা। অনল বেড়াতে বেরিয়েছে। আমি ওকে আমার পড়ার ঘরে এনে বসালাম। আশ্চর্য হচ্ছি এখন ভেবে, তখন আমি স্বাভাবিক হয়ে গেছি। একেবারে স্বাভাবিক। অন্যদিনের মতো। আমি বললাম—একটু গম্ভীরভাবে, আমার কালকের ব্যবহার ক্ষমা করো।

দেখে মনে হলো আমার, এ ওর প্রত্যাশার বাইরে।

আমি চেয়ারটা টেনে নিয়ে আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলাম। তবে ও কিন্তু সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললাম, শুভেন্দু!

উঁ। মাথা নীচু করে সাড়া দিল।

একটু দ্বিধা করে বললাম, তুমি আমাকে বিয়ে করলে সুখী হবে?

আমার কথা শুনে ও হাঁ করে তাকিয়ে রইল। কোন কথা বলতে পারল না। কি বলছি যেন বুঝতেই পাইল না।

—তা হলে আমাকে বিয়ে কর। কথা দিলাম।

—আনন্দ-বিস্ময়ে কথা বলতে পারল না শুভেন্দু। হাঁ করে আমাকে দেখতে লাগল। আস্তে আস্তে এই বিহ্বলতার ভাব কেটে গিয়ে অন্য রঙ ফুটে উঠছিল। নাকের বাঁশি দুটো থরথর করে কাঁপছিল। সাধারণত প্রেমিক প্রেমিকারা এ-সময় জড়িয়ে ধরে চুমু টুমু খায়। ওর চোখে-মুখেও সে ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠছিল। আমিও প্রস্তুত ছিলাম সেজন্য। কিন্তু নিজেকে আপ্রাণ চেষ্টায় ও সংযত করল। বেশ বুঝতে পারলাম। হয়তো ভেবেছিল ওরকম কিছু একটা করলে আমি খারাপ ভাবতে পারি, অসন্তুষ্ট হতে পারি। আমি কিন্তু কিছুই ভাবতাম না। স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম। কেননা আমিও যে আগুন। প্রতিটি রোঁয়া অমার উত্তপ্ত। কিন্তু ও কিছুই করল না। নিজেকে সংযত করে নিল। একসময় কি একটা ফ্যাস্‌ফেসে গলায় বলল। তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে আমিও একসময় মিইয়ে গেলাম। একটা অবসাদ এসে

আমাকে ছেয়ে ফেলল। পরে আমার মনে হয়েছিল, হয়তো শুভেন্দু আমাকে বিয়ের আগে পর্যন্ত ছোঁবে না। পিউরিটি।

– তা হলে তুই দয়া করেই বিয়ে করলি? ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলাম।

—দয়া করে কেন; ভালবেসে।

—তোর কথায় তো মনে হয় না।

– মনে হবে না কেন? আমি ভাবতাম ওর কথা। ও আমার জন্য আত্মীয় স্বজন ছাড়বে, ভাবলেই দুঃখ হতো। কতই বা বয়স! শুনলে বিশ্বাস করবি না পৃথা, ওকে আমি পছন্দ করি, হয়তো বা একটু ভালও বাসি এটা বরাবরই বুঝতাম। কিন্তু কতখানি ভালবাসতাম সেটা বুঝতে পারলাম সেদিন, যেদিন ও এলো না। ওকে দেখবার জন্য সেকি আকুলি বিকুলি! সে শুধু আগের কড়া কথা শোনাবার জন্য নয়, তাতে ভালবাসার আন্তরিকতা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম। তখনই বুঝলাম, আমার হয়েছে।

– তা হলে অতটুকু ছেলে প্রেমের কিছু কিছু বোঝে। আগের একদিনের কথা খোঁচা দিয়ে বললাম।

আমার ইঙ্গিতটা দেখলাম ধরতে পেরেছে লিলি। একটু হাসল। বলল, অনেকের বোঝবার ক্ষমতা একটু বেশিই থাকে।

—তা হলে সেই দুর্লভ প্রতিভাধারীদের মধ্যে একজন হচ্ছে শুভেন্দু।

—তারপর শোন। আমার ঠাট্টাটুকু গায়ে না মেখে ফের বলতে আরম্ভ করল লিলি, টলতে টলতে ও যখন বাইরে যাচ্ছে তখন আমি ডাকলাম। বললাম, দাঁড়াও, একটা কথা আছে। কাছে আসতে নীচু গলায় বললাম, কাল থেকে আর যেন তুমি এদিকে এসো না।

আমার কথা শুনে ও চমকে উঠে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি বললাম, তোমার পরীক্ষা প্রায় এসে গেছে। বেশিদিন আর নেই হাতে। এতদিন তো আমার কথাই ভেবেছ; বেশ বুঝতে পারছি। পড়াশুনো বিশেষ হয়নি। এবার মন দিয়ে পড়। এখানে এলেই মন ডাইভার্ট হবে। তোমার এই পরীক্ষার ওপর আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। রেজাল্ট ভাল হওয়া চাই!—তুই তো জানিস পৃথা ও এবার এম. এ. দিচ্ছে।

আমি মাথা নাড়লাম।

—শুভেন্দু একটু হেসে বলল, রোজ নয় নাই এলাম ; একদিন অন্তর একদিন ?

—না। আমি দৃঢ় ভাবে বললাম।

—তা হলে সপ্তায় অন্ততঃ একবার : একটু খানিকের জন্য।

—ওর কাণ্ড দেখে হেসে ফেললাম। বললাম, আচ্ছা, দু-একটা কথার বেশি বলব না। অনলের সঙ্গে গল্প-টল্প করে যাবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা লিলি, বাড়িতে কিছু টের পায়নি ?

—মা ধমকেছিল একদিন। আমি বলেছিলাম, ও আমাকে তো মা দিদি বলে ডাকে।

—তা হোক্, । বয়েস তো ওর-ও হয়েছে।

—আর বিশেষ কিছু বলেনি। ঐ দিদি ডাকটা অনেকখানি কার্যকরী হয়েছে।

—অনলও কিছু বুঝতে পারেনি ? জিজ্ঞেস করলাম।

—মনে হয় কিছুটা ধরতে পেরেছে। কেননা শুভেন্দুর সঙ্গে ওর ব্যবহারটা কেমন যেন পাল্টে গেছে। কেমন একটা অসন্তুষ্ট ভাব।

—তোকে কি শুভেন্দু এখনো লিলিদি বলে ডাকে।

—না। যেদিন কথা দিলাম, তারপর থেকে কিছুই ডাকে না। বলে হাসল লিলি।—তারপর শোন। পরীক্ষা দিয়েই চাকরী জোগাড় করল। ওদের আত্মীয়-স্বজনরা সব বড় বড় চাকুরে বলেই অত তাড়াতাড়ি কাজ পেল। কাল খবর দিল এসে, কোন রকমে পাশ করেছে। সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়েছে। একটা বাড়ি ভাড়াও পাওয়া গেছে। আগামীকাল আমাদের বিয়ে। তাই তোকে বলছিলাম ; কাল তুই আমাদের সঙ্গে থাকবি।

—রেজিষ্ট্রি অফিসে ?

—হ্যাঁ।

—ওখানে আমার যাওয়া কি ঠিক হবে ? আমি মেয়েমানুষ তো।

—তাতে কি ; তুই আমার বন্ধু হয়ে উপস্থিত থাকবি।

আমি স্বীকার করলাম। দেখতে কৌতূহল হয় বইকি।

বাড়িতে এসে কত কথাই না ভেবেছিলাম সেদিন। কল্পনা কন্ধে থই

পাচ্ছিলাম না কি করে লিলি শুভেন্দুর প্রেমে পড়ল, লিলির প্রেমে শুভেন্দু। কিভাবে তুজন তুজনের কাছে মেলে ধরেছিল। একদিনে নিশ্চয়ই নয়। ধীরে ধীরে। কিন্তু তবু সেই এগিয়ে যাবার পথ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। যত ধীরেই হোক্, তুজন নিশ্চয় বুঝতে পারছিল, তাদের সম্পর্ক দিন দিন এক নতুন পথ নিচ্ছে। তখন তাদের আচরণ কিরকম ভাবে প্রতিভাত হতো পরস্পরের কাছে। কিভাবে প্রকাশ পেত ওদের মুখে। কে প্রথম বলল, ভালবাসি। নিশ্চয়ই শুভেন্দু। তখন লিলির মুখখানা কেমন হয়ে উঠেছিল। না, ভেবে কিছু কূল কিনারা পাওয়া যায় না। কিন্তু ভাবতে বেশ ভাল লাগে। নিশ্চয়ই মিষ্টি-মধুর কল্পনা।

রাতে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর মনস্থির করলাম লিলির সঙ্গে যাব না। যাওয়া আমার ঠিক হবে না। লিলি হয়তো তুঃখ পাবে। পাওয়াটা স্বাভাবিক। তা পাক। কি আর করা যাবে। রেজিস্ট্রি অফিসে নিশ্চয়ই লোক থাকবে—লোক আসবে। এবং তারা হবে নিশ্চয়ই পুরুষ মানুষ—শুভেন্দুর বন্ধু। কম করেও তিনজন তো থাকবেই। সাক্ষী হিসাবে। তার মাঝে আমি মেয়েমানুষ তেমন স্বস্থবোধ করব না। আর তা ছাড়া কেমনই বা দেখাবে। তবু লিলির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। বলেছিল তুপুরে আসবে।

তুপুরেই এলো লিলি। কিন্তু একি! দেখে আশ্চর্য হলাম। আমার মতো হলে সবাই আশ্চর্য হবে। সেই সাদামাটা সাজ-পোষাক সাধারণ তাঁতের শাড়ী আর পায়ে স্লিপার। খস্‌খসে মুখ—পাউডারের কণাটি পর্যন্ত লেগে নেই। প্রতিদিনের প্রতি সময়ের সাজ-পোষাক। দেখে মনে মনে বিরক্ত হলাম। বিড়বিড় করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, বাড়াবাড়ি—আদিখ্যেতা। মনে মনে নিশ্চয়ই অহঙ্কার আছে লিলির ঃ একটি পুরুষের—অন্ততঃ পৃথিবীর একটি পুরুষের সে আজ প্রাণবল্লভা। অথচ বাইরে দেখাচ্ছে, সে একেবারে নিরহঙ্কার। আসলে কিন্তু এইটেই অহঙ্কার। তা না হলে আজকের মতো এমন দিনেও একটু না সেজে পারল কি করে! ভাবলে আশ্চয লাগে বইকি। কাছে আসতে বললাম, বোস।

লিলি বসলো। আমার টেবিলের ওপর। ঠিক বসা নয়। একে বসা বলা যায় না। পা দুটো আড়াআড়ি করে পাছার ওপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

বললাম, ঠিক হয়ে বোস।

—ঠিক আছে। তুই তৈরি হয়ে নে। তোর তো এখনো কিছু হয়নি!

—হচ্ছে ; কিন্তু একি! ফিস্‌ফিসিয়ে বললাম।

—কি? বিস্মিতভাবে তাকাল আমার দিকে লিলি

—এই সাদাসিধে ভাবেই যাবি নাকি?

—কেন?

—এই দিনে এভাবে যাওয়া কি ঠিক হবে? একটু সেজে-গুজে গেলে হতো না?

—কেন, প্রয়োজন আছে?

—আছে বইকি। আজ হয়তো শুভেন্দু তোকে অন্য সাজে অন্যভাবে আর এক চোখে দেখতে চায়। চাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সত্যি, ইয়ার্কি নয়। তা ছাড়া ওর বন্ধু-বান্ধবও তো থাকবে সেখানে।

—কিন্তু লজ্জা করে।

—এটা তোর বড্ড বাড়াবাড়ি।

—দেখ, সত্যি বলতে কি, লজ্জিতভাবে হেসে ধীরে ধীরে বলতে লাগল লিলি, আজ আমারও একটু সাজতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু লজ্জা করতে লাগল সত্যি, আর ভয়ও হলো, পাছে শান্তা কি মা সন্দেহ করে—ধরে ফেলে।

—ধরতে পারতেন না। এ কেউ ধরতে পারেন নাকি! যেভাবে চুপচাপ আঁটঘাট বেঁধে বিয়ে করছিস! সাজতে দেখলে আজ তোর মা কৌতুক অনুভব করতেন—কৌতুকে হাসতেন আর শান্তা বড় জোর ক্ষেপাত, সাজছিস যে বড় ছোড়দি। বেশ তো এটা তোদের বাড়ি নয়, আমাদের বাড়ি কেউ দেখতে পাবে না, আমি সাজিয়ে দিচ্ছি।

—না না, সত্যি বলছি।

—সামান্য সাজাব, একটু পাউডার আর চোখে কাজল। আমি আজ তোকে ছাড়ছি না। তাছাড়া, শুভেন্দু না ভাবুক, ওর বন্ধুরা ভাববে কি।

—যা ইচ্ছে তাই ভাবুক ; আমার কিছু আসবেও না যাবেও না।

—যদি শুভেন্দু কিছু ভাবে ?

—দেখ পৃথা, এতদিন যদি আমাকে শুভেন্দুর ভাল লেগে থাকে আজও লাগবে—না সাজলেও।

—পুরোপুরি অহংকার।

—বেশ তো সাজ। সহসা একেবারে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ।

—ভেবেছিস, এ বললে আমি তোকে ছেড়ে দেব—অভিমান বা রাগ করেছিস ভেবে।

লিলি হেসে বলল, তা কেন, বললামই তো। তবে তাড়াতাড়ি, শুভেন্দু তিনটের সময় বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

—শুধু তিনটে না। তুই না যাওয়া পর্যন্ত থাকবে।

তারপর লিলিকে আমি সাজিয়েছিলাম। —না তেমন কিছু নয়। নতুন কোন শাড়িও পরাইনি আর আমার কোন গয়নাও নামিয়ে পরাইনি। কাপড় গয়না যা পরে এসেছিল তাই রইল। কেবল তার হেরফের ঘটালাম। মুখে-গলায় হাল্কাভাবে লাগালাম পাউডারের পাফ আর সামান্য ফেস-পাউডার, চোখে সরু করে কাজল, চুল খুলে দিয়ে নতুন করে ডোনাট খোঁপা।

যখন ধীরে ধীরে সাজাচ্ছিলাম তখন ও উস্‌খুস্‌ করছিল। দেখে হাস-ছিলাম মনে মনে। বুঝছিলাম, কেন। বললাম, ভয় নেই, তোর স্বয়ম্বরার সময় উৎরে যাচ্ছে না। অত তাড়াতাড়ি কিছু নেই। আড়াইটেও বাজেনি। এখান থেকে বড় রাস্তায় যেতে বড় জোর মিনিট পাঁচেক।

—না না—।

—না না কিরে। লজ্জার কি, এ-রকম সববায়ের হয়, বিশেষ করে এমনি দিনেঃ আমারও হতো। এই দিনে সময়ের ঠিক থাকে না—সময়ের তাল পাওয়া যায় না হাল্কা গলায় বললাম।

সাধারণ সাদামাটা সাজ—একেবারেই। সাজিয়ে-গুজিয়ে আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখতে লাগলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়েঃ আমার নিপুণ হাতের কাজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে একদৃষ্টে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে জন্‌ডিস হবার কথা আর লক্ষ্য বস্তু বিব্রতবোধ করবার। যখন সেটা পার্থিব কোন জড় বস্তু নয়, মানুষ। কিন্তু আমার জন্‌ডিস হয়নি বটে,

তবে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। অন্যে হয়তো ভাল দেখবে—হয়তো কেন, ভালই দেখবে। আমিও খারাপ দেখছিলাম না—ভালই দেখছিলাম; তবু কি যেন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কি যেন হারিয়ে গেছে লিলি থেকে। এই ভাবনাটাই আমাকে বিস্বাদ করে তুলতে লাগল: কি হারাল? অথচ এই একটু আগেও তো সেই লিলিই ছিল। অন্য-দিনের সঙ্গে কোন প্রভেদ ছিল না। সাজানোর পর আর ঠিক তেমন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সামান্য পাউডার, কাজল আর কাপড়—কবরীবন্ধনের হেরফেরের মধ্যে হারিয়ে গেছে। মনকে যুক্তি দিলাম: অনভ্যস্ত চোখ। কেননা কোনদিন দেখিনি লিলিকে সাজতে। তাই অমন বেমক্কা লাগছে।

তবু মন সায় মানল না: এটা কোন যুক্তি নয়। সুন্দর দেখছি অথচ সে সৌন্দর্য দেখে তৃপ্তি পাচ্ছি না ভাবতে ভাবতে একসময় কারণটা যেন আঁচ করতে পারলাম। খুশীতে মনটা ঝলমল করে উঠল।—মিষ্টি মেয়ে তার মিষ্টত্ব হারিয়ে ফেলেছে ঐ পাউডার আর কাজলের আড়ালে। ওর স্বাতন্ত্র্যই লোপ পেয়েছে শেষ হয়েছে: আর পাঁচজনের মতো। আমার মনে হতে লাগল লিলি যেন কতকগুলো বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। দেখে কষ্ট হতে লাগল!

—হলো তোর? বিরস কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লিলি।

আমি চমকে উঠলাম। বললাম, হ্যাঁ হয়েছে, চল। এরই মধ্যে আমার মনস্থির করে ফেললাম।

—তুই তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নে।

—আগে তুই একবার আমার সঙ্গে আয়।

—কোথায়? ১৮

—বলছি, আয় না। বলে ওকে নিয়ে এলাম বাথরুমে। বললাম, মুখ-হাত ধুয়ে আয়। ভেতরে সাবান আছে।

লিলি আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

একটু হেসে বললাম, একটু সাজে তুই কেমন জানি হারিয়ে গেছিস—পাল্টে গেছিস। তোর সাদাসিদে সাজই ভাল। বলেই মনে হলো কথাটা বলা ঠিক হয়নি। লিলি দুঃখ পাবে হয়তো। পাবারই কথা। মেয়ে

মাত্রই দুঃখিত হয়। এ-কথার অর্থ হলো, পক্ষান্তরে বলা, তোকে সাজলেও ভাল দেখায় না। লিলির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালাম। তাকিয়েই নিশ্চিন্ত হলাম। বুঝলাম, আর যার বেলাই হোক লিলির বেলা এ তত্ত্বটা খাটে না। মনে হলো, লিলি বরং এতে খুশীই হয়েছে।

ঘরে এলে বললাম, তোর চুলটুল ঠিক করে বাঁধ, আমি তাড়াতাড়ি কাপড়টা পরে নেই। একটু থেমে চিন্তা করে বললাম, লিলি?

—কি।

—তোর সাথে আমার না যাওয়াই ভাল।

—কেন!

—কিছু মনে করিস না; তুই-ই ভেবে দেখ: অতগুলো পুরুষ মানুষের মাঝে আমার যাওয়া—।

—আমার বন্ধু হিসাবে তো যাচ্ছিস।

—তা তো যাবই; কিন্তু ও রকম পরিস্থিতিতে আমার মতো কুমারী মেয়ে—।

—তখনো আমি কুমারী থাকব।

—কুমারী সত্যি; কিন্তু স্বয়ম্বরা। তখন কুমারীত্ব ঘোঁচাবার আয়োজন সেখানে। হেসে বললাম।

তবু চল।

—না, তা হয় না।

—ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা সবাই মিলে একটা হোটেলে যাব ঠিক করেছি, শুভেন্দু সেখানে সিট রিজার্ভ করে রেখেছে।

আমি হেসে বললাম, এটা তোর ছেলেমানুষী হচ্ছে: আমাকে তুই খাওয়ানোর লোভ দেখাচ্ছিস। ঠিক আছে, আমারটা আমি পরে একদিন বুঝে নেব।

বেশ, লজ্জিতভাবে হেসে লিলি বলল, তবে বড় রাস্তা অব্দি চল।

—নাই বা গেলাম। এখন তোর সাথে বেরোলে যদি তোর বাড়ির কেউ দেখে ফেলে?

—দেখবে, তাতে কি। তাহলে তো নিশ্চয়ই তোদের বাড়ি থেকে রাতে ডাক পড়বে। তখন কি বলব?

—বলবি সত্যি কথা। তখন তো আর কারুর কিছু করবার থাকবে না। একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, এখন না গেলেও তোর খোঁজ পড়বে।

রাস্তায় নেমে আমাদের কোন কথা হলো না। নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। কি-ই বা বলার আছে। অযথা কুঁদিয়ে কুঁদিয়ে কতগুলো কথা বলার কোন অর্থ হয় না। এখন নীরব থাকার সময়—নীরবে মন প্রস্তুত করার বা স্মৃতি রোমন্থন। আমি কিন্তু মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করছিলাম। পাড়ার কেউ কি ভাবতে পারছে কি হতে যাচ্ছে। অবশ্য আমাদের চেনাশুনোদের মধ্যে। আমাদের দেখে বড় জোর ভাবছে বেড়াতে বেরিয়েছে।

দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েছিল শুভেন্দু। কেন না ও এই দিকেই চেয়েছিল। আমরাও লক্ষ্য করেছিলাম। আমাদের দেখতে পেয়ে ও এদিকে এগিয়ে আসছিল. কিন্তু কি ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হয়তো আমাকে দেখে। প্রথমটা অত লক্ষ্য করেনি। না করাই স্বাভাবিক। আর আমাকে দেখবে ও সেটা আশা করেনি। কাছে আসতে শুভেন্দু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ লজ্জা পেয়েছে। আমি বললাম, আরো দেরি করছেন কেন, গাড়ি ডাকুন।

—তুইও চল পৃথা। লিলি বলল।

—না, তা হয় না।

গাড়িতে গিয়ে উঠল ওরা। সেলুনের সাটারের কাছে মুখ নিয়ে হেসে বললাম, শুভেচ্ছা রইল। পরে অভিনন্দন জানাব।

ওদের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে মন্থর গতিতে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। বাড়ি ফিরে আসার হাঁটাটুকুই মন্থর হয়নি, ধীর মন্থর হয়ে উঠেছিল আমার চিন্তাধারাও। কিছুই যেন ভাবতে পারছিলাম না, তেমন ইচ্ছাও করছিলাম না।

আমার ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে চুপচাপ বসে রইলাম। কিন্তু কতক্ষণ আর চুপচাপ থাকা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলাম। ভূতের মতো তো আর চুপচাপ একা একা বসে থাকা যায় না। ভেবে কিছু করার আর না পেয়ে একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু পড়ব কি?

ভাবতে লাগলাম শুভেন্দু আর লিলির কথা। অতীত থেকে এই বর্তমান পর্যন্ত। মনে করতে লাগলাম কবে প্রথম শুভেন্দুকে দেখেছি এবং কতবার —কি কি ভাবে আর লিলিকেও। ছেঁড়া ছেঁড়া এলোমেলোভাবে ভাবতে লাগলাম, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা ওদের জায়গা মতো পৌঁছে গেছে। আরো কিছুক্ষণ—এদিক-ওদিক কিছু ভাববার পর : ওরা হয়তো এখন বেশ একখানা বড়সড় ঘরে বসে ল-ইয়ারের নির্দেশ মতো লিখছে আর হয়তো বা মুখে বলছে, আমি শুভেন্দু বসু.........বৈধ স্ত্রীরূপে........., আমি সীমা (লিলি) দাসগুপ্ত বৈধ স্বামী রূপে.........। আর শুভেন্দুর বন্ধুরা নিশ্চয় একে একে স্বীকৃতির স্বাক্ষর রাখছে। মনে মনে আমি যেন দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। বেশ একটা তৃপ্তির হাসি হাসতে লাগলাম : এখন লিলি দাসগুপ্ত নয়, লিলি বসু। ভাবনাটা মনে আসতে উত্তেজনায় উঠে বসলাম। উঠে বসেই বুঝলাম রাত হয়েছে। তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

বাইরে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ আমার খেয়াল হলো। এতক্ষণ এদিকটা আমার মনেও আসেনি—ভাবিওনি। সময়টা যেভাবেই হোক কেটেছে। কিন্তু এবার ? এবার তো রাত হয়েছে। আর কিছুক্ষণ পরেই তো মাসিমা মেসোমশায় লিলির জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বে। হয়তো এখনই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। খোঁজাখুঁজি করতে বেরুবে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। কিন্তু কোথায় খুঁজবে—খুঁজবে কোথায় ? বাইরে তো কিছু বলতেও পারবে না। মেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে, এত রাতেও মেয়ে তার বাড়ি ফেরেনি বলবেন কি করে মানুষের কাছে। নিশ্চয় আমার কাছে একবার আসবেন চুপিসাড়ে। ভাব দেখাবেন হয়তো কিছুই হয়নি—এমনি জিজ্ঞেস করছেন। তাই নয় হলো, কিন্তু তখন আমি বলব কি ? লিলি অন্ততঃ আজ কিছু বলতে বারণ করেছিল। অবশ্য পরে বলতে বলেছে। কিন্তু ওর মনের ইচ্ছা ছিল না, বলা। ওদের কাছে যদি সত্য না বলি তবে তো সারা রাত দুশ্চিন্তায় কাটাবে ওরা। কি করা যায় ? ভেবে কিছু ঠিক করতে পারলাম না। ঘরে ফিরে এসে চেয়ার টেনে নিয়ে পড়ার টেবিলের কাছে চুপচাপ বসলাম। যত রাত এগোতে লাগল আর আমার বুকের ভেতর টিপ টিপ

তত বেশি করতে লাগল। এই বুঝি আসে, এই বুঝি আসে কেউ। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল কেউ যেন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে। কিন্তু কিছুই না। একটা মানসিক উত্তেজনার মধ্যে সময় কাটতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও মনটা অন্য কোন দিকে ফেরাতে পারলাম না।

এক সময় শুনতে পেলাম:

—ঘরে আছে?

আছে। কেন এত রাতে আবার কি দরকার পড়ল, বইটই নাকি? মার কণ্ঠস্বর।

—না—হ্যাঁ।

—ওর ঘরেই আছে, যাও।

তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পায়ের শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ন'টা বাজে।

শব্দটা এসে দরজার কাছে থামল কিন্তু আমি মুখ ফেরালাম না।

—পৃথাদি? অনল ডাকল।

শুনে আমার হৃদপিণ্ডটা সহসা বুকের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়ে ধ্বক্ ধ্বক্ করতে লাগল। আগেভাগে টের পেয়েও সামলাতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বললাম, ও অনল, এসো।

অনল ঘরে ঢুকলো।

—এত রাতে, কি মনে করে?

—একটা কাজে এলাম। একটু দ্বিধা করে বলল, আচ্ছা তোমার সাথে দিদির আজ দুপুরে দেখা হয়েছে?

—কেন রে? কিছু না বোঝার ভান করে জিজ্ঞেস করলাম।

—না, এমনি। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, দুপুরে বেরিয়েছে এখনো বাড়ি ফেরেনি।

—কেন কোথায় গেছে?

—কিছুই তো বলে যায়নি।

—তা হলে আসবে এখন। সিনেমায় গেছে হয়তো।

—সিনেমায় গেলে এতক্ষণে নিশ্চয় ফিরত। ম্যাটিনী নয় নাই ধরলাম,

ইভিনিং শো-ও তো অনেক আগে শেষ হয়েছে।

—তা হলে!

—তাই তো বাবা-মা চিন্তা করছে। তা-ছাড়া কোনদিন ছোড়দি না বলে এমনি রাত করেনি।

আমি চুপ করে রইলাম। অনলও। ভাবতে লাগলাম: কি করা উচিত। উচিত হবে কিনা এই মুহূর্তে সত্যি কথা জানান। বললে পরে এখন এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে। যা হবার তা' তো হয়েই গেছে। চুকেবুকে গেছে সব। না বললে হয়তো ওরা আরো দুশ্চিন্তায় সারা রাত কাটাবে। হয়তো কেন, নিশ্চয়। কত কি ভাববে: কত রকম ভাবে। শত হলেও মেয়েমানুষ তো। আর যখন লিলির আসার কোন সম্ভাবনা নেই তখন বলাই ভাল। না হলে থানায় হয়তো খবর দেবে। দেওয়া স্বাভাবিক। তা'তে আরো কেলেঙ্কারি পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। সাত-পাঁচ ভেবে বললাম, অনল!—তুমি জান না?

—কি! বিস্মিতভাবে অনল তাকাল আমার দিকে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারলাম না। পরে একটু দ্বিধা করে বললাম, শুভেন্দুর সাথে লিলির আজ বিয়ে হয়েছে। বাধো বাধো ভাবে বললাম। আর কথাগুলোও বলতে আমার গলা থর থর করে কাঁপছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু চেষ্টা করেও তা রোধ করতে পারছিলাম না। তারপরই আমায় একটা ভোঁতা অনুভূতিতে ছেয়ে ফেলল। কোন কথা বলতে পারছিলাম না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম অনলের দিকে। ও-ও আমার দিকে সাদা বোবা চোখে তাকিয়ে ছিল। যেন আমার কথা কিছুই বুঝতে পারেনি। চুপচাপ সময় কাটতে লাগল। ঘরের ভেতর প্রদোষের হেমন্ত-প্রান্তরের নৈস্তব্ধ্যের মতো। কিছু সময় পর অনল নিঃশব্দে উঠে চলে গেল। আমিও কোন কথা বললাম না আর: ইচ্ছে করছিল না। কি দরকার কতগুলো কথা বলে। আর এ-সময় কি কথাই বা বলা যায়।

অনল চলে যেতে আমার ভয় হলো। যদিও মনে মনে নিজেকে আশ্বাস দিচ্ছিলাম, ভয় অকারণ তবু তা এড়াতে পারছিলাম না: এখন যদি লিলির

বাবা আমাকে ডেকে পাঠান বা এখানে এসে জিজ্ঞেস করেন, তুমি আগে থেকেই যখন জানতে তখন আমাদের বলনি কেন ? কি উত্তর দেব তখন। মিথ্যে করে যদি বলি, তুপুরবেলা যাবার আগে আমাকে জানিয়েছে। বিশ্বাস করবেন না। তবু বলবেন, তখন জানাওনি কেন ? আর বাবা-মা শুনেই বা আমাকে কি বলবেন।

ভয়ে ভয়ে প্রহর গুণছিলাম। কিন্তু কিছু হলো না। কেউ আমাকে ডেকে পাঠালও না, এসে কিছু জিজ্ঞেসও করল না। পরদিনও কেটে গেল উদ্বেগের মধ্যে। তার তুদিন পর বিকেল বেলা লিলির বড় বোন—সুধাদিকে দেখতে পেলাম। বুঝতে কষ্ট হলো না, খবরটা শুনে তাড়াতাড়ি শ্বশুরবাড়ি কেষ্টনগর থেকে ছুটে এসেছেন। আশঙ্কা করছিলাম তিনি আমার কাছে আসবেন ; কিন্তু এলো অনল। সন্ধ্যার পর অনল আমার কাছে এসে হাজির। এসে জিজ্ঞেস করল, পৃথাদি, এখন ছোড়দি কোথায় আছে জানেন ?

—না ঠিক জানি না। শুভেন্দুর বাড়িতে খোঁজ নিয়েছ ?

—নিয়েছি। ওখানে ওদের জায়গা হয়নি।

—তা জানি।

—তবে ?

ওরা বাড়ি ভাড়া করেছে এই ভবানীপুরে,—পদ্মপুকুরে। একবার লিলি যেন বলেছিল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে। খুঁজে পেতে বেশি কষ্ট হবে না।

—আচ্ছা অনল, সুধাদি এসেছেন না ?

—হ্যাঁ, আজ এসেছে।

—তোমরা লিলির খবর পাঠিয়েছিলে বুঝি ?

—না তো। দিদি এমনিই বেড়াতে এসেছে। তবে ছোড়দির কথা শুনে তো অবাক।

—হুম্। বলে চুপ করে রইলাম। অন্ততঃ এই শব্দটি ছাড়া আর কথা আপাতত খুঁজে পেলাম না। অনলও একটুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে চলে গেল।

ভেবেছিলাম অনল হয়তো কিছু বলবে। বলবে ওর ছোড়দি সম্বন্ধে। ছোড়দির পাগলামির কথা।—কি পাগলামি করল দেখুন তো। শেষ পর্যন্ত শুভেন্দুর—! না কিছু বলল না অনল; চলে গেল। বললে ভাল হতো ঃ তেমন কিছু খারাপ লাগত না। আমিও তৃপ্তি পেতাম। অনলকে আজ আমার বেশ বড় বড়ই মনে হতে লাগল। কিন্তু অনল চলে গেল।

দিন কাটতে লাগল। পাড়ায় জানাশোনাদের মধ্যে কারুর জানতে বাকি রইল না ঘটনা। কানাকানিতে মৃদু ফিসফিসানিতে আলোচনাটা কয়েকদিনে গাঁজিয়ে উঠল। এবং সেটা স্তিমিত হয়ে এলো। শুধু তাই না, এক সময় অতি পুরনো ভাষায়, কালের নিয়মে ভুলেই গেল। এমনকি মোটামুটি আমরাও। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে পড়ত। ভাবতাম আর মনটা উদাস হয়ে যেত কখনো-সখনো। সে বেশির ভাগ শুধু স্মৃতি রোমন্থন। ঠিক এমনি সময় একদিন লিলি আর শুভেন্দুকে দেখলাম। দেখলাম ওদের—লিলিদের বাড়ি। আশ্চর্য হলাম দেখে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে আমাদের মতো সমাজে এ রকম বিয়ে তা আবার মা-বাবাকে না জানিয়ে। কি ফলাফল হয় তা অন্ততঃ দু-একটা তো দেখেছি। মনটা ঔৎসুক্যে ভরে উঠল। কি দাঁড়াল গিয়ে ব্যাপারটা। মাসিমা মেসোমশাই কি ওদের প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছেন না অন্য কিছু। লিলির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কেননা লিলি আর কারুর কাছে যাক আর না যাক অন্ততঃ আমার কাছে একবার আসবে—যেভাবেই হোক তা স্বতঃসিদ্ধ। ও এলে তখন সব কিছু শোনা যাবে—এতদিন যা কিছু জানিনি এবং ওর মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি সম্বন্ধেও।······নিশ্চয় লিলির মা-বাবা ভালভাবে গ্রহণ করেছে। তা না হলে ওরা আসবে কেন। নিশ্চয় ওদের ক্ষমা করে নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছে, না হলে আসতে সাহস পাবে কেন।—না এদিক দিয়ে মেসোমশায়-মাসিমাকে উদার বলা যায়। যা পারল না শুভেন্দুর বাড়ির লোকেরা তা তাঁরা করলেন। ওরা কি-ই বা অন্যায় করেছে। আজ যা এতটা চোখে লাগছে বিশ বছর পর এটা তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তার স্পষ্ট আভাস তো এখনই পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য যা

অনুমান করে এখন গর্ববোধ করছি আসলে হয়তো সেরকম কিছু নয়। লিলি-শুভেন্দু হয়তো এসেছে কোন গুরুতর কাজে। আমি অস্থির আবেগে অপেক্ষা করতে লাগলাম লিলির জন্য। অনেক মুহূর্তই কেটে গেল, কিন্তু লিলি এলো না। মনে মনে আশ্চর্য হলাম যখন চোখের ধার দিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল। যদিও আমাকে লক্ষ্য করেনি। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর সরে এসেছিলাম। এমনি যখন এলোনা তখন নিজেকে দেখিয়ে মনে করিয়ে দিয়ে তবে ডেকে আনব? নিজের ওপর একটা অহঙ্কার ছিল ওকে নিয়ে, আমি ওর একমাত্র বন্ধু। শুধু বন্ধু নয়, শুভানুধ্যায়ী। ও-ও তাই বলে মনে করত। অভিমান হলো। হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সারাটা-দিন বিবশ ভাবে কাটল। শুধু লিলিকে নিয়েই ভাবলাম।—বিয়ে হলে মানুষের এরকমই হতে হয় নাকি! এ অনেকটা বেলাহাজের মতো। আবার মনকে অন্য ভাবে বুঝিয়েছি, নিশ্চয় কোন দরকার ছিল যার জন্য একদম আসতে পারেনি।

তার ঠিক দুদিন পরে আবার লিলি-শুভেন্দুকে দেখলাম। দুপুর বেলা। আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমার ঘর থেকে কতকটা বেশ পরিষ্কার দেখা যায় লিলিদের বাড়ি ঢোকবার পথটুকু অব্দি। দেখলাম শুভেন্দু আর লিলি ওদের বাড়ি ঢুকছে। মন আর আজ তেমন আনন্দে লাফিয়ে উঠল না, উৎসুক হয়ে উঠল না। গেলবারের ঘটনা থেকে দমে রয়েছে। তবু চঞ্চল একেবারে হলাম না যে তা নয়। সামলে নিলাম। তাছাড়া আমার হাতে সময়ও ছিলনা যে একটু ভাবব বা অপেক্ষা করব।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি ঠিক এমনি সময় দেখলাম লিলি সিঁড়ির নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখাচোখি হলো দুজনে—নীরবে। হতেই হেসে ফেললাম। ও-ও। আমার সমস্ত অভিমান অভিযোগ—যা সেদিন থেকে জমেছিল, সব মুহূর্তে উবে গেল। বললাম, আয় ওপরে আয়। বলে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম।

—তুই নেবে আয়।

—আয় না।

—না কাজ আছে। এইমাত্র এখানে এসেছি। এসে তাড়াতাড়ি এলাম তোর সাথে দেখা করতে। কথা আছে। এখুনি চলে যাব।

আমার হাসি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। রাগ হলো। মনে মনে বললাম, এসেছে একটু মস্করা করতে আর জানিয়ে যেতে, ও এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললাম, ঘোড়ায় জিন দিয়ে না এলেই পারতিস।

—তুই রাগ করলি?

—রাগ করব কেন। কি অধিকার আছে রাগ করবার।

—ওই তো আবার—।

—এতদিন গেল একটা খবর দেওয়া কর্তব্য বোধ করলি না, দেখাও করলি না। সেদিন এখানে এসেও না। আবার আজ বাড়ি ঢুকেই—।

—ও ঘটনার পর তোর সাথে এখানে এসে দেখা করি কি করে। সেদিন আসিনি কেন সব বলব। আজ এখান থেকে যাচ্ছি না। সে কথা বলতেই এলাম। আমাদের বাড়িতে যাস বিকেল বেলা।

—আচ্ছা।

—এখনি চলি।

—আয়।

গেলাম লিলিদের বাড়ি সন্ধ্যার পর। ঘরে পা দিতে মাসিমা হেসে এগিয়ে এসে বললেন, এসো পৃথা। পাশাপাশি বাড়ি অথচ এতদিন তোমাকে দেখিনি। লিলিও গেল, এ বাড়ির সাথে তোমার যেন সম্পর্কও ফুরলো! আমরা যেন আর কেউ নই।

একথার আর কি উত্তর দেব। নীরবে একটু হাসলাম।

—ও ঘরে ওরা সব আছে, যাও।

—ওরা কারা?

—রীণা, নীতা, বেণু, অতসী সবাই।

—হঠাৎ সবাই একসাথে!

—কেন তুমি কিছু জান না!—লিলি বলেনি?

—না। কি?

—তা হলে যাও, গিয়েই শুনবে এখন।

আশ্চর্য হলাম—কি ব্যাপার। নিশ্চয় কিছু একটা আছে যেটা লিলি দুপুরবেলা আমার কাছে একেবারে উহ্য রেখে গেছে। লিলির ঘরে ঢুকে দেখি মাসিমার কথাই সত্যি : সেখানে শুধু লিলিই নেই বেণু, অতসী, নীতা, রীণাও আছে ;—বসে গল্প করছে, করছে হাসাহাসি। বুঝলাম ওরাও আজ আমার মতো আহুত। আমার মতো হেঁয়ালিভাবে কিনা জানিনা। না হলে একসঙ্গে এতগুলো এসে জুটত না। যদিও মাসিমা একটু আগে তা বলেছেন। তবু দল বেঁধে লিলিকে দেখতে আসাও অসম্ভব ব্যাপার নয়। কেননা যে ভাবে লিলির বিয়ে হলো তা ওদের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত। অবশ্য শুনছি পেছনে আজকাল নিন্দা করে : ছিঃ ছিঃ শেষে কিনা নিজের চেয়ে ছোট—। এমনিতে দেখায় লিলি কিছু বোঝে না পেটে পেটে কিন্তু—। অথচ ওদের প্রেমে পড়ে বিয়ে করার কম সখ নয়, জানিতো সবাইকে।

—আয় পৃথা। ঘরে ঢুকতে লিলি বলল। বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে এলো।

—ওরা ? নীতার দিকে চোখ রেখে লিলিকে নিরুৎসুক প্রশ্ন করলাম।

—তোর মতো আমরাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছি। বেণু বলল।

—নিমন্ত্রণ ? ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের—তোকে দেখবার ?

না আমার বিয়ের। হেসে বলল লিলি, তুইতো সেদিন বুঝে নিবি বলেছিলি।

—বলেছিলাম। কিন্তু তুই তো সে কথা বলিসনি দুপুরে।

—বলি কি করে ? নিজের বিয়ের নিমন্ত্রণ কি করে করি ?

—কিন্তু কন্যাযাত্রিণী হবার কথা বলেছিলি ?

লিলি হেসে ফেলল।—

—তবে ওরা জানল কি করে ?

—ঐ তো মজা ; নীতা বলল। কিন্তু কি মজা তা বুঝলাম না।

—এখানে এসে শুনেছে। মার কাছে। লিলি বলল।

—শুভেন্দুবাবু কোথায় ?

প্রশ্ন শুনে লিলি হাসল।—

—হাসলি যে ! জিজ্ঞেস করলাম।

—'বাবু' শুনে। বাবু জুড়ে কখনো বলতি না। বাবু কবে থেকে হলো ?

—বিয়ের পর থেকে। হেসে ফেললাম। গেছে কোথায় ?

—বেড়াতে বেরিয়েছে।

—অনল ?

—জানি না।

প্রচুর খেয়ে দেয়ে ফিরলাম। যে খাওয়ার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। এর উদ্যোক্তা লিলির বাবা। যদিও আমরা লিলির বন্ধু, অর্থাৎ আমার, ছাড়া কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। ইচ্ছে করেই। কি জানি কে কি ভাবে গ্রহণ করবে ভেবে বলেননি হয়তো। এতে আর যেই হোক আমি খুশি হয়েছি। খুশি হয়েছি মেসোমশায়ের ব্যবহারে। তিনি ওদের সব কিছু ক্ষমা করে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছেন। তার সুষ্ঠু পরিচয় এতেই রয়েছে। মাসিমাকেও দেখলাম তেমনি। যখন শুভেন্দু এলো তখন যে ভাব তিনি করলেন, দূর থেকে যা দেখে মনে হলো তা নতুন জামাইয়ের প্রাপ্য। এ-পক্ষের ওপর নিশ্চয় শুভেন্দুর ক্ষোভ থাকা উচিত নয়। অনলকে ঠিক বোঝা গেল না। মনে হয় প্রসন্ন মনে সে তার ভূতপূর্ব বন্ধুকে নব পরিচয়ে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে না।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাগানের জামগাছটার কাছে এসে লিলিকে নিয়ে আমি একটু পিছিয়ে পড়লাম। নীতা, রীণারা একটু আগে আগে—গল্প করতে করতে যাচ্ছে। আধো অন্ধকারে ঠিক কিছু ঠাহর হয়না। লিলিকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কেমন লাগছে।

—কি লাগবে আবার ?

এতক্ষণ ধরে আমরা সবাই গল্প করেছি। নানান গল্প: স্মৃতি রোমন্থন—কবে কি ঘটেছিল থেকে বর্তমান অভিনেতা-অভিনেত্রী পর্যন্ত। তাছাড়া আরো অনেক। কিন্তু লিলি সবচেয়ে কম কথা বলেছে এবং নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলেনি—একেবারে। নীরব থেকেছে। উচিত ছিল ওর বেশি কথা বলা। এবং নিজেদের নিয়ে। স্বাভাবিক নিয়মে নব বিবাহিত মেয়ে বকে

বেশি আর বন্ধুরা হাঁ করে গেলে। স্বামীর কথা, শ্বশুর-শাশুড়ির কথা। ননদ দেওরের। লিলির তো আবার সে আপদ থেকেও নেই। তা না থাক স্বামী তো আছে।—ইস্ পুরুষরা কি হ্যাংলা—। বলে মুখে কাপড় চেপে হাসি আর বান্ধবীরা কি কি করে শোনবার জন্য মুখিয়ে থাকা। লিলি সে সব তো দূরের কথা, কিছুই বলল না। আমরাই বরং সারাক্ষণ বকলাম।

—বাঃ, এই তো সেদিন বিয়ে হলো। নতুন বিয়ে—স্বামী-স্ত্রী—একা একা—।

—স্বামী-স্ত্রী—একা একা, কি ?

—কি আবার। কেমন লাগছে ?

—কেমন আবার লাগবে।

—নতুন কিছু লাগছে না ?

—না তো।

—বলিস কিরে ? তা হলে শুভেন্দু এখনো তোকে ভালবাসে তো না এর মধ্যেই মোহ ভঙ্গ হলো।

—কি জানি। তবে ভালইবাসে হয়তো। বলে হাসতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম।

—তুই কিন্তু তোর কথা কিছুই বললি না,—আশ্চর্যরকম চেপে গেছিস।

—কিইবা বলবার আছে।

—কিছুই নেই ?

হেসে বলল লিলি, বলবো তোকে একদিন।

সে তোর অনুগ্রহ আর আমার ভাগ্য।

—অনুগ্রহ কিরে ?

একটুক্ষণ চুপচাপ। ততক্ষণে ওরা গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—সেদিন এলিনা কেন ? জিজ্ঞেস করলাম।

—বিশ্বাস কর, একদম সময় ছিল না হাতে।

এরপর লিলি মাঝে মাঝে প্রায়ই আসত এখানে। এসে কোনবার দু একদিন থাকত। আবার কোন কোনদিন সকালে আসত শুভেন্দুর সঙ্গে

আর সন্ধ্যার পর চলে যেত। ঘন ঘন আসা-যাওয়ার অবশ্য কোন অসুবিধা ছিলনা। ওরা ডেরা বেঁধে ছিল পদ্মপুকুরে। পদ্মপুকুর থেকে হরিশ মুখার্জী রোডের দূরত্ব এমন কিছু নয় যাতে করে অসুবিধার প্রশ্ন উঠতে পারে। পায়ে হেঁটেই বেড়াতে বেড়াতে আসা যায়। তার ওপর বড় সুবিধা: শ্বশুর-শাশুড়ির ইচ্ছা-অনিচ্ছার বলাই নেই। কেবল বাধা আছে একটু শুভেন্দুর দিক থেকে। ও এখানে এলে শুভেন্দুর অসুবিধা হয়। তবে তেমন কিছু নয়। চাকরটা মোটামুটি দু-একদিন চালিয়ে নিতে পারে।

লিলির আসা-যাওয়া স্বাভাবিক হয়ে এলো। একেবারে স্বাভাবিক। প্রথম প্রথম যে উৎসুক্যে চেনা-জানারা উঁকিঝুঁকি দিত অনেকের তা কমে গেছে—একেবারেই। এ যেন একেবারে পূর্বের মতো অবস্থা। একরকম সকলেই ভুলে গেল লিলির ঘটনা। লিলি যেন সেই লিলিই।

ও এলে হয় বাড়িতে নয় জামবাগানে বসে গল্প করতাম আগের মতো। তফাৎ প্রায় কিছু না। আমার দিক থেকে বলা বাহুল্য ওর দিক থেকেও না। সেটাই সমধিক আশ্চর্য। না সাজ-পোষাকে না আচার-আচরণে। সাধারণত বিয়ের পর বাপের বাড়িতে মেয়েরা এসে প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ির কথায় ফোয়ারার মতো অনর্গল হয়ে ওঠে। ওর সেরকম কিছু নয়। কেবল তফাৎ সিঁথিতে সরু করে সিঁদুর আর হাতে পাতলা শাঁখা। শুধু এয়োতির চিহ্নটুকু। বিয়ের পর, যারা কুমারী অবস্থায় বিশেষ সাজ-গোজ করেনা, তারাও বেশ একটু সাজ-পোষাক করে। কসমেটিক ব্যবহার না করলে পোষাকে-গহনায় ঝোঁক পড়ে। সাধারণত দুটোতে থাকে। নিজেকে পুরুষের কাছে সুন্দরী করার প্রলোভন স্বাভাবিক এবং তারা চায় বলে মেয়েরা সাজে, বলে পুরুষের মুখে শুনেছি। আমি বিশ্বাস করিনা। যদি হয় সেটা আংশিক। তবে মেয়েরা তৃপ্তি পায় বলে সাজ-গোজ করে। কিন্তু লিলি যে কে সেই। আগের মতো। কোন ব্যতিক্রম নেই। নিজের তৃপ্তির জন্য সাজে না, শুভেন্দুর কাছে সুন্দরী হবার প্রলোভনও না। বিয়ের আগে মাঝে মাঝে ভাবতাম এটা ওর ন্যাকামি নয় অহংকার। কিন্তু এখন? আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতাম: মুখে কিছু বলতাম না। আবার এই লিলিকে সাজতে দেখেছি আমি। সে কি সাজ! সে অনেক পরের কথা!

আমি একদিন, ঢাক গুরগুর না করে, খোলাখুলি জিজ্ঞেস করেছিলাম ওর শ্বশুর বাড়ি সম্বন্ধে। দেখলাম, এ ব্যাপারে ও নীরব থাকতে চায়। বলেছিল, 'ওর বাবা-মা সম্বন্ধে আশ্চর্যরকম উদাসীন। কোন কথা বলতে চায় না। না বললে আমি জানব কি করে। বলবই বা কি।

আমি ব্যাপারটা হাল্কা করবার জন্য তাড়াতাড়ি বললাম, ও-টি কে ?

লিলি হেসে ফেলল।

বিয়ের পর থেকে লক্ষ্য করছি লিলি আর শুভেন্দুকে নাম ধরে না। 'ও' দিয়েই সারে। বিয়ের আগের লিলিদি আর শুভেন্দু সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। আমাদের মা দিদিমার ধারা যাবে কোথায়। যতই শিক্ষিত হোক—মডার্ণ হোক। তবে লিলি আলট্রামডার্ণ নয়। হলে কি হতো বলতে পারিনা।

—কত হাজার বার তুই শুভেন্দু শুভেন্দু করেছিস আর আজ একবার নাম নিতে পারিস না।

—কেন পারবনা ? দরকার হয় না তাই।

—থাক হয়েছে।

একটুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, শুভেন্দুর বাবা-মা একবারও তোদের খোঁজ খবর নেননি ?

—হয়তো নিয়েছেন, আবার হয়তো নেননি। তবে একবার মনে হয় যেন শুনেছিলাম ওর মা নাকি এখন মিটমাট করতে রাজি ; কিন্তু বাবা গররাজি।

—অর্থাৎ তাঁর উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত।

—বললেই বলে, তোমাকে পেয়েছি, আর কিছু আমার দরকার নেই। ওগুলো পড়ে থাকবে না। ভাগ বসাবার লোক অনেক আছে।

—ওদের অবস্থা তো ভাল।

—হ্যাঁ।

এরপর লিলির শ্বশুরবাড়ির খোঁজ খবর আর নেই নি। তবে এখন পর্যন্ত এটুকু জানি, তাঁরা ওদের ঘরে নেবার গা করেনি। তবে লিলির শাশুড়ি সেদিন শুনলাম নাকি ওদের বাড়ি এসেছিলেন শুভেন্দুর মেয়েটিকে

দেখতে। দিল্লী ঘুরে এসে ওরা এখন টালিগঞ্জে ডেরা বেঁধেছে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

আরেক দিনের কথা। এটা ঠিক গল্প হচ্ছে কিনা জানিনা। কেননা কাহিনীর ধারাবাহিকতার কোন সংহতি নেই। আমি লিখছি কাহিনী। একটি মিষ্টি মেয়ের কাহিনী। আমি আর লিলি ওদের বাড়ি বসে গল্প করছিলাম। ঠিক এমনি সময় শুভেন্দু বাড়ি ঢুকলো। ওকে দেখে চাপা গলায় লিলি বলল, দেখলি।

—কি! সবিস্ময়ে তাকালাম লিলির দিকে।

—পেট কচলাচ্ছে।

—কেন?

—ওকে দেখে।

আমি কিছু বুঝতে না পেরে আরো বিস্মিত হলাম। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম, কি হলো।

—এখন যেতে হবে ওর সাথে বাড়ি। সত্যি বলছি পৃথা, অনেক সময়ই বাপের বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয়না।

আমি একটু হাসলাম। ভাবখানা, এটা বাড়াবাড়ি।

—শুনে তুই হয়তো ভাবছিস বাড়াবাড়ি।

চমকে উঠলাম আমি। আমার মনের কথা বুঝতে পারল নাকি লিলি।

—বিয়ের আগে কারুর মুখে শুনলে হয়তো আমিও ভাবতাম। তখন শ্বশুরবাড়ি মধু কল্পনার আনন্দপুরী। তারপরে ফাক্কা। লাড্ডু খাব লাড্ডু খাব; খেলেই ব্যাস—শেষ। তোর হোক বুঝবি।

আমি হাসলাম; ও-ও।

তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপচাপ।

—প্রত্যেকবার করে, আশ্চর্য। লিলি বলল, একদিন মাকে বললাম। মা বলল নাকি তারও করত। বাপের বাড়িতে, যখন তাকে নেবার জন্য শ্বশুর বাড়ির লোক—এমন কি বাবাকেও দেখত তখনো নাকি তার পেট গোলাত। এমনকি আমরা হবার পরও—বুড়ো বয়সে। অবশ্য আমি শ্বশুর ঘর করতে যাচ্ছিনা, বলে হাসল লিলি, তাঁর ছেলের ঘর করতে যাচ্ছি।

আমার ঘর, তবু পেট কচলাচ্ছে। আশ্চর্য বংশ পরম্পরায় (মায়ের দিক থেকে) এই ভাবটা বয়ে চলেছে।

এরপর লিলি দিল্লী চলে যায়। তার মানে বিয়ের দুবছর পর। শুভেন্দু বদলি হয়েছে দিল্লী। তখন লিলির পেটে মেয়েটা সবে এসেছে। মাস তিনেকের বেশি নয়। তারপর আর কিছুই জানিনা। প্রথম প্রথম চিঠির আদান-প্রদান বেশ চলেছিল। পরে সেটা ধীরে ধীরে শিথিল হতে হতে একসময় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। মাঝখানে একবার ওর মেয়ে হবার খবর পেয়েছিলাম।

তার দুবছর পর আবার লিলিকে দেখলাম। দেখলাম না শুধু, আবিষ্কার করলাম। রীতিমতো আবিষ্কার। প্রথম থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে বৃত্তান্ত বলতে গেলে আর এক মহাভারত ফাঁদতে হবে। তার দরকার নেই প্রয়োজনও দেখছি না।

দিল্লী থেকে ফেরার খবর আমাকে আগে থেকে দেয়নি লিলি। ওদের বাড়ি থেকেও কিছু শুনিনি। নিশ্চয় খবর পাঠিয়েছে ওদের বাড়ি। কিন্তু সে খবর শোনাবেই বা কে আর শুনবই বা কখন। এগারটা-পাঁচটা স্কুল পিটিয়ে কোন কিছুতে আগ্রহ থাকে না আজকাল। তার ওপর আবার একটু আধটু লেখবার চেষ্টা করছি।

একদিন—এইতো সেদিন ধরতে গেলে, বিকেলবেলা, স্কুল থেকে ফিরেছি অনেকক্ষণ, হয়তো বেড়াতেও বেরোতাম, আমাকে একেবারে চমকে দিয়ে লিলি এসে হাজির। একে অপ্রত্যাশিত দেখার বিস্ময়তায় অদ্ভুত রূপ-সজ্জা আমাকে সম্পূর্ণ বিহ্বল করে দিল। তবে আমি যে মুহূর্তের মধ্যে ওকে চিনতে পেরেছিলাম এখন ভাবলে আশ্চর্য হই। আমি সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে বললাম, তুই!

—হ্যাঁ, হাসতে হাসতে গিয়ে বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়ল—আদুরে মেয়ের মতো।—কেন চিনতে পারছিস না।

—পারছি, তবে কষ্ট হচ্ছে।

—কেন?

—কি জানি। তারপর কবে এলি?

—দিন পনেরো।

– কতদিন বাদে দেখা!

—হ্যাঁ, অনে—কদিন।

—তারপর খবর কি? কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বললাম। এমন সময় হয়তো এরকমই হয়। বলবার মতো কথা খুঁজে পাওয়া যায় না।

—কিসের?

—আচ্ছা লিলি, এখানে আসার খবর দিলিনা কেন আগে থেকে?

—তাড়াতাড়ি করতে হলো তাই।

—তা নয় হলো ; এতদিন বাদে যে এখানে এলি?

—নানান ঝামেলা ঃ একা মানুষ।

—কোথায় উঠেছিস?

—উঠব আবার কোথায়। বাড়ি ভাড়া করেছি।

—কোথায়?

—টালিগঞ্জ।

—শুভেন্দু তাহলে বদলি হয়ে এসেছে দিল্লী থেকে।

লিলি মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, চল, বেড়াতে চল। হাঁটতে হাঁটতে গল্প করা যাবে 'খন।

—না ঃ ইচ্ছে করে না।

—তা হলে ঘরে চুপচাপ বসে থাকবি?

– চুপচাপ কোথায়, বেশ তো গল্প করছি।

—এই বিকেল বেলায় ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না।

তবে তুই নয় একটু ঘুরে আয়। আমি ততক্ষণ মাসিমার সাথে বসে গল্প করিগে। মাসিমা কোথায়?

শুনে বিস্মিত হলাম। হঠাৎ মার সঙ্গে গল্প করবার এত আগ্রহ! বিয়ের কিছু পর অবশ্য মেয়েদের ধাত এরকমই হয়। একটি বাচ্চা হলে তো আর কথাই নেই। কুমারী মেয়েদের চেয়ে প্রৌঢ়াদের সঙ্গ তাদের অধিক কাম্য। কি সুখ যে তাতে, বলতে পারব না।

—বাড়িতেই আছে। বললাম।

লিলি উঠে দাঁড়াল।

—হ্যাঁরে তোর মেয়েটা কোথায়?

—এখানেই,—মার কাছে।

—সাথে করে নিয়ে এলিনা কেন। দেখিনি, ভারি দেখতে ইচ্ছে করে।

—আনব কি করে; ভীষণ দুষ্টু। আনলে এক মিনিট স্থির হয়ে কথা বলতে পারতাম না। এসে এটা ফেলবে সেটা ফেলবে আর হাজার প্রশ্নের উত্তর দাও বকর বকর করে। বকিয়ে খায়। এই বয়সেই অদ্ভুত কথা বলতে পারে,—একবারে পরিষ্কার।

—হাসিস না, দেখলে পরে বুঝবি। দেখবি?

আমি মাথা নাড়লাম।

—দাঁড়া, মাসিমার সাথে একটু দেখা করে আসি।

—আয়। বলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এসেই হয়তো শুরু করবে মেয়ের নানা গল্প।

তারপর আগের মতো লিলি এখন যথারীতি মাঝে মাঝে আসে। এবং আগের মতোই কোন কোনবার এসে দু-একদিন থাকে। সঙ্গে থাকে মেয়েটা। সুন্দর হয়েছে দেখতে মেয়েটা। হুবহু লিলির বসান মুখ। আর শুভেন্দুর মতো ফর্সা রঙ। ভীষণ দুষ্টু। এক মিনিটকাল স্থির থাকেনা। সব সময় চঞ্চল। আগে যদি লিলির কোলে দেখতাম, তা হলে ম্যাডনার জীবন্ত-রূপ দেখেছি বলে মনে করতাম: তন্বী মায়ের কোলে দামাল শিশু। কিন্তু লিলি মুটিয়ে গেছে। আগের তুলনায় অনেক। আমার ভবিষ্যতবাণী ফলেছে।

আপাত দৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না লিলির মধ্যে। কেবল দেহ আর সাজ-পোষাক ছাড়া। কিন্তু আমার মনে হয় ও অনেক পাল্টে গেছে। শুধু বেশবিন্যাসে নয় মন বিন্যাসেও। একদিন বলেছিলাম, লিলি তুই আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছিস।

—মানুষ প্রতিদিন এক থাকেনা।

—তা জানি। এক নদীতে দুবার চান করা যায় না।

—ঠিক তাই।

—কিন্তু নদী বদলায় না।

তাড়াতাড়ি লিলি বলল, আমিও বদলাইনি। শুধু একটু মুটিয়ে গেছি। বলে একটু হাসল।

—শুধু তাই না সাজ, পোষাকেও এবং মনের দিক দিয়েও।

—মনের দিক দিয়ে কোথায় কি দেখলি ?

—মনে হচ্ছে।

—তোর ঐ রকমই হয়।

চুপ করে গেলাম। মন সম্বন্ধে আর কি বলব। ওটা অনুভবের ব্যাপার এ্যাবস্ট্রাক্ট, কংক্রীট কিছু নয়। এর বেশি আর কিছু বলা যায় না।

—তবে আজকাল একটু সাজ-গোজ করি।

শুনে হেসে ফেললাম। লিলি আজকাল একটু-আধটু সাজে !

—ও পছন্দ করে তাই।

—আগেও হয়তো করত, হেসে বললাম, কিন্তু তুই সাজতিস না।

—তখন বুঝতাম না।

—কিন্তু আমি একদিন বুঝিয়েছিলাম। তুই তখন দেমাক দেখিয়েছিলি। বলেছিলি, না সাজলেও শুভেন্দু তোকে নিশ্চয় ভালবাসবে। এখন কি তবে উল্টোটা ভাবব : শুভেন্দুর ভালবাসায় ভাঁটা পড়েছে। শুনে ঠোঁট টিপে একটু হাসল লিলি। অনেকটা গর্বের হাসি।

এইতো কয়েকদিন আগের ঘটনা। লিলি সেদিন এখানে। ঠিক করেছিলাম বেড়াতে যাব আমাদের এক পুরনো বন্ধুর বাড়ি। পথে একদিন দেখা হয়েছিল। যেতে বলেছে অনুনয় করে। কথা দিয়েছিলাম আমরা যাব বলে। আমি ওকে যখন ডাকতে এলাম তখনও সে আয়নার কাছে। মেয়ে—ছন্দা মায়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। দেখছে মাকে। হাতে তার একখানি চিরুনি। ধবধবে ফ্রক-ইজের পরা। আশ্চর্য দুষ্টু চঞ্চল মেয়েও স্থির। আমার পায়ের শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকাল লিলি। দেখেই বলল, হয়েছে আমার, চল।

—চল। একটু থেমে বললাম, ছন্দা যাবে না ?

—হ্যাঁ।

—তবে ওকে পাউডার-টাউডার মাখালি না কেন?

—ওই তো ঠিক আছে।

—বাঃ বেশ, তুই এতক্ষণ ধরে মেকাপ নিলি আর ওকে সাজাবিনা? চোখে একটু কাজল দে; পাউডার মাখা, লাল রিবনটা মাথায় বেঁধে দে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে।

—বেশ তাহলে আমিই ওকে সাজাচ্ছি। বলে এগিয়ে গেলাম।

—হয়েছে হয়েছে, থাক সাজাচ্ছি। আমাকে একদিন সাজিয়েছিস আর আজ আমার মেয়েকে সাজাতে হবেনা। বলে ও ছন্দাকে টেনে কোলে নিয়ে বসল।

—ওকে এমনিতেই সুন্দর দেখায়। কস্‌মেটিক না মাখাই ভাল। ছন্দার চোখে কাজল পরিয়ে দিতে দিতে বলল।

—সেটা তোর বেলায়ও প্রযোজ্য।

—একজন পছন্দ করে বলেই সাজি।

আমি একটু হাসলাম। কিছু বললাম না। যদিও বলবার ইচ্ছে ছিল—আছেও।

—আর ওর এই বয়েস থেকে সাজাতে শেখালে বড় হলে পারফিউমারি ওয়ার্কসের প্যাকেট হবে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ।

—আচ্ছা পৃথা—

—কি?

একটু দ্বিধা করে বলল, ছন্দা সুন্দর না আমি।

—হঠাৎ? বিস্মিতভাবে বললাম।

—এমনি।

—আমার কাছে এখনও তুই সুন্দর।

—কিন্তু শুভেন্দু বলে ছন্দা। আর ওকে ভালওবাসে বেশি। বেশ বুঝতে পারি।

হেসে ঠাট্টা করে ওকে যেন কি বলতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি একেবারে থ'।

মনাস ॥ কার্তিক ১৩৬৪

জোয়ার হয়তো এসে থাকবে নদীতে। তা না হলে খালের জল এমনতর হিস্ হিস্ করে উঠবে কেন। আর ছোট ডিঙ্গিটাও বা কেন বসে ঘুমন্ত-মানুষের ঢুলে ঢুলে পড়ার মত মৃদু মৃদু নড়বে। আর অতি ক্ষুদ্র ঢেউগুলো নৌকোর খোলে বাধা পেয়ে খুব নীরব স্বরে, না—ঠিক তা নয়, যেন ফিস্ ফিস্ করে বলছে, এস, চলে এস। পঞ্চমীর চাঁদ বাঁশ আর বেললতার ভেতর দিয়ে শতশত স্ফটিক খণ্ডের মত টুকরো টুকরো হয়ে দিগন্তে ঝরে গেছে,—সে তো অনেকক্ষণ। হাওয়া থমকে দাঁড়ায়নি বটে, তবে প্রবহমান কিনা বুঝতে হলে সমস্ত ইন্দ্রিয় কেন্দ্রীভূত করতে হয়। বাদুড়গুলো উড়তে শুরু করেছে একে একে—সেই সন্ধ্যার নিবিড় অঞ্জন নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে। এখনও উড়ছে। উড়ছে আবার নামছে। ওঠা-নামার তাদের ডানার ঝটপটানি পাতায় লেগে খস্ খস্ শব্দ তুলে এক ভূতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যেন! রাত কত হবে? দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করেনি এখনো প্রহরে প্রহরে ডাকা পাখিগুলো—ডাকেনি শেয়াল। অস্থিরভাবে পদচারণা করছে একটি ছায়ামূর্তি পিপুল গাছটির নীচে। আর মাঝে মাঝে পূবদিকের পায়ে চলার পথটার দিকে মুখ করে থমকে দাঁড়ায়—নিস্পন্দ নিথর বেসাল্ট দিয়ে গড়া নিকষ মূর্তি যেন! শুধু চোখ দুটো প্রাণ-অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। কি যেন খুঁজছে চোখ দুটো। ক্রমেই অন্ধকারের ভেতর জ্বল জ্বল করে উঠছে চোখ দুটো—বৈদূর্য্যের মত, কিছু প্রত্যাশিত জিনিসের না আসার আশঙ্কায়। আবার মাঝে মাঝে ফিরে তাকাচ্ছে জারুল গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ডিঙ্গিটার দিকে। এক সময় হঠাৎ ছায়ামূর্তিটা থমকে দাঁড়াল। দেখে পুবদিক থেকে আর একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে এদিকে—দ্রুত পায়ে। ছিমছাম ছন্দময় চলিষ্ণু নিকষ বেসাল্ট মূর্তি। এ ছায়ার কাছে এসে আগত ছায়াটা কাঁপতে থাকে! ডাকে, মকবুল!

—হ। এগিয়ে যায় মকবুল ছায়ার কাছে।—এ্যাত দেরি কল্লি কিয়া?—

—দেরি কি আর হাধ কইরা (ইচ্ছে করে) করছি? ওগুলো মল্লে তয়তো আমু। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মকবুল।—ল মকবুল দেরি করিস না, আবার হকাল হকাল ফিরতে অইবে। বাজান আইজগোর গয়নায় হাজীপুর থিয়া ফিরবে।

—তয় তুই আইলি ক্যান? না আইলেই পারতি। অভিমানভরা কণ্ঠস্বর। এ ছায়াটা একটু হাসল। হেসে বলল, খাউজ ছ্যাহনা! অল্পতে ওনার মন ওড়ে না। তয় আর কি, বাড়ি যাই। বলে সত্যি সত্যি ঘুরে দাঁড়ায় একটুকাল, পরে চলতে শুরু করতেই মকবুল আতঙ্কাচ্ছন্ন চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, তুই চললি কই ছকিনা! দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলে সকিনাকে মকবুল।—চল, ঘুইরা আই। হক্কাল হক্কালই ফিরুম তোর কথা মত। শুনে ফিক করে হেসে ফেলে সকিনা।—পিরীত ছ্যাহনা। হাত ছাড় মেঞা, তারপর কথা কও। মকবুল থতমত খেয়ে হাত ছেড়ে দেয়। হাত ছাড়তে সকিনা খিলখিল করে হেসে ওঠে।—ত্বরাত্বরি ফিরবাতো? এগিয়ে গিয়ে মকবুল সকিনাকে বুকে টেনে এনে বলে, অইবে, তোর কথাই অইব; ডর নাই।

এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সকিনা বলে, খাউজ ছ্যাহনা মেঞার। অত খাউজে কাম নাই, চললে চল।

বোকার মত দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে মকবুল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ডিঙ্গিটার দিকে। পিছে পিছে এগিয়ে আসে সকিনা জারুল গাছটার গুঁড়ি থেকে ডিঙ্গির দড়ি খোলার আগে এক লাফে সাদা আর হাল্কা বেগনী মেশান এক থোকা ফুল ছিঁড়ল মকবুল। ডিঙ্গিতে উঠতে ফুলের থোকা সকিনার কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বৈঠা হাতে করে গলুইতে গিয়ে বসল।

কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এ অভিযান নয়। উদ্দেশ্য বিহীন এ যাত্রা। ঘুরবার জন্য ঘোরা। মকবুলের কতদিনের ইচ্ছা সে রাতের অন্ধকারে নিশাচরের মত সকিনাকে নৌকায় নিয়ে একটু ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এতদিন হয়ে ওঠেনি। সকিনার যে অনিচ্ছা তা নয়। পরিকল্পনা শুনে তো উচ্ছল কিশোরী মেয়ের মত হাততালি দিয়ে উঠত; কিন্তু সুযোগ কোথায়। আজ ভোরে সকিনার বাজান—বদন আলী হাজীপুর যেতে সে সুযোগ এল।

সংবাদ দিয়েছিল ঐ সকিনা। যেন হাওয়ায় উড়তে উড়তে মকবুলের কাছে এসে হাজির।—আইজ রাইতে তোর লগে তোর ডিঙ্গি নাওডায় কইরা ঘুরমু!

কত যেন আনন্দ! আনন্দ আর ধরছিল না যেন সমস্ত অঙ্গে। খুশিতে ডগমগ করছিল সকিনা।…কিন্তু সে সকিনা আর এ সকিনা যেন এক নয়। মকবুলের কেমন যেন রহস্য লাগছে। সেই লাস্যময়ী উচ্ছল হাসিখুশি ভরা সকিনা যেন নয়। অজানা কোন এক মেয়ে সকিনার রূপ নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মিহি কূল কূল শব্দের তালে তাল মিলিয়ে বিলম্বিত লয়ে বৈঠকখানা চাপা ছপস্রিত্ ছপস্রিত, শব্দ তুলছিল। আর ডিঙ্গিখানা এঁকে বেঁকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। দুপাশে সঘন সুপুরির বন। শিরীষ আম কাঁঠাল—নানা গাছের মেশামেশি। তাদের পত্রপুষ্ট ডালপালা আর বাঁশঝাড়ের কিছু বাঁশ খালের উপর ঝুঁকে পড়ে এমন জমাট বাঁধা অন্ধকার সৃষ্টি করেছে যে, তেমন কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হতে চাইছিল না। সারাৎসার অন্ধকারে নিঃশ্বাসও যেন জমাট বেঁধে আসে। মাঝে মাঝে আঁধার ফিকে হয়ে আসে; তখন আবার ভূতের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় পোয়ালছাওয়া কুঁড়ে ঘর আর খড়ের স্তূপ। এরকম পরিবেশে এরকম দৃশ্য দেখেনি কোনদিন সকিনা। বড্ড ভয় করছিল তার। অনুশোচনা হচ্ছিল কেন সে এল। ঠিক তখনই হাল্কা হাওয়ার ঝলক বয়ে গেল। আর তখন, ঠিক তখনই বাঁশবন থেকে কে যেন সহস্র হাতে কট্ কট্ ঠক্ ঠক্ করে উঠলে আর ফোঁস ফোঁস করে ছাড়তে লাগল দীর্ঘশ্বাস। তখনই বাদুড়গুলো পাখার ঝটপটানি, পাতার খসখস শব্দ সৃষ্টি করে শাঁই শাঁই শব্দে উড়তে লাগল। কতগুলো পাখি চিঁ চিঁ করে আর্তনাদ করে উঠল। তারা সহসা এলোমেলোভাবে ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়লো শ্লেট আকাশে কালো কালো একরাশ নুড়ির মত। সকিনার সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আর হাত তিনেক দূরে বসে থাকা মানুষটিকে-ও তার মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ আজরাইল! কি যেন বলতে গেল সে; কিন্তু পারলো না। পরেরবারের আত্যন্তিক চেষ্টায় ফ্যাসফেসে কাঁপা স্বর বেরিয়ে এল, মকবুল!

—কিলো ছকিনা ডর লাগে ?

কোন প্রত্যুত্তরে না দিয়ে সকিনা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মকবুলের কোল ঘেঁসে বসে। মকবুল সস্নেহে মাথায় হাত দেয় সকিনার। হালের থাকে না ঠিক। ফলে একটা ঘুরপাক খায় ডিঙ্গিখানা। ভয় পেয়ে সকিনা মকবুলের চওড়া বুকখানা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। অনাস্বাদিত এক অনুভূতির শিহরণ বয়ে যায় মকবুলের সারা দেহে। বৈঠা সমেত দুটো বলিষ্ঠ হাতে নিবিড় করে সকিনাকে জড়িয়ে ধরে। তারপর, তারপর সকিনার কপালে নিজের সমস্ত মুখখানা ঘষতে থাকে। কাঁপা গাঢ়স্বরে বলল, ডর করে ছকিনা? কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই, নিঃসাড়ে যেভাবে লুকিয়েছিল সকিনা মকবুলের বুকে তেমনই থাকলো। —ডর কি মুই তো রইছি ?

পরে যখন শক্ত হাতে বৈঠা ধরল মকবুল, দেখল নৌকা স্থির হয়ে আছে খালের একপারে। বৈঠা দিয়ে লগির মত খোঁচা দিয়ে নৌকার গতি বাড়িয়ে তারপর স্বাভাবিক গতিতে এগোতে লাগল। কিন্তু সকিনা আর মুখও তুলতে চায় না। যেমনটি ছিল তেমনি মকবুলের বুকে মুখ গুঁজে রইল। শরীর-মন খুশীতে ডগমগ করছে মকবুলের। আনন্দে বেয়ে চলেছে সে, আর কত কি ভাবছে।···

—ছকিনা, ওঠ, দ্যাখ।

মুখ তুলে তাকায় সকিনা। দেখে, খাল অনেক প্রশস্ত হয়েছে। জমাট বাঁধা অন্ধকার হয়ে এসেছে ফিকে। বুক ভরা তারা নিয়ে আকাশ দেখা দিয়েছে। সকিনা এখন অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে। দু পারে নলখাগড়া আর হোগলার পাতাগুলো দাঁড়িয়ে আছে ঝিম ধরে। দূরে, বহুদূরে গাঢ় মসীলিপ্ত রেখা।

—ভরা দেওইলে (বর্ষায়) এই হোগলার বনে কুমীর আয়। আলতো-ভাবে মকবুল বলল। বিস্ময় আর ভীতিতে চোখ ভরে আসে সকিনার। ভীতিবিহ্বল চোখে একবার ভাল করে চেয়ে দেখল হোগলা নল-খাগড়ার বন। সকিনার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মকবুল বলল, অহন আর নাই। আশ্বিনের হ্যাষ (শেষ) তো ; জলে টান লইছেঃ তাই ওরা হুমুদ্দুরে চইল্যা

গ্যাছে। একটু হেসে বলল, তুই ক্যামন মাইয়া ছকিনা! কি কমু! ভাডির ত্থাশের মাইয়া তুই; আরো থাকস কবাইর পারে, ভুই পাও ভয়!

চুপ করে থাকে সকিনা। সবকিছু শান্ত ধীর-স্থির স্তব্ধ। কচ্চিৎ পাখি পাখার ঝটপটানি আর মকবুলের বিলম্বিত লয়ে চাপা ছপস্রিত ছপস্রিত বৈঠার ওঠা নামার শব্দ।

ধীরে ধীরে বাঁ-পারের কোল ঘেঁষে ডিঙ্গি চলতে লাগল। নল-খাগড়া আর হোগলার পাতা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠল। কেমন ছমছমে ভয় আবার বাঁধতে শুরু করল সকিনার বুকে। মাঝে মাঝে মকবুলের বৈঠার আঘাতে দু'-একটা হোগলা বা নল-খাগড়ায় লাগতে থাকে। ওগুলো থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। হয়তো ওগুলো গায়ে লেগে ঝিমুতে থাকে ব্যাঙ সাপ কি মাছ। নাড়া পেয়ে কুলকুল,—না, ঠিক ত'নয়; হিস্‌হিস্‌ শব্দ তুলে পালিয়ে যায় অন্যত্র। ভয়ে কুঁকড়ে যায় সকিনা। বার বার তার মনে হতে লাগল, তার শোনা 'গুইল সাপের (গো-সাপ) মত কুমীরগুলো হাঁটিহাঁটি পা পা করে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

নৌকো গিয়ে নদীতে পড়ল। শান্ত স্থির নিস্তরঙ্গ নদী—কবাই। কবাই নদীর পারের মেয়ে সকিনা—তার প্রথম কবাই দর্শন। কত কৌতূহলই না ছিল তার এই নদী দেখার। কিন্তু এই নাকি সেই নদী: যার অমিত তেজ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। যার লেলিহান ক্ষুধায় প্রতি বৎসর জীবনোৎসর্গ করতে হয় বেশ কিছু মাঝি-মল্লার আর যাত্রীদের। আর এরই প্রলয় মাতন রূপ দেখে নাকি একবার বিক্রমপুরের সেরা মাঝিরা 'বাবা কোপা' বলে হাত জোড় করে শিবরূপ দেখবার জন্য কোন নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজে দিনের পর দিন-রাতের পর রাত কাটিয়েছে। এসব বিশ্বাস করতে সকিনার মন সরছে না। এর নামে কত নিন্দাই না শুনেছে সে! এতো তাদের বুড়ো পাকা দাড়িওয়ালা ফকির সাহেবের মত ধীর স্থির প্রশান্ত। আর এরই নামে কিনা…।

নৌকো পুবপার ঘেঁষে নদীর দক্ষিণ মুখো চলল। এপারের নল-খাগড়া আর হোগলাপাতা মিলিয়ে গেছে। দেখা দিয়েছে কালসিটে ছাইয়ের মত কাশফুল। তার পেছনে দাঁড়িয়ে কালো আজরাইলের মত গাছগুলো।

—চলছো কৈ ? ফিস্‌ফিস্‌ করে ওঠে সকিনার কণ্ঠস্বর।

—ঝিলনা।

—কয় কোশ দূর ;—খুব ?

—কই আর দূর……।

চুপ করে যায় মকবুল। সকিনা কি যেন দ্বিধা করে বলতে।

—এই নাকি কবাই ?

—হু। ক্যান ?

—না, এ্যামনি। চুপ করে যায় সকিনা।—খুব নাকি—নাকি রাগি ?

—উত্তর দক্ষিণা বাতাসে এ্যানার মাথার ঠিক থাহে না।

আবার নীরব হয়ে যায় দুজনে। ধীরে বৈটার শব্দ তুলে নিঃশব্দে বেয়ে চলে মকবুল। বেশ ভাল লাগছিল তার। যদিও নীরব সকিনা ; তবু তো তার কোল ঘেঁষে বসে। ওর দেহের উত্তাপ, শ্বাসপ্রশ্বাসের ওঠা-নামা টের পাচ্ছিল। ওর দেহের সানন্দোত্তাপ নিয়ে কত রসঘন পেলব ভাবনা। মকবুলকে মদালস করে তুলছে।

আর সকিনা। অসীম বিস্ময়ভরা নিমেষ নিহিত চোখে দেখছিল এই অপরিচিত পটভূমিকাকে। এপারের কালো কালো দৈত্যের মত গাছের সারি। ওপারে নিকষ কালো রেখা, মাথার ওপরে তারার সলমা চুমকি লাগান কালো আকাশ আর নীচে পচা রেড়ির তেলের মত কবাইর পানি। তার ওপর কি সুন্দর হাঁসের মত ভেসে চলেছে তারা।

নদীর মাঝ দিয়ে গোটা তিনেক কালো ভূতের মতো চলেছে সুন্দরকাঠ বোঝাই করে মারোয়াড়ীর পেল্লাই নৌকা। যাচ্ছে উত্তর দিকে। যাবে বরিশাল। তাদের সঙ্গে, তাদের কাছ দিয়ে দক্ষিণে চলেছে গোটা ছয়েক ছ মল্লাই-এর নৌকা চাল বোঝাই করে। যাবে হয়তো বগা। চালের গুদাম ঐশ্বর্যময় করে তুলতে। সকিনা দেখছিল ; বুঝতে পারছিলনা এগুলো কিসের নৌকা। শুধু শুনছিল, এলোমেলো ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ, দাঁড়ের কর্কশ আর্তনাদ আর মাঝি-মল্লাদের অস্ফুট কথাবার্তা।

ঘোর এসেছিল হয়তো সকিনার। কিন্তু মকবুলের নাড়া পেয়ে চমকে উঠে শুধাল, কি ?

—ঐ যে হাজীপুরের গয়না।

—কৈ?

—ঐযে। মকবুল মুখ নাড়িয়ে দেখিয়ে দেয় উত্তর দিকে চলিষ্ণু একটি নৌকোকে।

—ঘরে ফের মকবুল। আতঙ্কাচ্ছন্ন কণ্ঠস্বর সকিনার।

—ক্যান!

—বাজান আইব ঐ গয়নায়।

একটু হাসল মকবুল।—তোর বাজানের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে মোরা ঝিলনা থিয়া বাড়ি ফিরইয়া পুরান হমু। ভয় নাই ওডা এ্যাহন 'বাইর চর' যাইব। উই যে ঘোজাহান দ্যাহনা। আঙুল দিয়ে মকবুল উত্তর দিকে নদীর বাঁকটা দেখায়।—ঐ ঘোজাহান ঘুইরা 'বাইর চর' পৌঁছতেই হ্যাষ রাত্তির। হেইহান থিয়া (সেখান থেকে) আবার হাইট্টা বাড়ি।

—না, তুই ফির্ইয়া ল।

মকবুল আশ্বাস দিতে থাকে সকিনাকে। জীবনে অনেক প্রতীক্ষার পর তবে আজকের এই রাতটি পেয়েছে সে। এত শীঘ্র এটা শেষ হতে দিতে চায়না। জানে বইকি মকবুল দুদিন বাদে সকিনা তার হবে, একান্তই তার হবে। তবু তৃষিত মন চায়না, এত ত্বরায় এই বহু বাঞ্ছিত ক্ষণটি নিঃশেষ হোক। কিন্তু সকিনা নাছোড়বান্দা—নৌকো ফেরাতেই হবে। অগত্যা···। যত এগোচ্ছে ততই কেমন যেন একটা অবুঝ নৈরাশ্য বুকে এসে বাসা বাঁধতে থাকে মকবুলের। বুঝতে পারছে না সে কেন মন এমন করছে। কেন এমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ইচ্ছে করছে গায়ে গা' লাগিয়ে বসা এই মাংসপিণ্ডকে নির্মমভাবে আদর করে। বাঁ হাতখানা অজানতে মকবুলের আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় সকিনার দিকে। সকিনা জড়িয়ে ধরে মকবুলকে। বুকে মুখ লুকায়। আস্তে, বলে মকবুল!

—কি?

—হারামির বাচ্ছাডা মোর দিকে হাত বাড়াইছে।

—কেডা? কিছু বুঝতে পারেনা মকবুল।

—ফজল।

—ক্যান ; কি করছে !

—মোরে নাহি ওনার চোহে খুব ধরছে। উনি মোরে। কথা শেষ না করে ফিক করে হেসে ফেলে সকিনা।—হেইয়ার লইগ্যা বাজানের কাছে আইজকাল ঘুর ঘুর করতে আছে।

সমস্ত রোমাঞ্চকর আবেগ-আবেশ-অনুভূতি সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যায় মকবুলের। কেমন একটা বোবা ক্রোধ তাকে ক্রমে আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। শুকনো হয়ে ওঠে দুটো ঠোঁট,—কাঁপতে থাকে। থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নেয় ঠোঁট দুটোকে। হাত দুটো যেন ধরে আসছে তার, বৈঠা আর যেন চালাতে ইচ্ছে করছে না। নেশায় চুর হয়ে থেকে, পরে নেশা ছুটে গেলে বিশ্বের সমস্ত অবসাদ যেমন দেহকে সমাচ্ছন্ন করে ; ঠিক তেমনি অবসাদ নেমে এসেছে মকবুলের সর্বাঙ্গে। অবসাদগ্রস্তের মত বেয়ে চলল বৈঠা। কিছুতেই আর যেন উৎসাহ নেই। এখন কোন রকমে জারুল গাছটার গোড়ায় পৌঁছতে পারলেই হল।

ফজলের পেশীবহুল দীর্ঘ আসুরিক দেহখানা মকবুলের মানসপটে ভেসে ওঠে। বড় দুর্বল মনে হচ্ছে তাকে ওর কাছে। কিন্তু ভয় পাচ্ছে কেন সে ? ভয়ের কি হয়েছে ? সকিনার 'বাজানে'র কাছে ঘুর ঘুর করলেই তো আর সকিনাকে পাচ্ছেনা। সকিনার বাবা তো স্বীকার করেছে যে, ওর হাতে সকিনাকে দেবে। টাকা যা লাগাব তার জন্য সে তো সময় নিয়েছে। আগুনির ধান উঠলেই সে দিয়ে দেবে টাকা। আজ আশ্বিনের শেষ কার্তিকের প্রথম। আর কটা দিনই বা বাকী পৌষ মাসের। ফজলই বা টাকা দেবে কোথা থেকে আগুনি ধান না ওঠা অব্দি।

তবুও ভরসা পায়না মকবুলের মন—পায়না আশ্বাস। ফজলকে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায়না। জানে মকবুল—শুনেছেও ঃ বহু কামিয়েছে ফজল হিন্দুদের কাছ থেকে। খুনো খুনীতে হাত দিয়েছে। ফেলে যাওয়া কাফেরের জমি দখল করেছে। হয়তো সেই গুনাহ্-এর টাকা দিয়ে বুড়োকে মজাবার চেষ্টা করছে। নিস্ফল ক্রোধে জ্বলতে থাকে মকবুল। অসহ্য দাহে অন্তর খাক হয়ে যাচ্ছে তার।

—কোন কথা কও না যে। মকবুলের বুকের ভেতর থেকে ফিস ফিসিয়ে ওঠে সকিনা। মকবুল চমকে ওঠে। বলে, কি কমু?

—কইলাম তো কসবীর ছাওডা মোরে সাদী করতে চায়।

—চাইলেই পায় কিনা? তুই মোর।

—বাজান যদি ঐ দস্যুডার হাতে মোরে ছাইড়া দ্যায়, তয়?

—দিবো না। তোর বাজান কইছে তোরে মোর হাতে দিব।—তুই জানোনা মকবুল বাজান কি কসাই! আইজ বেশি ট্যাহা পাইলে কাইল-ই মোরে দিয়া দিব। শুনে মকবুল দমে যায়। আশা ক্ষীণ ভেলা তাও যেন ধপ্ করে ডুবে গেল। গভীর নির্বেদে মন ভরে গেল মকবুলের। মনে মনে দিশাহারা হয়ে পড়ে। আশার আর কোন আলোর রেখাই দেখতে পায়না সে। চুপ করে থাকে। হঠাৎ চোখ তুটো জ্বল জ্বল করে ওঠে মকবুলের। কি একটা উপায় খুঁজে পেয়েছে সে।—হইলে পালামু হকিনা। কেমন পারবি তো?

সকিনা মকবুলকে ছেড়ে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার জড়িয়ে ধরে বলল, পারমু। একটা তৃপ্তির হাসি ঠোঁটে ঝুলতে থাকে মকবুলের।—ওরে গ্যাখলে মোর বুহের রক্ত পানি হইয়া যায়। ফিস্‌ফিসিয়ে বলে সকিনা। পরে গভীর আবেশে সকিনা মকবুলের বুকের ভেতর চোখ বুজে থাকে।

পালান বললেই আর পালান যায় না। মকবুল পালাতে পারল না সকিনাকে নিয়ে। যে আবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে সে পালানর প্রস্তাব তুলেছিল, সেই আবেগের ঘন মদালস মন ফিকে হয়ে গেল, কার্ত্তিক অন্তে হালকা হিমের হাওয়া যখন বুক সমান উঁচু স্বর্ণাভ ধানের শীষে দোল লাগিয়ে—সাগর তরঙ্গ তুলে প্রবাহ বয়ে যেতে লাগল দূর থেকে দূরান্তরে—আকাশের নীলিম পেলবে; তখন সেই তরঙ্গ যেন মকবুলকে নেশা ধরিয়ে দেয়ঃ শীষের ঢেউ-এর উল্লাস এসে যেন তার প্রাণেও ঢেউ তুলতে থাকে। সেই ঢেউয়ের আনন্দে বুঝিবা সকিনা-ও দিগন্তে মিলিয়ে যায়। সকিনা পীড়াপীড়ি করে, মকবুল আশ্বস্ত করে তাকে। আর নিজের বিঘা চারেক জমির ধানশীষের আনন্দ-

নাচন দেখে। এবার জবর ফসল হয়েছে। স্মিতহাসি সবার মুখে— মকবুলের-ও। নেই বুঝি সকিনার।

শঙ্কিত সকিনার বেদনাবিধুর মুখখানি মকবুলকে নাড়া দিতে থাকে ভাবে, তাইতো সকিনা তো হাত ছাড়া হল—বুঝি তাকে সে পেল না। একদিকে ধানের লাস্যময়ী রূপের নেশা, অন্যদিকে সকিনাকে পাবার দুর্বিনীত আকিঞ্চন—বুঝিবা না পাবার নির্বেদঃ মকবুলকে দিশেহারা করে তুলল নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগল। ফজল এখন সাদী করতে পারবে না কেন না হাতে টাকা কোথায়? এই ধান উঠলে তবে তো টাকা। হিন্দুদের লুণ্ঠিত টাকা এখনো থাকা কি সম্ভব?

মকবুলের সকল মানসিক চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি ঘটাল সকিনা।—আইতে আছে হুক্কুর বারে—! আর পারল না বলতে সকিনা। ভিজে ওঠে চোখের পাতা। তুই গাও কল্লি না মকবুল। ঐ আজরাইলডার পোলার আম্মাই হইতে হইল শ্যাষ কালে। তোর ধান হইলগা বড় আর মুই—। শুনে মকবুল নিথর নিশ্চুপ। গুম হয়ে বসে রইল সে। এত শীঘ্রই যে এরকমটা ঘটে যাবে এ স্বপ্নেরও অতীত ছিল তার কাছে। যদি-ও সে প্রতিসময় সকিনাকে হারাবে, ফজল ছিনিয়ে নেবে ওকে, এ আশঙ্কা কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করছিল। ফজলকে সে কোন সময় অর্থশূন্য ভাবেনি সত্য—ছিল কিনা সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এ সন্দেহটা, তার নিজের অর্থহীনতার আশ্বাস পাবার জন্য ফজলকে নিঃসম্বল ভাবার চেষ্টা করে সান্ত্বনা খুঁজছিল। তাই এত ত্বরায় ঘটনাটা ঘটবে, ভাবতে পারেনি। আর পারেনি বলেই শোনামাত্র স্থাণু করে দিল মকবুলকে। এ-কিনা বিনা মেঘে ঠাটা(বজ্র)পড়ল! না তা'তো নয়। সে তো মেঘ দেখতে পেয়েছিল। এ-ও দেখেছিল যে, সে মেঘ শুকনো নয়ঃ জল টুসটুসে মেঘ। শুধু চোখ বুঁজে সে না দেখার ভান করেছে। আর একান্তই যখন চোখ পড়ত, তখন বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাবে বলে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে এসেছে। কি করবে সে এখন, পালাবে? কিন্তু কি করে? হাত যে নিঃসম্বল। তার যথাসর্বস্ব তো ঐ নীল আসমানের নীচে দাঁড়িয়ে দুলে দুলে হাসছে। কি করবে সে এখন। কোন পথই কি নেই যাতে করে ঐ আজরাইলের হাত থেকে তার সাধের

অসহায় সকিনাকে বাঁচাতে পারে? কোন উপায়ই কি সকিনা বাংলাতে—। ভাবনায় ছেদ পড়ল। সে অসহায়ে স্থাণুর মত বসেছিল সত্য; কিন্তু দেহের বজ্রশক্তি নিয়েই বসে ছিল: কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি বলে। এবার একটা বরফঠাণ্ডা স্রোত প্রতি ধমনিতে বয়ে গেল মকবুলের। দেহের প্রতি রোঁয়াগুলো জেগে উঠল। সকিনা কোথায় গেল! তাই তো সে চারিদিকে একবার সভয়ে তাকায়। উত্তর দিকের পথটার দিকে চোখ পড়তেই আটকে গেল।—ঐ সকিনা না? ঐ যে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে? একবার ভাবল তাকে ডাকে সে; কিন্তু পারল না। তার ডাকবার শক্তিটুকু অবলুপ্ত হয়েছে আজ। চেয়ে চেয়ে সে শুধু দেখল। দেখল, মেয়েমানুষের সিঁথির মত পায়ে চলার পথ দিয়ে সকিনা সন্ধ্যার কাজল-আলিঙ্গনভরা বনের ভেতর দিয়ে মিশে যাচ্ছে ধীরে—দিন-মণির শেষ দিগন্তে নেমে আসার মত।

সারারাত আঘাত খাওয়া অজগরের মত ফুঁসেছে। বিছানায় ছটপট করছিল মকবুল। বিছানায় বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারেনি—চোখ জ্বালা করছিল। এক এক সময় আকাশের নীচে ভূতের মত পায়চারি করছিল সমস্ত উঠোনময়। শেষরাতের হিমেল হাওয়াও তার দেহের উত্তপ্ত তন্ত্রীকে ঠাণ্ডা করতে পারেনি। বারবার তার মনে হচ্ছিল, এ ফজলের বজ্জাতি। ওকি জানতনা যে সকিনা তার—একান্তই তার। তবে কেন সে তার 'মালের' দিকে হাত বাড়ায়। দেশে কি মেয়ে নেই আর? এর প্রতিশোধ সে নেবেই। জান, হ্যাঁ, একদম জান-ই নেবে যেমন করে পারে। ধড় দো-আধখানা করবে সে। পরের জিনিষে নজর দিলে ঐ ইনামিই দিতে হয়। অসহনীয় রাগে তার কানের পাশের রগ দুটো দপ্ দপ্ করছিল অনেকক্ষণ—পরদিন পর্যন্ত। উদ্দাম উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটল পরদিন বেলাশেষে খাওয়াদাওয়ার পর। শ্রান্তিতে দুচোখ ভেঙ্গে এল। জগতের সমস্ত ক্লান্তি এসে পুঞ্জিত হয়েছিল যেন ওর চোখে। সে ঘুম আর যেন ভাঙ্গতে চায় না। ঘুমের মদালস আবেশ সর্বাঙ্গে মিশে রইল পুরো তিনদিন—শনিবার অব্দি। স্বেচ্ছায় জড়িয়ে রাখল মকবুল। কি হবে আর জেগে থেকে। এইতো বেশ।

চতুর্থদিন বেরোল সে। মাঠের দিকে গেল। ধানের শীষগুলির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল। ভাবছিল, দুধঘন হয়েছে অনেকদিন। আর কদিন বা বাকী ধান পাকতে কিন্তু কি লাভ! ভাবতেই বুকের ভেতর এক অসহ বেদনা মোচড় দিয়ে ওঠে। কি হবে আর ভেবে। সময় আসুক, উঠুক ধান হাতে আসুক টাকা, তখন দেখা যাবে হুমুন্দিরপুত—ঐ ফজলকে। 'জানডা' দোজখের নিশানা দেখাতে পাঠাবে। জায়গা জমি বিক্রী করে সে পালাবে সকিনাকে নিয়ে। সকিনা তাতে রাজী। গররাজী সে কেন হবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাতটা দিন কেটে গেল এর ভেতর। এ কয়দিন খুব কমই ঘর থেকে বেরিয়েছে মকবুল। ভূতে ধরা মানুষের মত কাটিয়েছে সে আধো অন্ধকার ঘরে—মাচার উপরে শুয়ে শুয়ে কত ভেবেছে। অতীতকে শুধু রোমন্থন করেছে। বর্তমানে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিশ্লেষণ করে নিজেকে হাজার রকম-ভাবে অপরাধে অপরাধী করেছে সে। মাঝে মাঝে সকিনাকে ও না দুষে পারেনি। সে যদি তার বাজানকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলত তাহলে কি এরকমটা ঘটত? যতই অর্থপিশাচ হোকনা কেন, বাপতো? কোনভাবেই সে স্বস্তি পায়নি। হিংস্রভাবে শুধু ভেবেছে সকিনার বাপ—বদন আলী ও ফজলকে। ওদের মূর্তি ভেসে উঠলে মকবুলের মানসপটে, ক্ষুধার্ত বাঘের মত চেয়ে থেকেছে নিমেষনিহিতে।

আজ ক্ষেত দেখতে যাবে বলে মনস্থির করল সে। পড়ন্তসূর্যের শেষ রক্তাক্ত রশ্মিগুলো দরমার বেড়ার ফুকো দিয়ে তির্যক সরু অসংখ্য সরল গতিতে ঘরে ঢুকে কোণের অন্ধকারকে আরো নিকষ কালো করে তুলল। শীতের আমেজ পড়েছে। খাটো আটোসাটো মেরজাই গায়ে চড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ল মকবুল।

সারাদিন উত্তরে হাওয়া দাপাদাপি করে বিকেলের দিকে পড়ে যায়। কদিন ধরেই এরকম হচ্ছিল। আজ-ও হাওয়া থেমে গেছে। বাতাস কেমন যেন ভারিভারি। কুয়াশা এখন যদি-ও পড়েনি, তবু দূরে দৃষ্টি এগিয়ে দিলে দেখা যায় একটা তরল হাল্কা নীলাভ ধোঁয়া যেন ধানের শীষগুলোকে আদর করছে। সন্ধ্যার কাজল মসলিনের পর্দায় পর্দায় নেমে আসতে লাগল।

বিহঙ্গের কাকলী আসতে লাগল ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে। শুধু শাঁই শাঁই শব্দ তুলে সার বেঁধে বেলেহাঁসগুলো উড়ে যাচ্ছে। মাথার উপর ঝাঁক বেঁধে মশার ঐকতান। ক্ষেতে দুএকজন যাওবা লোকজন ছিল তারাও যে যার ঘরপানে গেল। ধীরে ধীরে তারা ফুটল আকাশে এক এক করে—সব কটি। দূরে গাছগুলো এখন জমাট বাঁধা অন্ধকার শুধু। তার-ই মাঝ থেকে লণ্ঠন-কুপির লাল আলো উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল মধ্যে মধ্যে। শীত শীত করতে লাগল মকবুলের। একবার আকাশের দিকে চেয়ে ভেবে নিল কি যেন। তারপর বাড়ির দিকে পা বাড়াল। কিছু দূর এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে পুবপাড়ার দিকে রওনা হল। বেশ শীত শীত করতে লাগল। হাত দুটো বগলদাবা করে ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে এগোতে লাগল। শীতটা যেন আরো বেশি করে বোধ হতে লাগল। ভয় করছে কি মকবুলের? থেমে পড়ল মকবুল। ভাবল, যাবে কি যাবে না। না, যাবে। যা থাকে অদৃষ্টে।

বাদাম গাছের নীচে এসে দাঁড়াল মকবুল ভূতের মত। ঘরে আলো জ্বলছিল। ফুকো দরমার বেড়া নিয়ে লম্পের বিবর্ণ লালচে আলো বেরিয়ে আসছিল। পা টিপে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মকবুল। ফজলের ঘরের ভিত তেমন উঁচু নয়। বেড়ার ফুকোতে চোখ লাগিয়ে দেখতে চেষ্টা করল মকবুল। কুপির মৃদু আলোতে সবই দেখা যাচ্ছিল। ফজল-সকিনা দুজনে খেতে বসেছে। সকিনা মাথা নীচু করে আর ফজল হেসে হেসে নিম্ন কণ্ঠে কি যেন বলছে। মাঝে মাঝে সকিনা ঈষৎ মাথা দোলাচ্ছে। বুকটা কেমন ধ্বক্ করে উঠল মকবুলের।—তবে কি সকিনা ফজলকে—। এক গভীর হতাশা নেমে এল সমস্ত বুক জুড়ে।—ভুল দেখছে কি সে? না তাতো নয়। তবে? একটা জ্বালা ধীরে ধীরে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার। চোখ দুটো শ্বাপদের মত চক্‌চক্ করতে লাগল। ইচ্ছে করছিল এখুনি ছুটে গিয়ে টুঁটি চেপে ধরে ফজলের। কিন্তু কিছুই করলনা সে। শুধু জ্বালাময় চোখ নিয়ে দেখতে লাগল। খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে বোধ হয়। উঠে দাঁড়াল ফজল। মকবুল সরে এল সেখান থেকে। এসে দাঁড়াল বাদাম গাছটার আড়ালে। ফজল দাওয়ায় এসে মুখ ধুয়ে ভেতরে গেল। মকবুল দাঁড়িয়ে

রইল—নিশ্চল হয়ে। অনুমান করছিল, এঁটো সানকিবাসন ধুতে সকিনা অবশ্যই পুকুর ঘাটে আসবে। অনুমান মিথ্যা হল না। সত্যি কিছুক্ষণ পর বাইরে এল সকিনা। হাতে বাসন-কোসন। দাওয়া পেরিয়ে নীচে নেমে এল।—সকিনা এখান পেরিয়ে তবে পুকুরঘাটে যাবে। তর সইছিল না মকবুলের। ত্বরায় আসছেনা কেন সকিনা। অধীর উত্তেজনা আর বুঝি চাপতে পারে না সে। বাদাম গাছের কাছে আসতে ফিস ফিসে স্বরে ডেকে উঠল সে, ছকিনা! বলে বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে।

আপন মনে আসছিল সকিনা। এই অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল, আ———।

—ছকিনা, মুই মকবুল! ব্যস্তভাবে, চাপা স্বরে বলল।

সব কিছু আচমকা ঘটে যাওয়ায় সকিনা ঝড়ের বাঁশপাতার মত কাঁপছিল। হাত থেকে বাসন গেল পড়ে। সানকি দুখানা ভেঙ্গে গেছে, এনামেলের বাটি দুটো গড়াগড়ি যাচ্ছে। চীৎকার শুনতে পেয়ে হেঁকে উঠল ফজল, কি লো ছকিনা?

মকবুল দেখতে পাচ্ছিল না; তবে বুঝতে পারছিল, সকিনা কাঁপছে। বলল, হুমুন্দির পুত আইতে লাগছে। অহন পলাই। কাইলগো আমু, আবার ভয় পাইসনা। বলেই বাদাম গাছটার পুবদিকে বাঁশ ঝোপের পাশে গিয়ে লুকাল। এখনি পালাতে গেলে হয়তো চোখে পড়ে যাবে ফজলের। কুপি হাতে ফজল বেরিয়ে এল। দাওয়ায় দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল, কি হইল ছকিনা? বলে ত্বরিৎপদে এগিয়ে এল সকিনার কাছে। সকিনার কাঁপুনি এখনো মিলিয়ে যায়নি। ল্যাম্পটা মুখের কাছে তুলে ধরল।

—কি লো?

—এট্টা য্যান হাপ (সাপ)—।

—কৈ দেহি (দেখি)?

সকিনা পশ্চিমে পুকুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল শুধু।

হেমন্তের শেষ। শীতের মুখ। এরি মধ্যে হাত কাঁপান শীত পড়েছে।

এখনো সূর্য কুয়াশার স্তর ভেদ করে গাছের ডালপালার মধ্যদিয়ে হাত প্রসারিত করেনি। তবে পুবকোণে নবারুণের লালিমা অনেকটা কেটে কাঁচা সোনার রং ধারণ করেছে। বেলা বেশ কিছু হয়েছে বোঝা যায়। মকবুল একটা সুতীর চাদর মুখ অব্দি জড়িয়ে মাঠের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত ধান স্থির। কুয়াশা তার নীল দেহ দিয়ে ধানের শীষে আলিঙ্গন করছে আর চুমু দিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে। কালই অনেকে নেমেছে মাঠে। আজ প্রায় সব্বাই নামবে। ধান যখন পেকেছে তখন ঘরে বসে থেকে সময় নষ্ট করে কে। মকবুলের অবশ্য সে ব্যস্ততা নেই। সে তার ধান মাঠ সুদ্ধু বিক্রি করেছে ঐ সকিনার বাজানের কাছে। বদন আলী প্রথমটায় বিস্মিত হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, ধান বিক্‌কিরি করবা ক্যান!

—হুদা ধান না, জমিও।

—বছরের খোরাকি ধান?

—কিছু লাগবে না। কইলাম যে জমিও বেচুম। একটু কাশ থেকে বলল, দলিল পত্তর-ও লগে আনছি।

বিস্মিত বদন আলী অপলক চোখে তাকিয়ে রইল মকবুলের মুখের দিকে।—জমি বিক্‌কিরি কইরা পরে খাবা কি?

—সদরে যামু, হেইহানে গিয়া এটা ব্যবসা দিমু।

—এইহানে আর থাকবা না?

—না।

—বাস্তুভিডাও ব্যাচবা!

—না, ওডা অহন থাউক, পরে দেহা যাইবে।

বদন আলী ধান সুদ্ধ জমি কিনে নিয়েছে। মওকা বুঝে বেশ কিছু কম দিয়েছে। টাকা নিয়ে চলে আসবার সময় বদন আলী বলেছিল, পোলাডার মাথায় জিন ঢোকছে। সে কথা কানে গিয়েছিল মকবুলের।

এখন মনে পড়তে মনে মনে হাসছিল মকবুল। বহুদিন বাদে আজ মন বড় ভাল লাগছিল তার। দেহ-মন বেশ হাল্কা। বেলা বেড়ে যাচ্ছে। একে একে অনেকে নেমে পড়ছে মাঠে। রোদে তেতে উঠেছে শরীর। চাদর খুলে কোমরে বাঁধল সে। রোদের দিকে পিঠ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

আজ সে ধান কাটা দেখবে—ধান কাটবে না। কাসেম কাস্তে নিয়ে ক্ষেতে নামবার মুখে মকবুলকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে, কি ভাই, লাম্বা না?

—আইজ না। হাসতে হাসতে উত্তর দেয় মকবুল।

—দেরি কইরা কি লাভ।

কোন উত্তর না দিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসে মকবুল।

অনেক নেমে পড়েছে। ধান কাটার কাজ শুরু হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে শুধু, না—কয়েকটা ধানগাছই নড়ে শুধু; কিন্তু লোক দেখা যায় না। ধীর স্থির প্রশান্ত ধানক্ষেতে মাঝে মাঝে একটু আলোড়নঃ ছোটছেলেদের লুকোচুরি খেলবার মত মনে হচ্ছিল। বেশ লাগছিল দেখতেঃ সোনার দানার মত ধানগুলির ওপর রোদের সোনালী আলো—যেন গর্জ্জন দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলা কোন জিনিস। দূরে, ধানক্ষেতে সহসা কোলাহলের সৃষ্টি হতে একে একে অনেক কালো কালো মাথা ধানগাছ ডিঙ্গিয়ে জেগে উঠল। সকলেই যেন কিছুটা হকচকিয়ে গেছে। কোলাহলের দিকে এগোতে লাগল অনেকে। সবাই বুঝতে পেরেছে দাঙ্গা বেঁধেছে। এ ওদের প্রায় বছরের ব্যাপার। মাঠে হাল দেবার সময় আর একবার ধান কাটবার সময়। মকবুল উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল। পরে একটু দেঁতো হেসে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

সকিনা তখন রান্না করে। ভাত হয়েছে। চড়িয়েছে সালন। ঠিক তখন উঠোনে কোলাহল হতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। এসেই চক্ষুস্থির। দেখে, ছ-সাত জন মিলে ফজলের বিরাট দেহটা ঘরের দাওয়ায় শুইয়ে দিচ্ছে। সমস্ত দেহ তার রক্তাক্ত। কয়েকজন উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের একজন সহসা ছুটে বেরিয়ে গেল। বোধ হয় হিন্দু পাড়ায়-এলোপ্যাথি ডাক্তারকে আনতে। একটা কাতর গোঙানি শুধু বেরিয়ে আসছিল ফজলের মুখ থেকে।—একি হল! এই তো কিছুক্ষণ আগে সুস্থ সমর্থ মানুষটা বেরুল মাঠের কাজে। আর এরি মধ্যে কি হল? চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে সকিনা হোগলার তৈরী ঝাপদরজা ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

আরো বেশ কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার এলো। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কি যেন করল। তারপর যাবার সময় বলে গেল, ভয় নেই। ওষুধের তীব্র গন্ধে নাক জ্বালা করছিল সকিনার। গা বমি বমি করছিল,—বুঝি বা বমি করে ফেলে। সকলেই চলে গেল। যাওয়ার আগে একজন তাকে উদ্দেশ্য করে বলে গেল, সরিবোচনগো লগে ধান লইয়া লাগছিল। ওরা অনেকে মিইল্যা ফজলরে মারছে। হাতে এট্টা জবর কোপ পরছে কাছির (কাস্তের) আর গায়ে মাথায় গোডা কয়েক লাডির বাড়ি পড়ছে। তবে ভয় নাই। একটু থেমে আবার বলল, ফৈজোরে (বিকালে) আইয়া ফের দেইখ্যা যামু।

ওরা চলে যেতে এক অবুঝ ভয় সকিনাকে ঘিরে ধরল। কেন যে এমনটা হলো কিছুতেই বুঝতে পারছিল না সে। কতক্ষণ যে সেখানে সে দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল নেই তার। সালন পোড়া গন্ধে হুঁস হলো। কড়াটা উনোন থেকে নামিয়ে কাঠগুলো টেনে বের করে জল দিয়ে নিবিয়ে চুপ করে বসে রইল। খাওয়া-দাওয়া তার মাথায় উঠেছে। দেহে এখন আর যেন সে জোর পাচ্ছে না। হাত-পা অবসাদে ভেঙ্গে চুরে আসছে। নিশ্চল মূর্তির মত বসে রইল সকিনা। উনোনের আগুন তখনো দকদক করছে। সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঘটে যাওয়া সমস্ত ব্যাপারটা সে অনুধাবন করতে চেষ্টা করল।—কেন এমনটা হলো! কিন্তু এতে আশ্চর্যের কি আছে? সে তো বরাবর দেখে আসছে; প্রায় প্রতি বছর একটা না একটা ঘটে আসছে এরকম ঘটনা। এবারো ঘটেছে। কিন্তু তবুও মন সায় দিচ্ছে না। একদম প্রথম দিনেই!—প্রথম দিনেই তো প্রতি বছর ঘটে।......ফজলের গোঙানিতে সকিনার ভাবনায় ছেদ পড়ল। উঠে দাঁড়াল। রান্নাঘরের ঝাপ দরজা বন্ধ করে ফজলের কাছে এল। ফজলের সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। এমন শক্ত সমর্থ মানুষ কি নির্জীব অসহায়ের মত গোঙাচ্ছে! দেখে দুঃখ হলো সকিনার, শিয়রের ধারে বসলো সে। ফজলের পেশীবহুল শিথিল দেহটা দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেখে কেমন একটা কান্নার বেগ চাপল তার।—এই ফজল তো তার অনেক সর্বনাশ করেছে। কতদিন তার মৃত্যু কামনা করেছে—হ্যাঁ করছে। ভেবেছে, তার যদি সাপের মত বিষ থাকত তা হলে রাতে ওর উন্মত্ত বোবা আদর সইত না।

কিন্তু সত্যি কি সে পারত, পারত এই সুন্দর দেহটাকে ক্ষত বিক্ষত করতে ?

দুপুর হলো। দুপুর গড়িয়ে এল সন্ধ্যা। সন্ধ্যার পর এলো পড়শীরা। ধরাধরি করে তারা ভেতরে তক্তাপোষের ওপর শুইয়ে দিল ফজলকে।

রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ফজলের কাতরানি বাড়তে লাগল। এত বড় জোয়ান মানুষটা শিশুর মত ছটফট করতে লাগল। দেখে বুক ফেটে কান্না আসতে চাইল সকিনার।—আহা কি হলো লোকটার। আনচান করতে থাকে তার মন, চোখে জল ভরে এল। কি অসহায় এই লোকটা। আজ সকাল পর্যন্ত যে লোকটাকে নির্দয় আজরাইল বলে মনে করেছে, সে কিনা এত শিশু! এত বড় দেহের ভেতর এই শিশুটি লুকিয়ে ছিল এত দিন! সে তো কিছুই টের পায়নি। সকিনা ফজলের মাথা কোলে তুলে নিয়ে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রইল তার নিমীলিত চোখে-মুখের দিকে। চওড়া শক্ত চোয়াল-ও শিশুর মত কোমল মনে হলো আজ সকিনার।—এমন করে কেন মারল লোকটাকে ; কি করেছে সে ? জমির জন্য ? আজ তা-ও যেন মিথ্যার মত প্রতিভাত হচ্ছে তার কাছে।—তবে কি— ?

—পানি। কাতরে উঠলো ফজল।

আস্তে আস্তে মাথা নামিয়ে তক্তাপোষ থেকে নেমে এলো সকিনা। রান্নাঘরে গিয়ে কলাই করা গ্লাসে জল নিয়ে এলো সে। একটু একটু করে জল খাইয়ে দিতে লাগল ফজলকে।

সকিনার দিকে চেয়ে ফজল বলল, বড় ব্যথা ছকিনা। চোখ দুটো কেমন ভিজে উঠল ফজলের। সকিনা-ও ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। তার মনে হতে লাগল এ কান্না ফজলের পৌরুষের কান্না। সে প্রতিশোধ নিতে পারেনি বলে তার পৌরুষে আঘাত পড়েছে।

বাইরে একটা খচ্‌মচ্‌ শব্দে হতে সচকিত হয়ে উঠল সকিনা। ধীরে ধীরে চোখের জল মুছে ফেলল। সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে ধরল ফজল সকিনার দিকে।—শিয়াল আইছে বুঝি? শুনে একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সহসা সকিনা। তক্তাপোষ থেকে সকিনা নামতে ফজল জিজ্ঞাসা করল, যাও কৈ ?

ওন্‌থারঘর (রান্নাঘর) উদলা থুইয়া আইছি। মুহূর্তের মধ্যে কেমন বদলে গেল সকিনা। ফজল তাই দেখে চুপ করে চোখ বুজল।

শব্দ হতেই মকবুল সরে এল বাদাম গাছটার গোড়ায়। আজ আর তার সবুর সইছে না। দেহমন তার খুশিতে ডগমগ করছে। অদম্য আবেগে অস্থিরভাবে পদচারণা করছে সে। সব প্রস্তুত। ডিঙ্গিটা জারুল গাছে বেঁধে এসেছে সে। প্রয়োজনীয় সব কিছু নৌকায়। একবার কোমরে হাত দিয়ে টাকার গেঁছেটা দেখে নিল। কিছু ভয় নেই। 'হুমুন্দির পুত' আছ বিছানায়। একটু হাসল মকবুল।—কিন্তু এখনো আসছে না কেন সকিনা? তা একটু দেরি হবেই তো,—ভাবল সে।—সবকিছু গোছগাছ করবে তো। —ঐ তো আসছে। সকিনা, না?—হ্যাঁ, সকিনাইতো। ছুটে এগিয়ে যায় মকবুল। কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

—মেঞা হগল (সকল) বোঝতে পারছি। সকিনার হাতে ধান কাটা কাস্তে। তার ফলা দংশনোদ্যত ফণীর মত উঁচু হয়ে আসছে মকবুলের দিকে।—আন্দারে আইছ পরের বউর লগে পিরীত জমাইতে। সরম করে না কসবীর ছাও। আবার আইলে জানডা হাতে লইয়া আইস্, কসবীর ছাও।

তিন পা পিছিয়ে এল মকবুল ভয়ে। ভয়বিস্ময়নিহিত চোখে চেয়ে রইল মূর্তির দিকে। ভাবল, এই রহস্যময়ী কে? সকিনা?

মানস ॥ কার্তিক ১৩৬২

এখানে কোথাও কুয়াশা নেই। কিন্তু অনাদি জানে আর কিছু দূর এগোলে সাদা সাদা চাপ চাপ কুয়াশা দেখা যাবে। গতি-মুখের দুপাশে, দূর দিগন্তের সব কিছুকে আড়াল করে অসীম আকাশের সঙ্গে মিলে গিয়ে শূন্য নিরুচ্চার হয়ে থাকবে। তার এই কুয়াশাকে বড় ভাল লাগে। আর ভাল লাগছে, কিছুক্ষণের মধ্যে সে সেই সাদা সাদা চাপ চাপ শূন্য নিরুচ্চর কুয়াশা দেখতে পাবে বলে। কতদিন যে সে-সব দেখেনি! কতদিন? সে অনেকদিন।

গাড়ি ডায়মণ্ড হারবার রোডে পড়ল। ভোরের ফাঁকা রাস্তা। কুয়াশা নাই, তবু কুয়াশারই মতন শুধু। অনাদি আড়চোখে পাশে তাকাল। ইন্দ্রাণী বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। নির্লিপ্ত সে দৃষ্টি। মুখ-চোখ ঈষৎ ফোলা ফোলা। স্কার্ফখানা ভাল করে জড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। অনাদি জানে, ওর কোন কিছু ভাল লাগছে না। একরাশ অনিচ্ছা সঙ্গে নিয়ে ও তার সঙ্গিণী হয়েছে। ও আসতে চায়নি। ঘড়ির এলার্মে ঘুম ভাঙতেই সে উঠে পড়েছিল আর ইন্দ্রাণী শুয়ে থেকেই সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, "আমি যাব না।"

"কেন?" সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল।

"আমার ভাল লাগছে না।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ।"

"সত্যি শরীর খারাপ করেছে নাকি?"

"এই ভোরে উঠে হুটোপাটি শুরু করলে শরীর কখনো ভাল লাগে?"

"দেখ তুমি বরাবর আমার চেয়ে আগে ওঠো, এতে যদি আমার শরীর

খারাপ না হয় তবে তোমার—; আর তা ছাড়া কথা দিয়েছি যাব বলে। মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস বোস ; মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস দত্ত—"

"ঠিক আছে বাপু, মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস রায়ও যাবেন।"

অনাদির ইন্দ্রাণীর জন্য কষ্টবোধ হতে লাগল : ও যদি এখন বাড়ি থাকত তবে হয়তো প্রাত্যহিক স্বাভাবিকতার স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে তার প্রতি-মুহূর্তের অবস্থিতির কথা কল্পনা করত, আনন্দবোধ করত। ইন্দ্রাণী বাইরে থেকে মুখ ফেরাল। চোখাচোখি হতেই অনাদি তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে তাকাল। তারপর বলল, "মিণ্ট। কোনদিন দেখনি ?"

"না।" বলে ইন্দ্রাণী আবার মুখ ফেরাল।

গাড়ি এখনো তেমন ছুটছে না বলে অনাদির খারাপ লাগছিল। আরো তাড়াতাড়ি ছুটতে হবে, নইলে সূর্য উঠলে ঐ শূন্য নিরুচ্চার কুয়াশা দেখা যাবে না। কিন্তু কোন উপায় নেই। আর কিছুদূর এগিয়ে থামতে হবে। হয়তো অনেকক্ষণ থেমে থাকতে হবে। মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস বোস উঠবেন। ওঁরা উঠলে পর হয়তো তাড়াতাড়ি ছুটবে। তা ছাড়া রাস্তা ফাঁকা। তার অর্থ ঝাঁকুনি বাড়বে। পেছনে বসার অর্থই হল ঝাঁকুনি খাওয়া। অনাদি এখানে বসতে চায়নি। ইন্দ্রাণীর জন্য তাকে বসতে হয়েছে। সামনে—ড্রাইভারের পাশে দত্তদ্বয়। শব্দটা প্রয়োগ করে মনে মনে হাসল অনাদি। তাদের পাশে এসে আলগোছে বসবে বোস-দম্পতি। ব্যাস, স্টেশন ওয়াগন মোটামুটি ভর্তি। তারা এই কোম্পানীর গাড়ি না নিয়ে একটা বাস ভাড়া করলে পারত। অবশ্য অনেক টাকা লাগত। না না, টাকার কথা ভাবলে অনেক কিছুই করা যায় না।

অনাদি আবার ইন্দ্রাণীর কথা ভাবতে লাগল : ও এমন নিরুত্তাপ কেন ? ও যেন ছকে-বাঁধা স্বাচ্ছন্দ্যের খুশি। ওর সুন্দর দেহের মাপেই কি ও বাঁধা ?

অনাদি ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাল। আর একদিকে গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"গুড মর্নিং অল অফ ইউ।" ভরাট গলায় মিঃ বোস বললেন।

"গুড মর্নিং।...গুড মর্নিং।"

"কেমন আছ ইন্দ্রাণী ?" মিসেস বোস জিজ্ঞেস করলেন।

"ভাল। আপনি ?"

"ভাল। মিসেস দত্ত ?"...

গাড়ি চলতে শুরু করল। অনাদি দেখল, ঘড়িতে সাতটা বাজতে পাঁচ। তার মনটা সহসা দমে গেল। এখান থেকে না দেখা গেলেও সূর্য উঠে গেছে অনেকটা। তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো এখনো দেখা যাবে। কিন্তু উপায় নেই। তার অস্বস্তি নিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

"এ জায়গাটার কি নাম ?" ইন্দ্রাণী আস্তে করে জিজ্ঞেস করল।

"সখের বাজার।"

আর অনেকদিনের মধ্যে—আর কোনদিনই হয়তো এদিকে আসা হবে না। একমুহূর্ত চলে গেলে ঠিক সেই মুহূর্ত কখনই ফিরে আসবে না। শেষ রাতে কুয়াশা ভারী হয়ে গলে গিয়ে পাতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে টপ টপ করে পড়ার শব্দ সে তো কতকাল আগে শুনেছিল, কই সে শব্দ চেষ্টা করেও আর শুনতে পেল না। অনাদি সেই সব কথা ভাবছিল। আরো ভাবল, নতুন করে অনেক কিছুই ফিরে পাওয়া যায় না। যে ইন্দ্রাণীকে একদিন পেয়েছিল সে ইন্দ্রাণীকে তো আর পাচ্ছে না। এই সব কথা ভেবে কেন জানি অনাদির চোখের পাতা ভারী হয়ে আসতে চাইছিল। ইন্দ্রাণীর দিকে ফিরে তাকাল। আর সেও তখন বাইরে থেকে চোখ ফেরাল। ফিরিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

অনাদি আস্তে করে বলল, 'ঠাকুরপুকুর।'

'তোমার সব চেনা, না ?'

'এক সময় এখানে প্রায়ই আসতাম।'

'তাই বুঝি ?"

'একটা বিদেশী ভাষা শেখবার জন্য।'

'কি ভাষা ?'

'বলে আর কি হবে ! সে-সব ভুলে গেছি। তোমার এখন কেমন লাগছে ?'

কোন কথা না বলে ইন্দ্রাণী ছোট্ট করে হাসল।

গাড়িটা এখন ছুটতে আরম্ভ করেছে। অনাদি জানে ও আরো- আরো ছুটবে। আকাশ প্রসারিত হয়ে পড়েছে। দু'পাশের ধুধু চষা-মাঠ দু'দিন আগে সবকিছু তার উজাড় করে দিয়ে বড় করুণ রিক্ত। সূর্য কিছুটা উপরে উঠে এসেছে। ধূসর রক্তবর্ণ। দূর দিগন্তে সাদাটে কুয়াশা। অনাদি মনে মনে কিছুটা হতাশ হল। সে সাদা সাদা চাপ চাপ শূন্য নিরুচ্চার কুয়াশা দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু তা কোথাও নেই। তবু সে চোখ ভরে সবকিছু দেখে যেতে লাগল।

'আমরা সোজা দক্ষিণে যাচ্ছি, না?' ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। কেমন লাগছে?'

ইন্দ্রাণী হাসল। বলল, 'ভাল।'

'শরীর খারাপ লাগছে না তো?'

'না।'

গাড়ি এখন একটা আহত শূয়োরের মত একটানা শব্দ করে চলেছে। রাস্তা সরল ফাঁকা। অনাদির ভাল লাগছে। আর ভাল লাগছিল মিঃ বোসের, অনাদি তা দেখেই বুঝতে পারছিল। আরামে সে চোখ বুজে আছে; ঠোঁটে আরামের একটু হাসি। গাড়ির ঝাঁকুনিতে হয়তো তাঁর মেদবহুল শরীর ঘষা লেগে লেগে এক বিচিত্র সুখানুভূতি অনুভব করছিল। মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস দত্ত বিস্ফারিত চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ভয় পেয়েছে? ইন্দ্রাণী বাইরের দিকে তাকিয়ে। অনাদির খারাপ লাগছিল, দু'পাশের দৃশ্যগুলো বড় বেশী তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাচ্ছে বলে। কোন একটাও যেন পুরোপুরি রূপ পাচ্ছে না। দূর দিগন্তের অস্পষ্ট সীমারেখা ধীরে ধীরে বৃত্তাকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

'কত স্পীডে যাচ্ছে?' চোখ বুজে হঠাৎ মিঃ বোস জিজ্ঞেস করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ দত্ত সোচ্চার হলেন, 'পঁচাত্তর কিলোমিটার!' ভয়ে তাঁর গলা কাঁপছে।

অনাদির হাসি পেল। ভাবল, ওঁর যত কিছু আনন্দ এখন ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

কথা শেষ। শুধু শব্দ। হাওয়া, পথ যন্ত্রের শব্দ। অনাদি লক্ষ করছিল,

গাড়ি যখন চকিতে কোন বড় 'গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তখন একান্ত পরিচিত এক শব্দের অদ্ভুত জানান দিয়ে যাচ্ছে। সে শব্দ প্রবল ঝড়-জলের শব্দ। অনাদির ভাল লাগছিল। সে ভাবল, এখন চোখ বুজে শৈশব কি ছেলেবেলার কোন একটা ঝড়ের কথা স্মরণ করতে পারে। কথাটা ভেবে আবার হাসি পেল তার।

'অন্য গাড়িটা কোথায়?' চোখ বুজেই মিঃ বোস জিজ্ঞেস করলেন।

দত্ত নিরুত্তর। অতএব অনাদিকেই বলতে হল, 'আমাদের আগেই বেরিয়ে গেছে!'

'সবকিছু ঠিক তো?'

'আজ্ঞে।'

দত্তদ্বয় সামনের দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে। অনাদির খারাপ লাগছিলঃ এতে ড্রাইভারকে নার্ভাস করে দেওয়া যচ্ছে। তত ভয় নিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসা উচিত হয়নি। অনাদি বিরক্তিভরে বাইরের দিকে তাকাল। সূর্যের অবয়ব পূর্ণ হচ্ছে। কুয়াশা আরো কিছুটা ফিকে। দূরে-অদূরের গাছের পাতাগুলো যেন ঘাম-তেলে চকচকে। পাতা বা ফুলের গায়-গায় বুঝি এখনো কিছু কুয়াশা। রাস্তা বুঝিবা স্যাঁতসেঁতে। দু'পাশের ক্ষেত রিক্ত। অনাদি ভাবল, বৈরাগ্য বুঝি এই!

তাদের মত আজ অনেকে চলেছে। আশে-পাশে শুধু গতি—গতি, গতির আরাধনা চলেছে। ডান পাশের একটা স্কুল-বোর্ডিং-এর বারান্দা থেকে চাদর গায় দুটো ছেলে তাদের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল। অনাদিও এর প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। সহসা অপ্রস্তুতের মত গাড়ির ভিতরে তাকাল। ইন্দ্রাণী তার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে। সে-ও হেসে ফেলল। ততক্ষণে গাড়ি অনেকটা চলে এসেছে।

পশ্চিম দিক শুধু নীলাভ সাদা। আর কিছু নেই। অনাদি সেদিকে তাকিয়ে যেন কিছুটা তৃপ্তি পেল। গাড়িখানা অসম্ভব ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে আস্তে মাটির রাস্তা বেয়ে নীচে সমতল জমিটার দিকে নামতে লাগল। ইতস্তত কিছুলোক সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা কি হিন্দী ছায়াছবির গান

স্বরবিস্তারসহ গীত হচ্ছিল। শুনে অনাদি শঙ্কিত হল। ভাবল, এখনি এই; তারপর!' গাড়ি সমতল ভূমিতে নামল। ধীরে ধীরে দক্ষিণে ঐ বিস্তৃত উঁচু ঢিবিটার দিকে এগোতে লাগল। আর একটু এগোতে অনাদি তাদের অন্য গাড়িখানা দেখতে পেল। গাড়িটা একটা নালার কাছ ঘেঁষে রাখা হয়েছে উত্তর দিকে মুখ করে। ক্যান্টিনের ঠাকুর-চাকর দুটো এখনো গাড়ি থেকে মালপত্তর সব নামাচ্ছে। আর ড্রাইভার রতন ওদের সাহায্য করছে। তার মানে ওরাও বেশীক্ষণ হয়নি এসেছে। ও গাড়িটাও ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নেমে মাটির ওপর দাঁড়াতে অনাদির কেমন কষ্ট-কষ্ট লাগছিল। একটানা এতক্ষণ বসে থেকে ও এত দ্রুতবেগে ছুটে আসার ফলে দেহের ভারসাম্য যেন হারিয়ে ফেলেছে। একটুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভাবল, হাত ছড়িয়ে, গা বেঁকিয়ে 'আঃ' করে একটা শব্দ করে শরীরের আর ভাঙাবে কি না। কিন্তু পারল না। ওটা বাড়ির চার-দেওয়ালের মধ্যেকার ব্যাপার—এখানে সম্ভব না। তাই নিপুণ ভদ্রভাবে দুই টো-র ওপর হাত-পার পেশী শক্ত করে উঁচু হয়ে দাঁড়াল। একটুক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে তারপর পা ছড়িয়ে সহজভাবে দাঁড়াল। একটা সিগারেট ধরাল। আয়েস করে টান দিল। এরপর চারদিকে একবার ভাল করে তাকাল। দেখল, এবড়ো-খেবড়ো ঢালু পথ দিয়ে তাদের মত লোকজন নিয়ে আরো এক-আধখানা করে গাড়ি কাঁপতে কাঁপতে সমতল ভূমিতে নেমে আসছে। জমিটা বেশ বড়। এধারে ওধারে দু-চারটে চা-সিগারেট-এর দোকান বসেছে। আরো গোটাকতক সাজগোজ করতে লেগে গেছে। অনাদি একটা ছোট করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হঠাৎ অন্য সবার জন্য সচেতন হয়ে উঠল। ফিরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তাকাল। ওরা সবাই কিছু দূরে নালার পারে দাঁড়িয়ে কি নিয়ে যেন আলোচনা করছে। অনাদি সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুটি গুটি ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

কাছাকাছি যেতে মিঃ বোস বলে উঠলেন, এই যে রায়, ঐ জায়গাটা তোমার কেমন লাগে।' বলে আঙুল দিয়ে উঁচু ঢিবিটার গা ঘেঁসে এক-টুকরো সমতল জমি দেখাল। লক্ষ করল অনাদি মিঃ বোস তাকে শুধু 'রায়

ও তুমি' বলে সম্বোধন করছে। হঠাৎ শুনে প্রথমটায় খারাপ লাগলেও পরে মনে মনে খুশী হয়ে উঠল। একটু দেখে নিয়ে বলল, 'মন্দ নয়।'

'কিন্তু বড্ড বেশী নেকেড হয়ে পড়বে না?' মিঃ দত্ত তাড়াতাড়ি ভ্রূ কুঁচকে বললেন।

অনাদি একটু হেসে বলল, 'এরকম দিনে কোথায় আর আব্রু—এ প্রসঙ্গে বরং এদের 'মতামত—' এইটুকু বলে মিসেস বোস ও মিসেস দত্তের দিকে তাকাল।

'কিন্তু এই খাল পেরুবে কি করে?' মিসেস বোস জিজ্ঞেস করলেন।

'সে ব্যবস্থা এখনি হবে।' সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বোস বললেন।

নালার জল ভাঁটার টানে টানে নেমে গেছে অনেক। এখন সামান্য জল যেন স্থির হয়ে আছে। একলাফে অনায়াসে পেরিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু জোয়ারের পলি ও কাদা নালার দু' পারের অনেকটা অবধি রক্তিমাভ হয়ে থিকথিক করছে। সেখানে পা বাড়ালে রক্ষা নেই—তারা সোহাগ আলিঙ্গন করবেই।

'মুনিলাল!' মিঃ বোস ডাকলেন।

'জী সাহাব।'

'গোটাকতক থান ইঁট জোগাড় কর তো।'

মুনিলাল এদিক-ওদিক ইঁট খুঁজতে লাগল। অনাদি অবাক হয়ে ভাবল, এখানে ইঁট দিয়ে কি করবে। মিসেস বোস জিজ্ঞেস করলেন, ইঁট দিয়ে কি হবে?'

'দেখই না কি করি।'

মুনিলাল রতন ওরা তিন-চারজনে ইতিমধ্যে গোটাকতক থান ইঁট এনে হাজির করল।

মিঃ বোস একখানা থান ইঁট হাত দেড়েক দূরে পলি-কাদার মধ্যে পাতলেন, তারপর আর একখানা ইঁট হাতে নিয়ে পাতা ইঁটের ওপর পা দিয়ে এগোতে গিয়ে টাল না রাখতে পেড়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুনিলাল তার আগেই মিঃ বোসকে ধরে ফেলল। দু'জনের দুখানা পা কাদায় ভরে

গেল। অনাদি অতিকষ্টে হাসি চাপল। মুনিলাল বলল, 'সাহাব, এভাবে কখুনো হোবে না।'

'কিন্তু—'

'আপনারা ঐ পূব দিকে ঘুরে যান। হামারা সোব ঠিক করে লিচ্ছি।'

'তোমরা চারজনে কি পারবে? ওরা ঘুরে যাক। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব।'

'কুছু ভাববেন না সাহাব; হামারা সোব ঠিক করে লিচ্ছি।'

এখন আর সূর্যের দিকে তাকান যায় না। তার ম্লান রক্তিমাভ রঙ কেটে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করেছে। অনাদি একবার তাকানর চেষ্টা করল: কিন্তু পারল না।

দু' চোখের দু জোড়া পাতা কুঁচকে এল। কিছুক্ষণের জন্য যেন দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেল—কেমন অন্ধকার অন্ধকার। চারিদিকের কুয়াশা—দূর দিগন্তের ঘোলাটে কুয়াশা এখন আর নেই: নীলাভ হয়ে উঠেছে। সব—কেমন শান্ত নীল—নির্জন। একটু আগের সেই কনকনে স্যাঁতসেঁতে কনকনে ভাব অনেকটা কমে এসেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা আগের চেয়ে বেড়েছে বলে অনাদির মনে হল। থমথমে ভাবটা কেটে গিয়ে হাওয়া দিচ্ছে। একটানা উত্তুরে হাওয়া। ক্রমশ বেড়েই চলেছে। নগ্ন প্রান্তরটার কোথাও আড়াল নেই। পুরনো সব কিছুকেই যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই শীতে রোদ বড্ড মিষ্টি লাগছে। কিন্তু আরো বেলা বাড়লে তখন খারাপ লাগবে। অনাদি ভাবল। সমস্ত শরীর শুকনো হয়ে চড়চড় করবে। মাথা চনচন করবে। ত্রিপল দিয়ে একটা যেমন-তেমন আচ্ছাদন একান্ত দরকার।

ইতিমধ্যে সমগ্র প্রান্তরে অনেক লোক এসে গেছে। নালার ওপার এখনই যেন লোকে থইথই করছে। আরো গাড়ি আসছে—আসবে। ছোট ছোট চা-সিগারেটের দোকানগুলো ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে। তাদের এদিকটা এখনো অপেক্ষাকৃত নির্জন। উঁচু ভগ্ন-স্তূপের পাশে শুধু তারা। না, ভাল জায়গায় তারা বেছে নিয়েছে।

ছোট একখণ্ড ত্রিপল বিছিয়ে ইন্দ্রাণী ও অন্যরা পা গুটিয়ে বসে পড়েছে। অনাদি আবার এতক্ষণ একঠায় দাঁড়িয়ে যেন আড়ষ্ট আড়ষ্ট অনুভব করতে লাগল। ওদের পাশে বসে পড়বে কি না, সে ভাবল একবার। মিঃ দত্ত ডান হাত প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে উত্তর দিকে মুখ করে পাথরের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টেনে যাচ্ছেন। মিঃ বোস মুনিলালদের পাকা গৃহিণীর মত নির্দেশ দিয়ে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। পশ্চিম আকাশ নীলাভ সাদা। অনাদি তীক্ষ্ণ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে যেন একটা কালো আবছা অসমান রেখা দেখতে পেয়েও পাচ্ছে না। নদীর জল শীতল পাটির মত শান্ত। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট কিছু নৌকা। একসময় অনাদি একমনে ইন্দ্রাণীর পাশটিতে বসে পড়ল। ডান হাত দিয়ে একবার মুখখানা মুছল। মনে হল, সমস্ত মুখ কেমন ভিজে গেছে।

'নিন্ খান!' বলে মিসেস বোস হাসতে হাসতে অনাদির সামনে একখানা পিরিচ ধরল। তাতে দুখানা পরোটা, একটু তরকারি, দুটো সন্দেশ।

অনাদি অবাক হয়ে মিসেস বোসের দিকে তাকাল।

'নিন্।'

'তা না-হয় নিচ্ছি। কিন্তু এ-সব পেলেন কোথায়?'

'এটা আবার একটা প্রশ্ন হল?' পরে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'বাড়ি থেকে আনা হয়েছে!'

'ব্যবস্থা ছিল তো—'

'সব এখানে হবে। এই তো? তা হয়তো হবে। কিন্তু সে কি দশ-এগারোটার আগে সম্ভব হবে?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মিসেস বোস হাসতে হাসতে বললেন, 'নাঃ এখনো আপনারা কপোত-কপোতী যথা—; পাকা সংসারী হতে ঢের ঢের দেরি।' মিসেস দত্ত খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

মিঃ দত্ত ঠোঁট টিপে হয়তো হাসি সংবরণের ভান করলেন। কখন এরি মধ্যে মিঃ বোসও এসে গিয়েছিলেন। এবং তিনি তাঁর ভুঁড়ি কাঁপিয়ে ভারী গলায় শব্দ করে হাসতে লাগলেন। ইন্দ্রাণী কিছুটা সপ্রতিভভাবে সলজ্জ

মুখ করে মাথা নীচু করল। এখানে হয়তো এরকমটাই উচিত। কিন্তু অনাদি লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠবার কথা ভাবছিল।

'থাক উঠে আর কাজ নেই; চা খেয়েই না-হয় উঠবেন।' মিসেস বোস বললেন।

সূর্য আরো অনেক ওপরে উঠেছে। হাওয়া যেন আরো চেপেছে। তবু গায়ের আলোয়ানখানা এখন অতিরিক্ত বলে মনে হচ্ছে অনাদির। কেমন বিশ্রী গরম লাগছে। মুখ-হাতের চামড়া চড়চড় করতে শুরু করেছে। শরীর কেমন ঝিমঝিম করছে। ওপারের দিকে চাইল অনাদি। আকাশ স্বচ্ছ নীল। শুধু সূর্যের বৃত্তটা ঈষৎ উজ্জ্বল পিঙ্গল। যেন কিছু তপ্ত গলিত ধাতব মসৃণভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বৃত্তাকারে আকাশের গায়। তাপ বেড়েছে। লোকজন বেড়েছে প্রান্তরে। কোলাহল স্বরবিস্তার সবকিছু বেড়েছে। অনাদি মনে মনে হাসল। ভাবল, বাড়েনি শুধু নির্জনতা।

উত্তর দিকে যেন ধুলো উড়ছে। হঠাৎ প্রান্তরটার দিকে তাকালে মনে হয়, ওখানে যেন একটা মেলা বসেছে। দূর দিগন্ত এখনো নীলাভ ধূসর। নদীর জল তেমনি শান্ত। ওপারের কালো রেখা যেন থেকেও নেই।

মিঃ বোস শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়ছিলেন। গায়ে শুধুমাত্র একটা গেঞ্জী। হাত নাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভুঁড়ি থলথল করে কাঁপছে। গায়ে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাঁকে এইভাবে পরিশ্রম করতে দেখতে হচ্ছে বলে অনাদির খারাপ লাগছিল। কিন্তু তার কিছু করবার নেই। সে ও মিঃ দত্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল তাঁকে সাহায্য করতে। মিঃ বোস কিছুতেই তাদের কোনকিছুতে হাত দিতে দিলেন না। তিনি একাই মুনিলালদের সাহায্য করবেন। অদ্ভুত ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসেছে। মিসেস বোসকে হয়তো আজ দেখাতে চান তিনি এখনো কতখানি অ্যাকটিভ আছেন। এরকম সুযোগ পাওয়া দুর্লভ। কিংবা এই রকম পরিবেশে—এই উন্মুক্ত আকাশের নীচে এসে রাশভারী লোককেও হঠাৎ ছেলেমানুষির পাগলামিতে পেয়ে বসে। আচ্ছা, এখন যদি অফিসের কোন স্টাফ মিঃ বোসকে দেখে, তা হলে সে কি ভাববে? নিশ্চয়ই সে ভাববে, 'একি,

বোসসাহেব না ? সেকি'—তার মানসিক অবস্থার কথা কল্পনা করে অনাদির হাসি পেল ; লজ্জাবোধ করল সে। অনাদি একবার তাড়াতাড়ি চারদিক তাকাল সত্যি কেউ আছে কি না। উত্তর দিকের প্রান্তরটায় লোক গিসগিস করছে। চিৎকার হচ্ছে, ধুলো উড়ছে। অনাদি যেন তাকাতে পারছে না। পশ্চিম দিগন্ত এখনো জলে-আকাশে ধূসর, অস্পষ্ট।

মিঃ দত্ত ধীরে ধীরে পায়চারি করছেন। এখন পর্যন্ত একবারের তরেও বসেননি। অত দামী স্যুট পরে এখানে আসা উচিত হয়নি। কিন্তু এক সময় না এক সময় তাঁকে বসতে হবেই। ওঁর বর্তমান অবস্থা দেখে অনাদির হাসি পেল: কি করুণ অবস্থা! সে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে খুব ভাল করেছে। ঐ দিকটায় ইন্দ্রাণী ওরা ওদের মেয়েলী কাজ নিয়ে পড়েছে। কি নিয়ে যেন ওরা খুব হাসছে। ইন্দ্রাণীকে খুব খুশী দেখাচ্ছে। সকালের বিষণ্ণতার চিহ্ন কোথাও নেই। মুনিলাল ওরা তিনজনে মিলে ত্রিপল খাটানোর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। যাক, একটা তবু—বসবার জায়গা হল।

ইন্দ্রাণী দু' হাতে দুই পেয়ালা-পিরিচ নিয়ে এগিয়ে আসছে। অনাদি তার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। সে মিঃ দত্তকে আগে এক পেয়ালা চা দিয়ে তারপর অনাদির কাছে এসে দাঁড়াল। তার হাতে পিরিচ-পেয়ালা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'চল একটু ঘুরে আসি।'

'এরি মধ্যে চা হয়ে গেল ?'

'একবার ঘড়ির দিকে তাকাও দেখি।'

অনাদি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেকি !'

'বেলা কি কম হয়েছে। চল, ঘুরে আসি।'

'ওদের তুমি সাহায্য করবে না ?'

'সব তৈরী। বাকী যা আছে, তা ঠাকুরচাকর মিলে করবে এখন।'

চা খেয়ে অনাদি দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরতে লাগল ;—ভীষণভাবে। চারিদিক একেবারে অন্ধকার দেখল। তাড়াতাড়ি অনাদি বলল, 'আমায় একটু ধর তো।'

'কি হল ?'

কোন কথা না বলে স্থির দাঁড়িয়ে রইল অনাদি। ইন্দ্রাণী আলতোভাবে এসে তার হাত ধরল। আস্তে আস্তে দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে লাগল অনাদির। তারপর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মাথার ভেতর কেমন কনকনে একটা ঠাণ্ডা স্রোত অনুভব করতে লাগল! 'কি, হয়েছে কি?'

'কি রকম সব অন্ধকার অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।'

'ঠায় এতক্ষণ রোদে বসে থাকার জন্য। বরং তুমি ঐ ছায়ায় গিয়ে বস।'

'কিছু দরকার নেই। ঠিক আছে। চল।'

ভগ্নস্তূপের ওপর এসে অনাদি অবাক হল। অনেক—অনেক লোক এখানে! অসমতল স্থানটার এ-ঢিবি ও ভগ্ন থামের পাশে এক-একটি দল রান্না নিয়ে বসে গেছে। আশ্চর্য নীচ থেকে সে এতটা অনুমান করতে পারেনি।

'এটা একটা জমিদারের বাড়ি ছিল, না?'

'কে বলল তোমায়?'

'উষাদি। মানে মিসেস বোস।'

অনাদি কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে এগোতে লাগল।

'উনিও হয়তো আমার মত শুনেছেন কারো কাছে।' অনাদি কোন কথা বলছেনা দেখে ইন্দ্রাণী বলল।

'একদিন ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে জিজ্ঞেস করব। আমার ধারণা ছিল, এটা একটা ফোর্ট। ইংরেজরা তৈরী করেছিল।'

'দেখলে তাই মনে হয়।'

'আমার অনুমান মাত্র, সঠিক জানি না।'

'আমিও আমার মনে হওয়ার কথা বলেছি।' ইন্দ্রাণী অনাদির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর গালে টোল ফেলে দুষ্টুর মত হাসল।

'আর কতটা এগোবে?'

'অ্যাঁ!' অনাদি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি বলল, 'তা হলে ফিরে চল।'

'এখুনি ?'

'তবে ?'

'হঠাৎ এত কি ভাবছিলে ?'

অনাদি ম্লান একটু হাসল। বলল, 'গুছিয়ে বলবার মত কিছু নয়। যাকগে, ঐ জায়গাটায় গিয়ে বসি।' বলে তারা একটা শানবাঁধান ভগ্ন চত্বরে গিয়ে বসল।

পেছনে একটু দূরে মাদুর বিছিয়ে তিনটি ছেলে একটি মেয়ে তাস খেলছে। ওরই পাশে গুটি কয় ছেলেমেয়ে অদ্ভুত নীরবে রান্না করছে। এ জায়গাটা অপেক্ষাকৃত আশ্চর্য জনকভাবে নির্জন। আরো একটু পেছনে কয়েকটা খাদ পেরিয়ে একটু নীচু জায়গায় একটা চৌকো মত উঁচু গম্বুজ। তার গায়ে বসানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে কয়েকটি ছেলে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। দেখে অনাদি একটু হাসল। ভাবল বলবে কিনা, 'দুর্গ প্রহরীর পর্যবেক্ষণাগার।' কিন্তু কোন কথা না বলে সে নদীর দিকে তাকাল। পশ্চিম পার এখনো নীলাভ ধূসর। অথচ সূর্য এখন মধ্য গগনে। অনাদি অবাক হয়ে ভাবতে চাইল, এখনো কি কুয়াশা থাকা সম্ভব! মাঝে মাঝে সেই সমতল প্রান্তরের কোলাহল হাওয়ায় ক্ষীণভাবে ভেসে এসে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে সুদূরে। কোন শব্দই যেন এই মুক্ত অঙ্গনে দানা বেঁধে উঠতে পারছে না। সব কিছুকে নীরব করে দিচ্ছে। ঠিক তেমনি নীরবে একখানা জাহাজ এদিকে আসছে—উত্তর থেকে দক্ষিণে। অনাদি হঠাৎ দেখতে পেল।

নদীতে অনেকে স্নান করছে। এখান থেকে তাদের ছোট ছোট কালো মাথাগুলো দেখা যায়। নীচে থকথকে পলিতে অজস্র ইট পড়ে আছে, পড়ে আছে ভগ্ন টুকরো খিলান থাম।—'দুর্গের প্রায় সবটাই ভেঙ্গে গেছে।' অনুচ্চ স্বরে বলল অনাদি। ইন্দ্রাণী কোন বলল না। সে নিষ্পলকে জাহাজটার দিকে তাকিয়ে আছে। অনাদিও তাকাল। 'হেলেনিক ডেস্টিনি।' এবার জাহাজের জলকাটার ও এঞ্জিনের ক্ষীণ শব্দ শোনা যেতে লাগল। দেখলে মনে হয় যেন তেমন গভীরভাবে জল কাটছে না।

জাহাজ অনেকটা দক্ষিণে চলে গেছে। ইন্দ্রাণী এখনো সেদিকে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণে প্রপেলারের জলকাটার ঢেউ পারের দিকে তালে তালে

এগিয়ে আসছে। ঢেউ-এর ওপরে কয়েকটা কালো মাথা ভাসছে। অনেকে জল ছিটাছিটি করছে, করছে লাফালাফি। অনাদির হঠাৎ ভীষণ স্নান করতে ইচ্ছা করছিল। গা-মুখ ভয়ানক চড়চড় করছে।···কিন্তু না, কোন উপায় নেই। মনে হতে লাগল এখন আবার তার মাথা ঘুরোবে। এইভাবে, এত নীচে ঠায় এতক্ষণ তাকিয়ে থাকা উচিত হয়নি।

'নামটা ভারী সুন্দর, না?'

'কিসের?' অনাদি বিস্মিত হল।

'ঐ জাহাজটার।'

অনাদি ঠিক এই মুহূর্তে কিছু মনে করতে পারল না। কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়ল: 'হেলেনিক ডেস্টিনি।' ছোট্ট করে সে মাথা নড়ল।

'আবার কেমন যেন বিষণ্ণ বিষণ্ণ।'

শুনে অনাদি হাসল।

'হাসলে যে?'

'কেমন কবিতা কবিতা শোনাচ্ছে।'

'এর ভেতর কবিতার কি আছে। তুমিই ভেবে দেখ না। আচ্ছা, ওটা কোন দেশের জাহাজ—গ্রীসের?'

'নাম তো সে রকম।'

'তা হলে অনেকটা পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে ওকে?'

'হ্যাঁ। ভূমধ্যসাগর লোহিতসাগর আরবসাগর বঙ্গোপসাগর—'

'ওতো ডুবেও যেতে পারত।'

'হঠাৎ তোমার একথা মনে হল কেন?' অনাদি ভ্রূ কুঁচকে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাল।—'ছিঃ!'

ইন্দ্রাণীর মুখখানা সহসা ম্লান হয়ে গেল। শেষে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি সত্যি কিছু ভেবে বলিনি।' উত্তরে অনাদি কি বলতে গিয়েও বলল না। চুপ করে রইল।

'এই হেলেনিক শব্দটা শুনলে আমার কেমন যেন একটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া সভ্যতার কথা মনে হয় তাই—'

'কলেজে প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস পড়ার জন্য হয়তো। শব্দটার অর্থ

হচ্ছে 'গ্রীসীয়'। তাতে নবীন প্রাচীন সব বোঝায়।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অনাদি। 'ধ্বংস হয়ে যাওয়া সভ্যতা কেন মনে হয় তোমার? কিছু ইট-পাথর সৌধ ভেঙ্গেছে বলে সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে? বর্তমান যুগের বহু ভাবনা সৃষ্টি ওদের ভাবনা সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে। ঐ সভ্যতাই সব কিছুর প্রাণবিন্দু। তা হলে সেই সভ্যতার মৃত্যু হল কোথায়?'

ইন্দ্রাণী তেমনি চুপচাপ। অনাদি নীচে জলের দিকে তাকিয়ে রইল। নীরবে সময় বয়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে প্রান্তরের সেই ক্ষীণ কোলাহল এসে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। হাওয়ার জোর এখনো কমেনি। সূর্যের উত্তাপ এখন আর অত ভাল লাগছে না। আকাশ স্বচ্ছ। শুধু গোটাকতক গাঙচিল বৃত্তাকারে ঘুরছে। পশ্চিম দিগন্ত তেমনি নীলাভ ধূসর!

'সমুদ্র এখান থেকে কত দূর?' আস্তে ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করল।

'আরো অনেক দূর।'

'তুমি সমুদ্র দেখেছ?'

'দেখেছি।'

অনাদির সেই সমুদ্রের কথা মনে পড়ল। তখন সে কত ছোট। এই বঙ্গোপসাগরের বুকে। সময়টা ছিল শীতকাল। এ সময় সমুদ্র নাকি শান্ত থাকে। তবু মা দাদা বোন কেবল বমি করে করে কেবিনে শুয়েছিল। অথচ সে নিজে আর বাবা কেমন ছিল মনে নেই। ডেকে ঘোরাঘুরির কথা কিছুটা মনে পড়ে। আর মনে পড়ছে সূর্য ডোবার কথা। কি অদ্ভুত, ঝপ করে ডুবে যায় সূর্যটা। কিন্তু ভোরের সূর্য ওঠার কথা মনে পড়ে না— একেবারেই। সে হয়তো তা দেখেনি।

'কলকাতার বাইরে এই প্রথম এলাম।' ইন্দ্রাণী বলল।

অনাদি ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাল।

কলকাতার বাইরে কোনদিন যাই নি, যাবার কারণও ঘটেনি। শুধু স্কুল কলেজ আর বাড়ি। কোনদিন সিনেমা বা বন্ধুদের বাড়ি যাওয়া। ভীষণ ঘরকুনো আমি। বাইরে যেতেও ইচ্ছা করত না। ভাবতাম, কি হবে, কি বা আছে!'

ইন্দ্রাণীর কণ্ঠের বিষণ্ণ সুর অনাদিকে অবাক করল। সে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

'এখন দেখছি আনন্দ আছে।'

'তোমার ভাল লাগছে?'

'খুব।'

'কিন্তু তুমি তো আসতে চাওনি।'

'যাকে কখনো দেখিনি সে কেমন কি করে বুঝব? আবার স্বভাব দোষে তাকে দেখতেও চাইনি।'

সূর্য এবার চোখের ওপর পড়তে চাইছে। হাওয়া বেশ মন্থর হয়ে এসেছে। পশ্চিম দিগন্ত তেমনি নীলাভ ধূসর। বিস্তৃত প্রকৃতি কেমন স্তব্ধ—নিস্তেজ। যেন রোদ মুড়ি দিয়ে শীত উপভোগ করছে। আর মাঝে মাঝে কয়েকটা কাক ক্লান্তভাবে ডেকে ডেকে ওর রোদ-মুড়ির ঘুম ভাঙ্গাচ্ছে।

'ভারী সমুদ্র দেখতে ইচ্ছা করে; খোলামেলা বিরাট আকাশ দেখতে ইচ্ছা করে।' ইন্দ্রাণী আলতোভাবে বলল।

অনাদি সোজাসুজি তার দিকে তাকাল।

'ভেবেছিলাম, বিয়ের পর আমাদের কিছুদিন সমুদ্রের কাছে কাটবে। ইন্দ্রাণী নিঃশব্দে একটু হাসল। এক বন্ধুর কথা মনে পড়ল। বলেছিল, বিয়ের পর দীঘা, পুরী বা কোন পাহাড়ী জায়গায় হনিমুন করতে যাস, কেমন। দেখবি খোলা আকাশের নীচে তোরা তাড়াতাড়ি পরস্পর নিজেদের বুঝে নিতে পারবি।'

ইন্দ্রাণীর নিঃশব্দ হাসি অনাদির বিদ্রুপ বলে মনে হল।

'কিন্তু আমরা কোথাও গেলাম না।' বলে ইন্দ্রাণী অনাদির দিকে তাকাল।

অনাদি দেখতে পেল ইন্দ্রাণীর চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। সে আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে না-দেখা পশ্চিম পারের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। সে যেন হঠাৎ কিছু ভাবতে পারল না। ইন্দ্রাণীও আর কোন কথা বলল না। দু' হাঁটু জোড় করে বসেছিল। এবার মাথাটা হাঁটুর ওপর রেখে আড়চোখে নদীর জল দেখতে লাগল।

সূর্য অস্তোন্মুখ। পশ্চিম দিগন্তের অস্বচ্ছতা এখন রক্তিমতায় আচ্ছন্ন।

বিরাট প্রান্তরটা মত্ত-উৎসব শেষে ক্লান্তিতে ধুকতে শুরু করেছে। ভাঙ্গন শুরু হয়েছে সব কিছুতে। শেষ রোদের আলোতে মনে হয় সর্বত্র রাশি ধুলো উড়ছে। এদিকে একে একে গাড়ি বোঝাই করে রওনা দিতে শুরু করেছে। শেষবারের মত মিসেস বোস এক পাত্র করে চা সামনে ধরলেন। মিঃ বোস ও মিঃ দত্ত ত্রিপলের ওপর পা ছড়িয়ে বসে। সবার চোখে ক্লান্তির ছাপ। মুনিলালরা সবকিছু গোছগাছ করে গাড়িতে ওঠাচ্ছে। ইন্দ্রাণী চারিদিক ঘুরে-ফিরে দেখছে কোথাও কিছু পড়ে রইল কিনা। আবার যেন কনকনে ঠাণ্ডা অনুভব হচ্ছে। হাওয়াও কেমন ভিজে ভিজে।

মুনিলাল গাড়ি হর্ন দিল। মিঃ বোস ও মিঃ দত্ত উঠে দাঁড়ালেন। ত্রিপল ভাঁজ করা হল। তারা ধীরে ধীরে নালা ঘুরে গাড়ির দিকে চলল।

গাড়িতে উঠতে যাওয়ার আগে ইন্দ্রাণী অনাদিকে আস্তে করে বলল, 'ঐদিকে তাকিয়ে দেখ।' অনাদি তাকাল। দেখল, পশ্চিম দিগন্তে জলের সমতল হতে অনেকটা জায়গা জুড়ে যেন একটা বিরাট রক্তবর্ণ স্তূপ উঠেছে। মনে হয় গলিত লোহা এবার একটু একটু করে জমাট বাঁধতে যাচ্ছে। তার প্রতিফলনে সামনেকার কিছুটা জল রক্তবর্ণ। যেন কেউ মুঠো মুঠো খুন-খারাপি রং ছড়িয়ে দিয়েছে। আর ঠিক তখনই ওপরে—আকাশে দ্বিতীয় বন্ধনীর মত একটা সূক্ষ্ম রেখা কাঁপতে কাঁপতে ক্রমশ স্থূল হয়ে আসছে। অনাদি বুঝতে পারল;—বেলেহাঁস। কোথায় যেন সে পড়েছিল: 'সন্ধ্যাকে ওরা ওদের ডানায় করে যেন নিয়ে আসে।' অনাদি চেপে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অনাদি সকালে চাপ চাপ শূন্য নিরুচ্চার কুয়াশা দেখতে চেয়েছিল। সেই কুয়াশা নিঃশব্দে ক্রমশ যেন গাঢ় হয়ে আসছে। মুনিলালের পাশে বসে এখন সে-সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ইন্দ্রাণী এখনো সেই দিগন্তের দিকে তাকিয়ে। ও হয়তো দেখছে বিরাট আকাশ; আর তার নীলরঙ শুষে নিয়ে সমুদ্র কি উত্তাল! ওরই কাছে কোথাও তারা পরস্পরকে নিবিড় করে পাবে।—কিন্তু ও কি আমাকে ভুল বুঝল! ছোট ভাই শিবপুরে পড়ুয়া,

ঘরে মা উন্মাদ, আর আমি—' অনাদি আর যেন ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাতে পারছে না। সোজা রাস্তার দিকে তাকাল। হেডলাইট পুরো জেলে মুনিলাল চাপ চাপ নিরুচ্চার কুয়াশা কেটে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। চারপাশের দৃশ্য কুয়াশার একেবারে অন্তরালে। অনাদির মনে হল—মনে হল সে যেন একটা মসৃণ সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে তীব্র বেগে সামনে ধূসর অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

খোকন তুমি ও সে

তুমি এখন অফিসে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছ। তোমার কাছে গিয়ে এটা-ওটা এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে পারি। মনে মনে তুমি হয়তো তাই চাইছ। এ-সময় আমার উপস্থিতি আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি ও-ঘরে এখন যাব না। ও-ঘরে খোকন রয়েছে। ওখানে গেলে তুমি আমাকে না দেখার ভান করে হঠাৎ খোকনকে আদর করতে শুরু করে দেবে। খোকন এখন আর তেমন ছোট্টটি নয়। ও ঠিক ধরে ফেলবে আমি নিশ্চয় ঘরে ঢুকেছি। বারেবারে একই জিনিস দেখে ও বুঝে ফেলেছে। আর তুমিও পাকা অভিনেতার মতো সঙ্গে সঙ্গে ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে হঠাৎ যেন আমায় দেখে অপ্রস্তুত হয়ে বলবে, 'এই খোকনকে একটু আদর করছিলাম।' তুমি ভাল করেই জান, ও-কথার কোন উত্তর আমি দেব না। তারপর তুমি বলবে, 'আমার ঘড়িটা দাও তো।' পরে ঘড়িটা হাতে পরতে পরতে বলবে, 'খোকনকে আদর করতে গেলে আমার নিজের ওপর ঘৃণা হয়। ওর টকটকে রঙের পাশে আমার কালো রঙ যেন মুখ ভার করে ভেঙচি কাটতে থাকে তা হোক গে, ও তো আমারই সন্তান।' এ কথারও আমি কোন উত্তর দেব না, তুমি জান। এর পরও তুমি বলবে, খোকন পাশে আছে জেনেও, 'বুঝলে, তোমার পেটটাই পরিষ্কার।' অর্থাৎ আমার রঙ খোকনের মতো পরিষ্কার নয়। ও কথা বলেই তুমি কি একটা রসিকতা করেছ ভাব দেখিয়ে হাসতে থাকবে। কিন্তু তোমার মুখের শক্ত ভাঁজগুলো দেখলে মনে হবে, আমার রক্ত পরম আস্বাদভরে শ্বাপদের মতো রসিয়ে রসিয়ে খাচ্ছ। তারপর আলতো করে আমার চিবুকে ঠোনা মেরে একটা গানের সুর ভাঁজতে লম্বা লম্বা পা ফেলে অফিসে চলে যাবে।

তারপর একলা পেয়ে খোকন আমাকে নির্নিমেষে দেখতে থাকবে কিছুক্ষণ। ওর ঐ শিশুমন নিয়ে ও বুঝতে পেরেছে, এই উদ্দাম আদর আর

যা-ই হোক স্বাভাবিক নয়। তাই আড়ষ্ট হয়ে ঐ আদর (মার খাওয়ার কষ্ট নিয়ে) সহ্য করে - একটা কথাও বলবে না। এ ছাড়া ও কি করবে—করতে পারে ? তারপর আমার কাছে এসে দাঁড়াবে। কিছুক্ষণ আমার ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করবে, 'বাবাকে ভাল লাগে না, না মা ?'

কোন উত্তর না পেয়ে বলবে, 'তোমার পেট খুব ফর্সা, না ?'

—হুঁ।

—তোমার পেট বুঝি বাবা দেখেছে ?

—না, ডাক্তার দেখে বলেছে।

—আমি কোথায় ছিলাম মা ?

—আমার পেটে।

—আমি তোমার পেটে হয়েছি ?

হ্যাঁ।···খোকন চান করতে চল ; তোমার স্কুলের গাড়ি চলে যাবে।

ওরা ওদের কাজে চলে গেছে।

তুমি এখন হয়তো অফিসে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। খোকন তার স্কুলে। আর আমি বাড়ি বসে তোমাদের কথা ভাবছি। আরো কতদিন যে এভাবে ভাবব তা শুধু তুমিই জান—তোমার ওপর নির্ভর করছে। বলতে কি, আমরা দু'জনে দুটো যুদ্ধ শিবির হয়ে গেছি যেন। এ বিরোধিতায় খোকন আমাদের লক্ষ্যস্থল। খোকন যেন আমাদের দুর্জ্ঞেয় জিজ্ঞাসা। ভাগ্য। তার ভাগ্য জানার মধ্যে আমাদের জয়-পরাজয় আশা-ভবিষ্যৎ। এই কুটিল জিজ্ঞাসা তোমার আমাকে নিয়েও। অর্থাৎ আমি এ জিজ্ঞাসা-রহস্যের আংশিক স্রষ্টা। অতএব আমিও অবিশ্বাস্য। তোমার দ্বিতীয় অনুসরণ ভুল। কাজেই এক সিদ্ধান্তে কোন কালেই আমরা আসতে পারব না। যুদ্ধের শিবির-প্রাঙ্গণ জুড়ে আকাশের দিকে কাঁটার মতো উঁচু হয়ে থাকব অনুক্ষণ। এ হবে শুধু তোমার জন্য। তুমি জেনো, তোমার সংশয় অবিশ্বাসই তোমার পরাজয়। আমার সত্য, তোমার মিলনের সত্যের মতো খোকন সত্য- কোথাও অবিশ্বাসের কিছু নেই। আমার নিষ্ঠা আমার জয়। তাই

তুমি একদিন ভীষণভাবে হেরে যাবে জানি ; কিন্তু সংশয়ের কাঁটা যাবে না তবু। প্রত্যক্ষে দমে গিয়ে গুমরে মরবে হয়তো আজীবন। তাই আমরা কেউ ভাঙ্গব না—ভাঙ্গা চলবে না। তোমার শিবির থেকে তুমি সদা আক্রমণের জন্য দুর্বলতা খুঁজবে। আর আমি থাকব নিরন্তর আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত। যদিও তোমার আক্রমণের ধারা আমার মনের মতো আমার কাছে স্বচ্ছ। তবু যদি তুমি কোন জটিল পথ বের করো, করতে পারো। তখন ? তাই খোকনকে লক্ষ রেখে সারাক্ষণ আমাকে জেগে থাকতে হবে। জানি, খোকনকে তুমিও অনুক্ষণ নজরে রাখো। আচ্ছা বলতে পার, আমরা কেন এভাবে বাঁচব—বেঁচে থাকব ?

অন্তত তুমি না হও আমি ?

দেখো এই দুপুরে মরব—মরব।

তুমিই তখন বলবে কি জান ? বলবে, 'ও দিন দিন কেন জানি ভীষণ অসাবধানী হয়ে উঠেছিল, আমি লক্ষ করেছিলাম। তাই অসাবধান হতে হতে এক সময় অসাবধানে নিজের প্রাণটা হারিয়ে ফেলল। আসলে সব খোকন খোকন—'

—কি জন্যে রে এসেছিস ?

—আমার এখানকার কাজ সারা হয়েছে।

—বেশ তো—

—আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি মা।

—কেন ? এই দুপুরে ?

—একটু কাজ আছে। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে আসব।

—বেশ আয়। নীচের দরজা-টরজা ভাল করে আটকে দিয়ে যাস, বুঝলি।

—আচ্ছা।

তোর এই জিজ্ঞাসায় আমার হাসি পাচ্ছে—হাসছি। তুই এ-কাজ নতুন করছিস তাই সরল তুই জিজ্ঞেস করলি। পুরোনো হলে কুটিল হতিস—জিজ্ঞেস করতিস না। আমি কিছুই এর টের পেতাম না। নিঃসাড়ায় সেরে আসতিস।......এ-কাজে নতুন লোক তাই, বিশ্বাস করি তোকে

ভয়ানক বিশ্বাস করি। তাই এ-দুপুরেও সমস্ত নীচটা তোর হাতে ছেড়ে দিয়েছি। যদি এ-কাজে পুরোনো হতিস, বিশ্বাস করতাম না। বিশ্বাসের ভান করে সব কিছু তোর হাতে ছেড়ে দিয়েও চোখে চোখ রাখতাম সর্বক্ষণ। তুই পুরোনো হলে হয়তো তাই করবি। দেখেছি শেষ পর্যন্ত তোরা অবিশ্বাসী হোস। যেদিন থেকে আর আমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করবি না, সেদিন থেকে হবে তোর শুরু।

তুমি হয়তো ওর মতো সরলবিশ্বাসী ছিলে। দেখে দেখে যত পুরোনো হয়েছ তত সংশয়ী অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছ। কিন্তু সে দায় তো আমার নয়। সব মিথ্যে হলেও কিছু সত্য থেকে যায়।

তুমি এখন কি করছ? অফিসে নিশ্চয় কাজ করছ? খোকন তার স্কুলে। আর আমি তোমাদের কথা ভাবছি। অনেকদিন ধরে ভাবছি। আরো কতদিন যে এভাবে ভাবব, তা শুধু তুমিই জান—তোমার ওপর নির্ভর করছে। সমস্ত বাড়িটা এখন স্তব্ধ। কী যে ভীষণ স্তব্ধ! থমথম করছে। আমি যেন শ্মশানে এসেছি শব-সাধনা করতে। তাই ভাবতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয় করছে। দারুণ—নিদারুণ ভয়। শব-সাধনা কি জানি না! শুধু শুনেছি তাতেই ভয় করছে।

তুমি যখন এখানে থাক—এ-বাড়িতে, যখন পাশে পাশে থাক, কথা বল আমার সঙ্গে, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস পাই, শক্তি পাই। কিন্তু তুমি যখন আমার পাশে থাক না তখন কি ভয়ানক যে হয়ে ওঠ! সে সময়ই আমি যেন তোমার সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠি না। তবে, তবে আমি আর কোন বিরোধে থাকব না। আমি বাঁচতে চাই না। আচ্ছা বলতে পার, আমরা কেন এভাবে বাঁচব—বেঁচে থাকব?

অন্তত তুমি না হও আমি?

দেখো এই দুপুরে মরব—মরব।

তুমিই তখন বলবে কি জান? বলবে, 'ও দিন দিন কেন জানি ভীষণ অসাবধানী হয়ে উঠেছিল, আমি লক্ষ করেছিলাম। তাই অসাবধান হতে হতে এক সময় অসাবধানে নিজের প্রাণটা হারিয়ে ফেলল। আসলে সব খোকন—খোকন—'

সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

নীচের পাংশুটে প্রান্তরটা তপ্ত পাত্র হয়ে পড়ে। কাঁচা গলা সোনা পড়ে পড়ে গিনির রঙে আতপ্ত। মাঝ আকাশ থেকে সূর্য ঈষৎ সরে দাঁড়িয়েছে। ধ্যানমৌনী—মৌন মানব সৃষ্টি। চাতকের নিষ্ফল আকুতি মাথা কুটে মহাকাশে যাত্রা করল। আর ঐ যাত্রার অনুসরণ করে ব্রাত্য পৃথিবী যেন সবিতার কাছে কষ্টকর ব্রতের মন্ত্র আউড়ে চলেছে ঃ আমায় পরিণত কর, পরিণত কর। তোমার দেওয়া এই কষ্ট আরো তীব্রতর হোক ক্ষতি নেই ; কিন্তু তোমার স্বাদ যেন অটুট থাকে।

কিন্তু আমি তো পারব না এত কষ্ট সইতে। তার চেয়ে আজ আমি মৃত্যুর সাধনা করব।

কেন ? আমি পরিণতি চাই না। আমার কামনা-বাসনার শেষ কোথায় জানি না। আমিই যেন আমার কাছে রহস্য।

কোন অদূরে যেন বেতারে তার দ্বিপ্রাহরিক সমাপ্তির ঘণ্টা বাজে ! সে কান পেতে মোহগ্রস্তের মতো শুনতে লাগল। বড় সুন্দর এ শব্দ ! এ যেন জীবন্ত কতগুলো মুখরতা। এ ধ্বনিগুলোর যেন এক একটা করে অবয়ব আছে। আর ঐ অবয়বগুলো যেন সে দেখতে পাচ্ছে। ওরা যেন শিথিল গতিতে এই পাংশুটে তপ্ত প্রান্তরটায় এল। ধীরে ধীরে ফুলে উঠতে লাগল। ফুলে ফেঁপে উঠে বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল। তারা আস্তে আস্তে সবিতার গলিত সোনায় কোথায় মিলিয়ে গেল !

আমিও এভাবে মিলিয়ে যাব। আজ—এই দুপুরে—দুপুরের রোদে মরব। আমি আর বাঁচতে চাই না। আমরা সবাই মিলে মরব। বলতে পারো, আমরা কেন এভাবে বাঁচব—বেঁচে থাকব ?

অন্তত তুমি না হও আমি ?

দেখো এই দুপুরে মরব—মরব।

তুমি তখন বলবে কি জান ? বলবে, ও দিন দিন কেন জানি ভীষণ অসাবধানী হয়ে উঠেছিল, আমি লক্ষ করেছিলাম। তাই অসাবধান হতে হতে এক সময়—এই দুপুরের সুকৌশল মন ভোলানো ফাঁদে অসাবধানে নিজের প্রাণটা হারিয়ে ফেলল। আসলে সব খোকন খোকন—'

আর আমি তখন? গোবি-সাহারার বুকে একখণ্ড মেঘের মতো। মহাকাল—মহাকাশ তার বুকে শুষে নিয়েছে আমার আত্মাকে।

ঘরটা ভীষণ অন্ধকার।

সে শুয়ে চারিদিক তাকাতে লাগল, বাইরের আলো এসে এখনো ঘরে ঢুকেছে কিনা। না, কোন আলো নেই। সে সাবধানে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করেছে, যাতে কোন আলো এখানে প্রবেশ করতে না পারে। তা পারেনি। এই অন্ধকারই সে চেয়েছে। ডান হাতের আঙুল পাঁচটা চোখের সামনে নাড়তে লাগল। না, সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবু যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না, বাইরের আলো এতটুকু কি ঘরে এসে ঢোকেনি। সমস্ত ঘরময় দৃষ্টি নাচাতে লাগল সে।

সূর্য এতক্ষণে হয়তো আরো কিছুটা হেলে পড়েছে। তুমি এখন কোথায়? অফিসে কাজ করছ। খোকন তার স্কুলে। আমি এই আঁধার ঘরে শুয়ে তোমার কথা ভাবছি। তোমার—খোকনের—তোমাদের কথা ভাবছি। তুমি কি আমার কথা ভাবছ? জানি না। আর আমি তোমার কথা ভেবে ভেবে সারা হয়ে গেলাম। তুমি আমার চোখের সামনে চলে গেলে কি অসহ্য যাতনায় ফেল! কি ভয়ানক হয়ে ওঠ যে! আমি যেন কিছুতেই তোমার সঙ্গে আর পেরে উঠি না। অথচ জানি জয় আমার। কারণ, আমার সত্য, তোমার আমার মিলনের সত্যের মতো খোকন সত্য—কোথাও অবিশ্বাসের কিছু নেই, নেই সংশয়—আমার নিষ্ঠা আমার জয়। এই জয়ই হবে হয়তো আমার কাল। তুমি ভুলতে পারবে না তোমার পরাজয়। এই হেরে যাওয়া, জানি, তোমার অবিশ্বাস সংশয়ের কাঁটা তুলতে পারবে না। তখন? তখন তুমি যুদ্ধ শিবিরের রাতের প্রহরীর মতো আমার দুর্বলতা খুঁজবে। বলতে পার, আমরা কেন এভাবে বাঁচব—বেঁচে থাকব?

অন্তত তুমি না হও আমি?

দেখো, এই দুপুরে মরব—মরব।

তুমি এই মৃত্যুর কোন অর্থ খুঁজে পাবে না। তাই তুমি বলবে, 'ও দিন দিন কেন জানি অসাবধান হয়ে উঠেছিল, আমি লক্ষ করেছিলাম। তাই

অসাবধান হতে হতে এক সময় অসাবধানে নিজের প্রাণটা হারিয়ে ফেলল। আসলে সব খোকন খোকন—'

তোমার পক্ষে এরকম ভাবা স্বাভাবিক। তাই তুমি এ মৃত্যুর কোন অর্থ খুঁজে পাবে না। এ নিঃশ্বাস হারানো তোমার জন্য। তোমার—খোকনের — তোমাদের জন্য। তোমার মনে আছে একদিন বেঁচে থাকা সম্বন্ধে তুমি কি বলেছিলে? তখন তোমার আমার সম্বন্ধ কত ভিন্ন ছিল! তুমি তখন আমার কেউ না। ওর মতো তুমিও একজন মাত্র। কি দীন অবস্থা তখন তোমার! তুমি ওর কথা কিছুতে ভুলতে পারছ না। সব সময় এই ধারণা বয়ে নিয়ে বেড়াতে, নির্ঘাত তোমার হার হবে ওর কাছে। তুমি হেরে যাবে। আমি শুধু ওকেই ভালবাসি—ভালবাসব। তবু তুমি হাল ছাড়নি। তোমার ধৈর্য, অপার কৌতূহল আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিতিয়েছে। আমি তোমাদের কাউকে ভালবাসিনি। ভালবাসতে দিয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম শুধু ভালবাসা পেতে। কে কত তোমরা ভালবাসতে পার। ওর সৌন্দর্য আমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করেনি। তোমার শ্রীহীনতা আমাকে বিরূপ করেনি। ওর সৌন্দর্যের অহঙ্কার, যা আমাকে মানায়—রূপে রহস্যে মোহময়তা, আমায় বিরক্ত করেছে। ও আমায় ভালবাসেনি, বেসেছে নিজেকে। ও জানে আমার চেয়ে ও সুন্দর, আমি জানি, আমি ওর কাছে রহস্যময় মোহ। যার জন্য বোকার মতো বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। তাই তোমার কাঠিন্য সম্পদ ভালবাসার একাগ্রতা কৌতূহল অহঙ্কারের দম্ভকে ছাপিয়ে আমায় মুগ্ধ করেছে। তুমি জিতে গেছ। অথচ তুমিই তখন বলেছিল, বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজতে যেও না।

—কেন?

—ও অর্থহীন।

—কেন?

—কেন? বেঁচে থাকার অর্থ খোঁজা একটা অন্ধকার ঘরে কালো বেড়াল খুঁজে মরার মতো।

আমি তোমার কথা মেনে নিয়েছিলাম। বেঁচে থাকার অর্থ কখনও খুঁজিনি, বেঁচে থাকার স্বাদ পেতে চেয়েছি শুধু। কিন্তু তুমি বদলে গেছ,

তোমার মতের মৃত্যু হয়েছে। তোমার আর ওর প্রভেদ ঘুচে গেছে। পাতার এ-পিঠ আর ও পিঠ মাত্র।

তোমার এই মনের মৃত্যুই আজ আমাদের দুই বিপরীত প্রান্তের কারণ। পরাজয় তোমার ললাটে। খোকন—আমার জয়। তোমার এবার শুধু পরাজয়ের পালা। এমনকি তুমি আজ ওর কাছেও হেরে গেছ। জিতেও তুমি শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারলে না। অবিশ্বাস, সংশয় তোমার ওকে নিয়ে। কিন্তু ও কোথায়! আমি ওকে ক—বে ভুলে গিয়েছিলাম। তুমিই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওকে স্মরণে এনে দিয়েছ।

তোমার সংশয় অবিশ্বাস আমি ভাঙ্গিয়ে দিতে পারি। কিন্তু দেব না। এ অবিশ্বাস শুধু আমাকে নিয়ে নয়; তুমি নিজেকে নিয়েও করছ, করছ সংশয়। এ দায় তো আমার নয়। তবে আমরা কেন বাঁচব—বেঁচে থাকব?

অন্তত তুমি না হও আমি?

দেখো আজ এই দুপুরে মরব—মরব।

তুমিই তখন বলবে কি জান? বলবে, 'ও দিন দিন কেন জানি অসাবধানী হয়ে উঠেছিল, আমি লক্ষ করেছিলাম। তাই অসাবধান হতে হতে এক সময় অসাবধানে নিজের প্রাণটা হারিয়ে ফেলল। আসলে সব খোকন খোকন—'

খুব কাছে একটা বাসের হর্ন শুনতে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। —খোকন বুঝি ফিরল! লক্ষ করল নিস্তব্ধ পৃথিবীটা হঠাৎ যেন কোলাহল শুরু করে দিয়েছে। তা হলে আর বুঝি দুপুর নেই!—তুমি তো এখুনি এসে পড়বে! একটু দেরি করে এসো লক্ষ্মীটি; আমি এখনো প্রস্তুত হতে পারিনি।

সে দরজা খুলে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল।

নিত্যকার প্রথামত কাজগুলো আর ঘটল না: প্রথম কিছুক্ষণ নীরবে আলস্য উপভোগ করা—ঈষৎ পিঁচুটি জড়ানো চোখ আধো বুজে আধো মেলে, পাশবালিশটা আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরা, তারপর ক্লেদমুখে চা খাওয়া আর তৎসঙ্গে দৈনিক কাগজখানি মোটামুটি শেষ করে বিছানা ত্যাগ। এরপর বাথরুম···স্নান···আহার···কিন্তু হল না। প্রথাগত পথ ধরেই কাজগুলো এগোতে শুরু করেছিল ; কিন্তু পারল না। কিছুটা এগিয়ে দৈনিক কাগজে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথম পৃষ্ঠার বড় বড় অক্ষরগুলো সমস্ত কিছু রীতিবদ্ধতাকে ওলট-পালট করে দিল। সে স্তব্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ভাবতে পারল না। ঐ কালো অক্ষরগুলো ছাপিয়ে আর এগোতে পারল না। এই মুহূর্তে সে-চেষ্টা করতেও ইচ্ছা করল না। কাগজের দিকে স্থির তারকায় তাকিয়ে নিশ্চল এক জড় বস্তুর মতো পড়ে রইল। তারপর এক সময় গলার নালী চিরে তার চীৎকার করে উঠে বসতে ইচ্ছে হল। উঠে বসল ; কিন্তু গলার কোন স্বর বেরুল না। ব্যাপারটা যান্ত্রিকভাবে নিঃশব্দে ঘটে গেল যেন। তবু এটা যে একব্যক্তির ব্যর্থ বিপুল প্রয়াস, কারণ সে বসে বসে কাঁপতে লাগল। চোয়াল হাঁ হয়েছিল তা ধীরে ধীরে বুজিয়ে ফেলল। এখন বসে সে কাঁপুনি উপলব্ধি করতে লাগল। আস্তে আস্তে সে কাঁপুনিও দেহে মিলিয়ে গেল। মোট ব্যাপারটি ঘটতে মিনিট দশেক লাগল। এরপর আবার সে পড়তে চেষ্টা করল। এগিয়ে যাবার ভয়ানক চেষ্টা করতে লাগল ঐ বড় বড় অক্ষরগুলো ছাপিয়ে। এগুলোও বটে : ওর চেয়ে ছোট, তার চেয়েও ছোট পর্যন্ত ; কিন্তু তারপর ক্ষুদ্র অক্ষরগুলো, সারিবদ্ধ বিষাক্ত ক্ষুদে পিঁপড়ের মতো যেন কিলবিল করতে লাগল। আর পারল না। আশা ছেড়ে দিল। হাত-পার জোড়গুলো যেন আলগা হয়ে আসছে। চারিদিক বুঝি বড় নিঃশব্দ! সে খরগোশের মতো কান উৎকর্ণ

করল। না, কোথাও কোন শব্দ নেই, আশ্চর্য! যেন শীতের মাঝে রাতের নৈঃশব্দ্য। না, তখনো কিছু নিশি-পোকার ক্ষীণ কোলাহল থাকে। কিন্তু এখন তাও নেই। অদ্ভুত তো! সে অনেকটা ধাতস্থ হয়ে উঠল। শক্তি ফিরে পাচ্ছে, ভাবতে পারছে। মহাশূন্যের স্তব্ধতা কি এ রকম? চারিদিকে তাকাল সে। ভোরের রোদ স্বচ্ছ। অথচ দিনের কোলাহল? ঘর-কন্নার শব্দ? সে ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবল। সেই 'একটু ভাবনা' ধীরে ধীরে একটা শীর্ণ হাসিতে রূপ পেল। যেন এই প্রকৃতির সঙ্গে তার আত্মার বোঝাপড়া করে নিল। তারপর খাট ছেড়ে নামল। খালি পায় নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এ-ঘর সে-ঘর পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোতে লাগল।

ও দরজার দিকে পিঠ করে বুঝি আনাজ কুটছে। সে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল। এলো চুল পিঠে নিয়ে কাজ করছে। ওর এখনকার সমস্ত অবস্থিতি অজ্ঞতার একটা অদ্ভুত প্রশান্ত সমাহিতের ছবি। সে এই মুহূর্তে অবাক না হয়ে পারল না। এই অবাক হতে পেরে যেন খুশী হয়েছে মনে মনে। সব ছোট ঘটনার ভেতর মহাজিজ্ঞাসার উত্তর তা হলে থেকে যায়। সে আরো এগিয়ে গেল। দরজার দিকে না গিয়ে পাশের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। ও এখনো আনাজ কুটছে। আর ওদিকে রাঁধুনী উনোনের ওপর ঝুঁকে। তার মুখ আরক্ত। নিরুদ্বেগ পাচিক অন্ন-ব্যাঞ্জন ব্যবস্থায় ব্যস্ত। কিন্তু আশ্চর্য, কোন শব্দ নেই কেন! এখানেও নেই কেন? ওরা কেমন শান্ত সমাহিত; কেমন স্তব্ধতার ভেতর কাজ করছে।

এ-কাজে ও-কাজে হঠাৎ এদিকে চোখ পড়ল পাচিকার। চোখ দুটো আয়ত ও স্থির হল তার। বিস্ময় আশ্রয় করল সেখানে। আর ভয়। যে-ভয় এতক্ষণ সবার চোখে দেখবে, স্থির সিদ্ধান্ত করেছিল সে। একটা অনড় পাথরের মতো এদিকে তাকিয়েই রইল। আর সেও নির্বোধের মতো বোধহীনভাবে চেয়ে থাকল। এদিকে ও পাচিকার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ফিরিয়ে অবাক। তারপর তার দৃষ্টি অনুসরণ করে এদিকে তাকাল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ও-ও যেন সহসা আকাশ থেকে পড়ল। সেখান থেকে সে সরে এল। গোলমালটা এইভাবেই বাঁধবে, অনুমান করেছিল। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে মিলে গেল তা হলে কিন্তু আশ্চর্য, অধীর আশঙ্কায়

নিজে সব কিছু কখন ভুলে গেছে। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে এগোতে লাগল।

একটা ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল। বুঝতে পারল, ধারাল—আনাজ কাটার বেশ ধারাল বঁটিটা এবার কাত করে রাখা হল। এতক্ষণে এই যেন সে প্রথম শব্দ শুনল। দ্রুত এগোতে চাইল সামনে। কেননা সে জানে, একটা ভয়ঙ্কর অবরুদ্ধ ভাবনার মতো ও এতক্ষণে তীব্র বেগে অনুসরণ করতে শুরু করেছে। অজ্ঞান জ্ঞানের কৈফিয়ত চাইবে এসে। ভুল করেছে সে। ভুল করে ফেলেছে—জেনে-শুনে। এমনি করেই বুঝি সব ভ্রান্তিগুলো জমে জমে দানা বেঁধে শক্ত হয়ে উঠছে। তা হলে? ওর বুঝি মৃদু পায়ের শব্দ। জ্ঞান অজ্ঞানে কোন ভেদ থাকবে না। ও জিজ্ঞেস করলে কি বলা যায়? দুশ্চিন্তা আসে বই কি। সব কিছু কেমন নীরবে ঘটে গেল! অতক্ষণ সত্যি কোন শব্দ-জগতের অস্তিত্ব ছিল না? সকলে—যারা অন্তত অজ্ঞানী নয়, তারা মিথ্যা স্তোকে ঘুরে ঘুরে হায়রান হয়ে চরম সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে। আর উপায় নেই। ও এসে গেল বুঝি। সকলের মতো সেও জেনেশুনে ভুল করে বসেছে।

আপন ঘরের মাঝখানে এসে সে নিঃস্বের মতো দাঁড়াল। এবং অবাক হয়ে ভাবতে পারল, আর তো করবার কিছু নেই, কিছু ভাবতে পারছে না। পথ-ভ্রান্ত বালকের মতো বর্তমানকে অসহায়ভাবে উপলব্ধি করতে লাগল। কিংবা লক্ষ্যহারা ঢিলের মতো সময়ের কাছে নিজেকে সঁপে দিল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল—বস্তুত পরিশ্রমের পারিশ্রমিক দিচ্ছিল! পঞ্চাশোর্ধ্বের পক্ষে এতখানি তাড়াতাড়ি হাঁটা শক্তির অতিরিক্ত।

শেষ পর্যন্ত সে নির্বিকল্প হতে চাইল। এবং এই প্রয়াসের একটু পরে ওর উপস্থিতি বোধ করল। ও কাছে—গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল সে নড়ল না। তার বাহু স্পর্শ করল ও। তবু না। ও বলল, "অমন করে পালিয়ে এলে যে?"

সে কোন উত্তর দিল না। বা দিতে পারল না।

"কলেজে যাবে না?"

"......"

"কেন শরীর খারাপ নাকি ?"

"......"

"তবে ? মুখহাত ধুয়েছ ? এ কি চা এখনো খাওনি !" হঠাৎ যেন ব্যাপারটা আবিষ্কার করে ও যুগপৎ বিস্মিত হল এবং বিপন্ন বোধ করল। কি করবে এই মুহূর্তে স্থির করতে না পেরে কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তারপর "দেখি" বলে সহসা ও হাতের পিঠ দিয়ে তার কপালে-বুক স্পর্শ করল। পরে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বলল, "তাহলে কোন কিছু না সেরে হঠাৎ ওখানে গিয়েছিলে কেন ?"

একথা পঙ্কিল অবিশ্বাসের অঙ্কুর মাটি ভেদ করে যেন সহসা জল-আলো-হাওয়ার পোষকতা যাচ্ঞা করল। আর ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি সে বলতে চাইল কিন্তু পারল না—টেনে টেনে বলল, "কোন সা ।-শব্দ না পেয়ে - তাই "

"কলেজে যাবে না ?"

"বললাম তো, ভাল লাগছে না।"

"থাক তবে গিয়ে কাজ নেই।" বলে একটা গুমোট অস্বস্তির আবহাওয়া ছড়িয়ে ও চলে গেল। সে বিছানার ওপর খবরের কাগজটার দিকে তাকাল।

সূর্য মধ্য গগনে। সে অনুমান করল। চারিদিকের স্তব্ধতাই তার সাক্ষ্য। দিবাকর এখন সর্বোচ্চে। সুনীল নভঃদেহ নিয়ে তাই প্রবল বিক্রমে আঁকড়ে ধরেছে যেন চরাচরকে। তার ভাল লাগল না। এ ভাবনাটা সে মনে মনে একটা উপমা দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল: একটা প্রবল পরাক্রান্ত সিংহ তার অমিত শক্তিধর থাবা দিয়ে একটা করুণা-যোগ্য বুদ্ধিম্মন্য জীবকে চেপে ধরেছে। আর দীন জীবটি সকাতরে তার কণা ভিক্ষা করছে, "আমাকে বাঁচতে দাও, আমার পথে আমাকে পুষ্ট হতে দাও, উপভোগ করতে দাও আমি তো তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নই।"···এও তার মনঃপূত হল না। সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। অশান্ত অস্থির অথচ ধীরভাবে পায়চারি করতে লাগল। এ অস্থিরতা সেই সকাল থেকে। কেন যে এই অস্থিরতা ! এ তো উতলা হবার জিনিস নয়: ধীরে সুস্থে ভাববার—

অনুধাবন করবার জিনিস। যদিও তাই সে চেষ্টা করছিল। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিপুল আগ্রহে পড়াশুনো করতে লাগল। সময়ের ক্রমধারা অনুসারে প্রমাণ সাজিয়ে সাজিয়ে নিজেকে প্রমাণসাপেক্ষ করে আসছিল। কিন্তু ধৈর্য থাকেনি ; স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। অধীরভাবে বারে বারে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে। কেন কে জানে। হয়তো এটা শান্ত-ভাবে ভাববার বিষয় নয়, ভীষণ—ভীষণ অস্থির হওয়ার জিনিস। কারণ সমস্ত বিষয়টার সামগ্রিক রূপটা ভাবতে পারছে যে! ঘুরে ঘুরে ঘরে সুবিন্যস্তভাবে দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর সামনে আকুলভাবে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বিশ্বের মহামানব সব। ওদের ছবির কাছে গিয়েই সে অশান্ত মনে দাঁড়িয়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছে তাদের। তাদের কাছে কোন অনুযোগ করেনি, মাথা অবনত করেনি, শুধু দেখেছে।

ভাবনাটা বহু বছর আগে হঠাৎ মাথায় আসতেই সে ভয়ানকভাবে গুরুত্ব দিয়েছিল। তাই ভাবনাটা মলিন না হয়ে যাতে ভাস্বর হয়ে থাকে অনুক্ষণ, তাই ধীরে ধীরে—একে একে এ ছবিগুলো টাঙিয়েছে। নিজের আচরণে মাঝে মাঝে লজ্জিত হয়ে ভেবেছে, "এটা ছেলেমানুষি হচ্ছে না তো?" যদিও এটা ক্ষণিকের বিভ্রান্তি। পরক্ষণই নিজেকে বিষয়টা গুরুতর বলে বুঝিয়েছে এবং বিশ্বাস করিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হল, "আরো অনেক ছবি আনতে হবে তো।" সে চার দেয়াল ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। "হ্যাঁ, আরো গোটা কতক ছবি কিনতে হবে।" সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে দোতলায় উঠতে লাগল। সমস্ত বাড়িটা যেন মুমূর্ষু জন্তুর নিঃসাড়তায় স্তব্ধ। কেন যেন সে ভয়ে ভয়ে পা ফেলতে লাগল। বাইরে সূর্য, এরি মধ্যে সে চকিতে দেখতে পেল, স্বচ্ছ সোনালী অমৃতধারা। মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে মৃতের প্রাণ সঞ্জীবন। সে বিমর্ষ হয়ে পড়ল ক্ষণিকের জন্য। তারপরই পা ফেলে ফেলে সাবধানে এগিয়ে চলল।

তাদের যৌথ ঘর। এর কাছে এসে দাঁড়াল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চুপিচুপি সাবধানী সারসের মত ঘাড়টা ভেতরে বাড়িয়ে দিল। দেখল, ওদিকে মুখ করে ও আজকার কাগজখানা পড়ছে। অদ্ভুত আশ্চর্য হল সে। একটা উত্তেজনা বোধ করল। তাড়াতাড়ি অথচ নীরবে

এগিয়ে গেল। খাটের কাছে—ওর পেছনটিতে সে নিঃশব্দে দাঁড়াল। ও পড়ে যাচ্ছিল। তার উপস্থিতি সম্বন্ধেও এখনো অজ্ঞান সে শিকারী সারসের মতো গলা বাড়িয়ে পাঠ্যমান অংশ পর্যবেক্ষণের প্রয়াস পেল। দেখে অবাক হল, ও সেই অংশ পড়ছে। সে উত্তেজনা বোধ করল। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। লক্ষ্য করতে লাগল, ওর মধ্যে কোন ভাবান্তর হচ্ছে কিনা। চারিদিকের নৈঃশব্দ্য যেন জোঁকের মতো চেপে ধরে সময়ের রক্ত শুষে খাচ্ছে।

টুকরো টুকরো মুহূর্ত পর পর সাজিয়ে সে ব্যর্থ অনেকটা সময় অপেক্ষা করল। না, কোন ভাবান্তর হল না ওর। পৃষ্ঠা ওল্টানো। সে মনে মনে কাঠ-কাঠ হাসল। 'তাই তো, সবার বোঝবার কথা নয়তো। কিন্তু ওর অজ্ঞতার মতো আমার উপস্থিতি তো সত্য! যদি আমি, একটা হিংস্র জীব হতাম, তা হলে? ওর মৃত্যু এখন অবশ্যম্ভাবী ছিল। তা হলে ব্যাপারটা—ও কাগজটা পুরোপুরি মেলে ভাঁজ করতে গিয়ে টের পেল। পেয়ে ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠল। ফিরে তাকাল। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। 'ঠিক এই রকম। কিন্তু তখন আর হাতে উপায় থাকবে না।' মনে মনে সে না বলে পারল না। আর ওদিকেও আশ্বস্ত হয়ে নিজেকে সংযত করতে লাগল।

"অমন চোরের মতো চুপি চুপি এলে যে?" কণ্ঠস্বর তবু উষ্মায় ভরা ও কম্পিত।

"চোরের মতো কোথায়?" সে অপ্রস্তুতের মতো হাসল। "এ ঘরেও কি আমাকে জানিয়ে আসতে হবে?"

"একটু শব্দ-টব্দ করে এলে আর এমন ভয় পেতে হয় না।"

"তুমি ভয় পেয়েছ?" সে হাসবার চেষ্টা করল।

"এ রকম আচমকা কিছু করলে সবাই ভয় পায়। দেখ না বুকের ভেতর কেমন করছে।" ও কাগজখানা হাতে নিয়ে পড়বার ভঙ্গী করল। সে অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

"কলেজ থেকে যে এত তাড়াতাড়ি এলে?" কাগজের দিকে তাকিয়েই ও বলল।

"আজ কলেজে গেলাম কখন?"

"তাই তো!" বলে ও এদিকে তাকাল। "আমি একেবারে ভুলে

গিয়েছিলাম।" বলে হাসবার চেষ্টা করল। সকালের বিস্ময় ও শঙ্কার ভাবটা চোখে-মুখে ফিরে এল। বলল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"পড়ার ঘরে।"

"একেবারে টের পাইনি!" শুনে সে হাসল। ও বলল, "একটু চা খাবে এখন?"

"না। আমি এখন বেরোব। এ কথা বলতেই এসেছিলাম।"

"কোথায়?" চোখে সন্ত্রস্তের ভাব ফুটে উঠল।

"একটু কাজ আছে।"

"কখন ফিরবে?"

"কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরব।" সে হাসল। তারপর ঘুরে দরজার দিকে শ্লথ গতিতে এগোতো লাগল। ও একটা সন্দেহে বিহ্বল হয়ে সহসা উদ্বিগ্ন-ভাবে ঐ দিকে তাকিয়ে রইল।

ও অবাক হয়ে তাকে লক্ষ করতে লাগল। সে চার দেয়ালে ফাঁকে ফাঁকে আগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক আধখানা করে প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে দিচ্ছিল। এক মনে সে কাজ করে যাচ্ছে—ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল; অর্থাৎ উদ্বিগ্নতায় উৎকণ্ঠিত হচ্ছিল ক্রমশ। একরাশ দুর্ভাবনা নিয়ে কূল পাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছিল। এবং তার ওপর হঠাৎ যেন ও আবিষ্কার করল এ ঘরের অদ্ভুত স্তব্ধতা তার পেরেক ঠোকার শব্দে করুণ ব্যর্থভাবে এই শব্দ সরব হবার চেষ্টা করে বীভৎস হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে তাই ওর নিজেকে নিতান্ত অসহায় বলে মনে হল। তাই তাড়াতাড়ি বলল, "ও কি করছ?"

চমকে উঠল সে। হাত থেকে ছোট্ট হাতুড়ি প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। ফিরে তাকিয়ে বলল, "ও, তুমি।" একটু হাসল। তারপর বলল, "এই দেখ কিরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমিই কত অপ্রস্তুত ছিলাম—অর্থাৎ অজ্ঞ। তোমার উপস্থিতিতে ভয় পেলাম।"

"তা নয় হল। করছিলে কি?"

সে বুঝি হাসল। "ছবি টাঙাচ্ছিলাম।"

"অনেক তো টাঙিয়েছ, আবার—"

"আবার টাঙাচ্ছি এঁরা বাদ গিয়েছিল বলে। জান তো এঁরা বিশ্বের—"

"পাগলামি।"

"তোমার কাছে মনে হতে পারে, আমার কাছে নয়। আর তা ছাড়া ছুনিয়ার পাগল সবাই। কেউ টাকার পাগল, কেউ যশের, প্রেমের কেউ, আমি না হয় একটা কিছু আবিষ্কারের।"

"হাতি। ছবির—নামজাদা লোকের ছবির। কলেজে যাবে না?"

"না।"

"কেন?"

সে ভাবল বলে, "খুশী।" কিন্তু বলল, "ছুটি নিয়েছি।"

"কেন?"

"পাওনা হয়েছে তাই।"

"শুধু শুধু এভাবে—। শরীর খারাপ নয় কিছু নয়—। এভাবে ফাঁকি দেওয়া—"

"ফাঁকি নয়। যা হয়েছে তাই নিয়েছি। কোন দিন ফাঁকি দেইনি। প্রাপ্যকে নেওয়া ফাঁকি বলে না। আমি ছাত্র নই। ছাত্র জীবনেও আমি পড়াশুনো ছাড়া আর কিছু করিনি। দেখো গে তোমার ছেলেমেয়ে কলেজে গেছে কি না। পড়াশুনার নামে অন্য কিছু করে কিনা।"

"তারা সৎ।"

"অর্থাৎ আমি অসৎ।"

"সে তুমি জান।" বলে ও পড়ার ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে এল।

স্তব্ধতা এতদিনে কোলাহলে আত্মসমর্পণ বা আশ্রয় করলে ভাল হত। সে অন্তত মুক্তি না হক সাময়িক স্বস্তি পেত। পাংশু প্রান্তরের মতো সে ক্লান্ত বোধ করছে। না ঠিক তা নয়। অসীম আয়াসে লক্ষ্যে পৌঁছে প্রচণ্ড শূন্যতা দেখে যে ক্লান্তি আসে ঠিক তাই সে প্রমাণের শক্ত খুঁটি বেঁধে বেঁধে গোলক পথে মহাশূন্যের ইঙ্গিত দিয়ে যাবে। তুই আর তুই-এ চারের মতো যদিও এ জিনিস নতুন নয়। এ পথেই সে পেয়েছে। বড় ক্লান্তি বোধ

হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। এই স্তব্ধতায় কথা বললে হবে। বিশ্বের মতো বর্তমান এ বাড়িটাও নৈঃশব্দের শবাধার। এই কৃত্রিম শবাধারের স্পর্শ অনুভব করে অনুভাবনের কথা বলতে হবে। না হলে হবে না—কিছুতেই হবে না।...এইসব জগৎ তাকে ধীরে ধীরে সৃষ্টি করতে হয়েছে। এই পরিবেশ আচার-আচরণ মেঝে-দেওয়ালের নিরুচ্চারতা...সামনের 'লনের' দূর্বার সজীবতা...সব—সব কিছু তাকেই করতে হয়েছে। দূর্বায় পদক্ষেপ কি নিরুচ্চার—আঃ! না না ভয়ঙ্করও। 'সে' সমস্ত জ্ঞানকে আপন বুকে লুকিয়ে রেখে কি ভীষণভাকে অজ্ঞান শৈত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়! ঐ তবে আজকার উত্তর।

"কে?" সে চমকে উঠল।—"আরে কি আশ্চর্য ডাক্তার যে! কি মনে করে? আরে এস এস, ভেতরে এস। বসো। তারপর হঠাৎ চুপিচুপি? কেমন আছ?"

ডাক্তারের পেছন পেছন ও ঢুকল; সে লক্ষ্য করল। ডাক্তার একটা চেয়ারে বসল। ও দাঁড়িয়ে রইল।

'বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই তাই—। হাসলে যে?"

"হাসলাম অম্লান মিথ্যা বললে দেখে।"

"কি করে বুঝলে?"

"তুমিই ভেবে ছাখো।"

"কি করছিলে?"

"পড়াশুনো।"

"তুমি নাকি এ-ঘর থেকে মোটেই বেরোচ্ছ না?"

সে একটু হাসল।

"করছ কি সারাদিন?"

"বললাম তো, প্রমাণ সংগ্রহ করছি।" সে হাসল। বলল, "ভয় নেই পাগল-টাগল কিছু হইনি।"

"ও বলছিল—"

"জানি। এ কদিনের ব্যবহার কিছু অস্বাভাবিক হতে পারে। একটা আবিষ্কার করার আনন্দের মতো আমাকে পেয়ে বসেছিল। আর তার সঙ্গে

প্রবল অনুসন্ধিৎসা। আচ্ছা ডাক্তার তোমার কিছু মনে হচ্ছে না বর্তমান বিশ্ব সম্বন্ধে? কোন ধ্যান ধারণা?"

"কি সম্বন্ধে বলছ?"

সে হাসল। বলল, "বললে আর কি বুঝতে পারবে। বুঝলে আমার প্রশ্নতেই ধরতে পারতে।"

"তবু বলই না।"

"আচ্ছা ডাক্তার তোমার ঐ স্টেথস্‌কোপ দিয়ে রোগীর লাব-ডুব শোন।"

"........."

"যখন বুকে দিয়ে দ্যাখো কোন সাড়া নেই শব্দ নেই, তখন—"

"ধরে নেই মরে গেছে।"

"আর যখন অতিরিক্ত স্পন্দন শব্দ বা অস্বাভাবিক একটা কিছু পাও তখন?"

"ধরি অসুস্থ।"

এই অসুস্থতা সুস্থ নাও হতে পারে। অর্থাৎ কিনা শব্দ দ্রুত হতে হতে চরমে পৌঁছে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে!"

"পারে।"

"আমারও এই কথা।"

"তার আগে তোমার স্পন্দন প্রেশার দেখি; ওঠো।"

"কিচ্ছু দরকার নেই ডাক্তার। আমি সুস্থ আছি, ভয় নেই। যদি সত্যিই কিছু হয়, খবর নিশ্চয় পাবে?"

"কলেজে যাচ্ছো না?"

"এবার যেতে হবে। ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।"

"কি বল, তাহলে আসি এখন।"

"আরে ব্যস্ত হচ্ছে কেন, বোসো। চা খাও। কই, ডাক্তারকে একটু চা করে দাও।"

"না না আমার সময় নেই—একেবারে সময় নেই; ভীষণ তাড়া আছে।" বলে ডাক্তার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পেছন পেছন ও এবং সে এগুতে লাগল।

লনের সযত্ন ঘাসের ওপর দিয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ডাক্তার। সে মোহগ্রস্তের মতো দেখতে লাগল।

"তুমি আবার এঘরে এসে ঢুকলে?"

"কি করব?"

"কেন?"

"তোমাকে এভাবে থাকতে দেখলে আমার ভীষণ ভয় করে।" ও তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।—"তুমি কি এত ভাব বলত?" ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

"ভাবি একটা সময়ের কথা।" সে নিষ্প্রাণ হাসল। "একটা অদ্ভুত আক্রমণের কথা। জানো, ভাবতে তোমার মতো আমারও ভয় করে।" ও চোখ আয়ত করে তাকাল।

"জানো, কোলাহল ও স্তব্ধতা বড় অশুভ।" ক্লান্তভাবে যেন বলতে লাগল। —"কোলাহলের পর স্তব্ধতা। স্তব্ধতার মাঝেই সৃষ্টি ও প্রলয়। এই পৃথিবীও সৃষ্টি হয়েছে বিপুল স্তব্ধতার মাঝে—বিপুল স্তব্ধতা। কোন শব্দ হয়নি, হয়নি কোন আড়ম্বর। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে একটু একটু করে যেন সব কিছুর অন্তরালে থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশ্ব তথা মহাবিশ্ব। যত নক্ষত্র সূর্য সব সৃষ্টি হয়েছে এইভাবে: সম্মিলিত তারকার চূর্ণ আর বাষ্পের মাধ্যাকর্ষণিক সঙ্কোচনের ফলে। এভাবেই বিপুল বেগে ঘুরন্ত সবিতা থেকে কিছু কিছু পদার্থ বাইরে দূরে পড়তে লাগল। সেসব জমে জমে একদিন এই পৃথিবী সৃষ্টি হল। কি নিঃশব্দে হল এটা। আর পৃথিবীতে এমনি ভাবে একদিন প্রাণ সঞ্চার হতে শুরু করল। সময়কে মেনে নিয়ে নানান জীবন এল গেল। তারপর এল মানব। এক এক সভ্যতার সৃষ্টি হতে লাগল। আর ক্রান্তিকালের আক্রমণ একে একে নীরবে বিলীন করে দিল। মনে হচ্ছে বারবার, আর এক ক্রান্তিকাল দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।" সে বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়ল। তার গলা থর থর করে কাঁপতে লাগল। ও আরো তার ঘনিষ্ঠ হল।

'জানো, এখন আমরা বলতে শুরু করেছি, মায়া সভ্যতার মতো বিরাট

সভ্যতা এক শ্রেণীর পিঁপড়ে ধ্বংস করেছে।" সে হাসবার ভান করল। —"মনে হচ্ছে কি জান, সব সভ্যর ধ্বংসের মূলেই থাকে কোন না কোন শ্রেণীর পিঁপড়ে।" তার গলার স্বর থমথম করতে লাগল।

"এই সভ্যতা ক্রান্তিকালের আক্রমণ স্তব্ধতার মুখোমুখি এখন। দ্যাখো, ঐদিকে তাকাও।" সে আঙুল দিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখাতে লাগল। ও তার মুখের দিকে তাকাল। সে ছবিগুলোর দিকে চেয়েই রইল। ভয়ে ভয়ে ও তাকে জড়িয়ে ধরল। ঘরখানা যেন ওঁ ব্রহ্মের ধ্যান করছে। আলোটা যেন অত্যুজ্জ্বল। —"ভাল করে চেয়ে দ্যাখো। এই —এই দ্যাখো, দ্যাখো চেয়ে। প্রত্যেকটা ছবির মধ্য দিয়ে—দ্যাখো দ্যাখো লাখো লাখো পিঁপড়ে কেমন এগিয়ে আসছে দ্যাখো; মহাশূন্য বিজয়ী সভ্যতার বিরুদ্ধে জয়ী হতে। দ্যাখো। দেখতে পাচ্ছ না? পরিষ্কার যে দেখা যাচ্ছে!"

দু'জনে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। আর মায়া সভ্যতার পিঁপড়ে সময়ের সত্যকে মেনে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে ওদের ঘিরে ব্যূহ রচনার জন্য যেন এগিয়ে আসতে লাগল।

'সে অনেক—অনেকদিন আগের কথা ; একদেশে এক রাজা ছিল……'

আবছা অন্ধকার ঘর। সে আস্তে আস্তে মৌমাছির মত গুনগুনিয়ে বলছে। আর খোকন তার অস্পষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অবাক হয়ে শুনছে।

এখন বৈশাখের স্বচ্ছ রোদে বাইরের সমস্ত চরাচর যেন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে—ধুঁকছে। ক্লান্ত—স্তব্ধ দুপুর।

'তারপর ?' খোকন আরও শুনতে চাইল। তার অবাক স্বর যেন অবাক-বিস্ময় নিয়ে ঘরের আবছা অন্ধকার আশ্রয় করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে এই মুহূর্তে কেন যেন ঐ স্বরে বিষণ্ণ বোধ করল।

'তারপর তুমি চোখ বোজো তো, সোনা।' সে বলল।

'না, আগে তুমি বল।'

'চোখ বোজো, আমি বলছি। ঘুমোও।' তারপর সে অতি নীচু স্বরে বলতে লাগল, 'তারপর রাজপুত্র দিনে দিনে বড় হতে লাগল……'

এই 'তারপর ?' কালের স্রোত বেয়ে কতকাল ধরে আসছে ?—কে জানে। সে-ও কতদিন কতবার কত অপার কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে !—অনেক দিনের অনেক ছবি আর সে এখনো ভাবতে পারে : হয়তো কোনদিন পিসিমার চোখ বুজে আসছে। বাইরে দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। দূরে কোথাও একটা ক্লান্ত ঘুঘু একটানা ডেকে চলেছে। অথবা সমস্ত চরাচরই নিশ্চুপ। সারাদিনের খাটুনি আর তার ওপর ঘাম ঝরানো এই অসহ্য গরম,—পিসিমার দু চোখ বুজে আসতে চাইছে। কিংবা সেটা ছিল বর্ষাঋতু। অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। এ ঘরের পাশে টিনের চাল ছাওয়া বারান্দা। তার ওপর বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ উঠছে। সে শব্দে যেন নেশা

জাগে—ঘুম আসতে চায়। পিসিমার চোখেও ঢুলুনি আসত। বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'আর তারপর তারপর করিসনে বাপু, ঘুমো।'

'না, তুমি বল।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'না, তুমি একটা বল।'

'আর পারিনে। কোনটা বলব?'

'সেই রাজপুত্র আর রূপবতী-গুণবতী রাজকন্যার।'

'কতদিন তো বলেছি!'

এ গল্প তার মুখস্ত। তবু তার শুনতে ভাল লাগে। শুনতে শুনতে তার মন হাসে রাগ করে উদাস হয়ে পড়ে। কখনো বা ঐ বর্ষার ধারায় অস্পষ্ট দূরের গাছগুলো ঝাপসা হয়ে আসার মত তার দু'চোখও আবিল হয়ে আসে। কেননা, রাজপুত্র মা-বাবার কাছে বিদায় নিতে এসেছে। সে কোন এক অচিন দেশে যাবে। সেখানে নাকি রূপবতী-গুণবতী রাজকন্যা আছে।

'তারপর?' খোকনের কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসছে।

তারপর রাজপুত্র তার পক্ষীরাজ নিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ছুটল।······সেই পক্ষীরাজের দূরন্ত গতির সঙ্গে তার বুকও নাচত। মাঠের ধু ধু নিশানা আর সেখানের কত অজানা রাক্ষসের ভয়ে বুক দুরদুর করত। তখন সে রাজপুত্রের মুখ যেন স্পষ্ট দেখতে পেত। ও পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে বসে। শক্ত করে হাতে ধরা লাগাম। মুখ ওর নির্বিকার—নির্বিকল্প। ও মুখ তার চেনা। প্রতিদিনের প্রাত্যহিকতায় সে মুখ স্পষ্ট—নিখুঁত। ও ক্রমশ রাজকন্যার মহলের দিকে এগিয়ে আসছে। রাজকন্যা পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে। সে-মুখের সঙ্গে তার আপন মুখের কোন অমিল খুঁজে পেত না।······

অনেকদিন পর সে-কথা একদিন সে বলেছিল। শুনে হাসতে হাসতে ও বলেছিল, 'তা হলে ভাল লোককে রাজপুত্রের জায়গায় বসিয়েছিলে!'

'তা বলতে পার। শুনে অহঙ্কার হল তো?'

'মোটেই না, বরং দুঃখ পেলাম।'

শুনে সে ভয় পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি বলল, 'কেন?'

'আমি তোমার কাছে রূপকথার পাত্র হয়ে ছিলাম বলে। অথচ আমি তোমাকে শুধু তুমি বলেই দেখেছি,—রাজকন্যার মত নয়।'

সেদিন সে সেকথার আর কোন উত্তর দিতে পারেনি। মন তার এক ধরনের বিষণ্ণতায় সারা রাত আচ্ছন্ন হয়েছিল। ভেবেছিল, ও কেন ওভাবে কথাটা নিল। ভাবল না কেন, সেই কোন কাল হতে—সেই রূপকথা শোনার কাল হতে তার মন জুড়ে ও বসে আছে। আচ্ছা, ও যদি তাকে বলত, আমি তোমাকে বরাবর রাজকন্যার মত ভাবতাম। তা হলে কি সে রাগ করত? কখনোই না।······

'তারপর?'

'ঘুমোও খোকন; চোখ বোজো।'

'তুমি বল।'

'রাজকন্যা তখনও সোনার পালঙ্কে ঘুমোচ্ছে। রাজপুত্র ধীরে ধীরে সেখানে ঢুকল।······'

পরে সে বুঝেছিল রাগ করবার সত্যি ওর কারণ ছিল। রূপকথার রাজপুত্রের সঙ্গে ওর কি মিল ছিল? কিছু না। ও তলোয়ার ধরা তো দূরে থাক কোনদিন একগাছি লাঠি পর্যন্ত ধরেনি। ধরেছে কলম। পক্ষীরাজের পরিবর্তে বাইসিক্লে চেপে স্কুল-কলেজে গিয়েছে। বই-এর পাতার তেপান্তরে ছুটে ছুটে চোখে উঠেছে এক জোড়া পুরু কাচ। সেই তেপান্তরে রাক্ষসের ভীষণতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সিনেট হল।

কথাগুলো একদিন ওকে বলে সে খুব হেসেছিল।

হাসতে হাসতে ও বলেছিল, 'খুব ভাল বলেছ।'

'তা হলে আজ রাগ করনি?'

'রাগ করব কেন?'

'সেদিন তো—'

'ওঃ হো, এমনি বলেছিলাম। এখনো মনে রেখেছ? আচ্ছা, আমি

যদি তোমাকে রাজকন্যা—'

'দোহাই তোমার'—

সত্যি কথা, সে রাজকন্যা হতে যাবে কেন? রাজকন্যার রূপ হয়তো আছে; কিন্তু গুণ? সমস্ত গল্পে কোথায় তার গুণ? সে শুধু ঘুমিয়েছে। আর একবার ঘুম থেকে উঠে কড়িখেলায় রাজপুত্রকে হারিয়েছে। এই গুণ যে এখন সর্বপাত্রের অযোগ্য।

পিসিমার প্রভাবে আর মা'র তাড়নায় সে অনেক আগে থেকেই বুঝতে শিখেছিল, তাকে গুণবতী হতে হবে। কেননা, সে রূপবতী নয়, তাদের রূপোও নেই। তার ভাগ্য অনেকটা তার হাতে। সে অন্য সবার মত অনেক কিছু শিখছিল। হয়তো অনেকের চেয়ে বেশী নিষ্ঠা নিয়ে। বড় হয়ে এ সব বুঝেছিল এবং একদিন আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'এই আমার সব। এই দিয়ে আমি তোমার হব।'

এক সন্ধ্যার কথা সে মনে করতে পারল: সূর্য তখন অস্ত গেছে। পূর্বদিকে এক খণ্ড মেঘ রক্তিম হয়ে উঠেছে। ঐ মেঘ ক্রমশ যেন মাঝ আকাশের দিকে এগিয়ে আসছে। দীঘির জল হেমন্তের স্থিরতায় নিথর। ও জলে বিম্বিত মেঘখণ্ডের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'তোমার নিষ্ঠা আমাকে সত্যি মুগ্ধ করে।'

সে বলেছিল, 'আর কিছু নয়?'

'আর কিছু কি?'

'আমার রুচির?'

'আমার ঐ কথার ভেতর সব রয়ে গেছে।'

সে মিষ্টি করে হেসেছিল, কারণ সে জানে, তার নিষ্ঠা একান্ত তার নিজের: ওর যোগ্য হবার। তবু, ওর মন জেনেও এক একদিন ফিসফিস করে নিজের কাছে নিজে বলত, আমি যার হব সে দেখতে রাজপুত্রের মত। আমি ওর যোগ্য হব।

কিন্তু কালের স্রোত অনেক বয়ে গেছে। তাতে হয়তো সমস্ত কিছু ধুয়ে মুছে গেছে। তবু যা সামান্য আছে বলে সে ভাবত, তার অবস্থিতি নিষ্ঠায় নেই, ভাগ্যে আছে। সে একদিন দেখতে পেল, তার ভাগ্যের ঘট শূন্য!

এই শূন্যতার মুখোমুখি হয়ে সে কাঁদাতে বসল না। অবাক হল, দুঃখ পেল। সেই দুঃখবোধে তার অনেক রজনী বিনিদ্র কেটেছে। নিদহারা চোখে সারারাতভর ভেবেছে, যা পেলাম না তা তো পেলামই না, তার সব ব্যথা বেদনা আমার; কিন্তু সে সব বাদে যা রইল তা এত আবিল হয়ে উঠল কেন? এর কোথাও তো আবিলতা ছিল না।

সে হঠাৎ একদিন শুনতে পেল, ওর মা ওর জন্য উপোস শুরু করেছে। কিন্তু কেন? পরে শুনে সে বিস্ময়ে হতবাক হল এবং নিজেকে অসহায় বোধ করল। সমস্ত কিছুর দৃশ্যপট এবার যেন দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগল। ওদের কোন এক আত্মীয় এসে তার মাকে যাচ্ছেতাই শুনিয়ে গেল। আর মা শোনাল তাকে। সে রাগে ফুঁসেছিল; কোন উত্তর দেয়নি। উত্তর দেবার মত কিছু তার ছিল না।

এক সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে দেখা হল। সম্ভবত অফিস থেকে ফিরছিল। সে লক্ষ করছিল, ও তাকে এড়িয়ে যায় কিনা। কিন্তু না, ও সামনে এসে চুপটি করে দাঁড়াল। একটু হাসতে চেষ্টা করল। পরে বলল, 'অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি।'

সে নিরুত্তর দাঁড়িয়েছিল।

'তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।'

'বল।'

'এখানে—এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা যাবে না।' একবার চারিদিক তাকিয়ে বলল, 'চল, ওখানটায় চল।'

তারা এক রেস্তোরাঁর কেবিনে এসে বসল। সে কাঠের খোপটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছিল। সুন্দর পালিশ করা খোপ। কিন্তু এটা রাজকন্যার নিদ বা অন্য কোন মহলই না। সেই সবের স্বপ্নময় নির্জনতাও এখানে অনুপস্থিত। তবু এই তাদের নিভৃত আলাপের কক্ষ।

'আমার মাকে বিয়ের কথা বলেছিলাম। মার প্রচণ্ড অমত, বাবারও ও থেমে থেমে বলল।

বেয়ারা শুধু দু পেয়ালা চা তাদের সামনে রেখে গেল। (বেয়ারাকে রাজকন্যার নিদ্ মহলের পরিচারিকা বলে ভাবতে পারল না)। সে একটা

পেয়ালার ডাঁটি ধরে ধীরে ধীরে এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগল। এবার যেন সে একটু একটু করে সেই নির্জনতার আভাস পেল এবং অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'কিছু বলছ না যে?'

সে তেমনি নিরুত্তর রইল। কারণ, সে বুঝল, এক্ষেত্রে তার বলবার কিছু নেই।

'তুমি আমার ওপর বিশ্বাস হারিও না। বিয়ে আমাদের হবেই।' ওর চোখ দুটো চক চক করতে লাগল আর ঠোঁট দুটো আত্মপ্রত্যয়ের ব্যঞ্জনায় দৃঢ়তা প্রকাশ পেল।

সে তাড়াতাড়ি বলল, 'কিন্তু তোমার বাবা মা—'

'বিয়ে তো আর তাঁরা করছেন না। এক্ষেত্রে আমার মতামতটাই কি বড় নয়?'

সে রাতে তার ভাল ঘুম হয়নি। ভাল লাগার নেশায় নানা আলো-আঁধারির জাল বুনে কেটেছে। একটা কথা তার বার বার মনে হয়েছিল, রাজপুত্রের দৃঢ়তা ওরও আছে। সেকালে মা-বাবার কাছ থেকে কোন বাধা আসেনি; কিন্তু পথের বাধাটাই ছিল বড়। এখন পথের বাধা কিন্তু নেই। হয়েছে প্রথম বাধাটা বড়।

এর পর তাকে অবাক করে দিয়ে একদিন তাদের বাড়িতে গুটি কয়েক ভদ্রলোক এল। মা এসে তাকে বলল, একটু ভাল কাপড়-চোপড় পরে সাজতো। তার বুঝতে কষ্ট হল না, এরা তাকে দেখতে এসেছে। তবু কিছু না বোঝার ভান করে বলল, 'কেন বলতো?' উত্তরে মা মুখ বুজে একটু হাসল। তার চেয়ে বেশী হাসল চোখ দুটো। সে আস্তে করে মাথা নেড়ে বলল, 'না মা, আমি যেতে পারব না।'

'তোকে যেতে হবে।'

'আমি বিয়ে করব না।'

'সে পরে হবে। ওরা তোর দাদার সঙ্গে কাজ করে। তোর দাদার অপমান করিসনি।'

পরে সে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে কথা বার্তা বলেছিল। সম্ভাব্য বরের দিকে তাকিয়েছিল। লোকটিকে দেখে তার মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। তার এতদিনের লালিত আশা আকাঙ্খা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কোন মিল নেই।

ওরা চলে যেতে সে দাদাকে তার সবকিছু স্পষ্ট করে বলল। শুনে দাদা শুকনো মুখে বলল, 'বড় ভাল লোক। আমরা এক সঙ্গে কাজ করি।'

মা বলল, 'তখনি তোকে বলেছিলাম বোনকে অত পড়াসনে ; ফল ভাল হবে না।'

দাদা কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। আর মা শুধু একটা কদর্য মুখভঙ্গি করে মনের সব কথা প্রকাশ করে দিয়ে চলে গেল। সে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার দাদার জন্যে বুকখানা ব্যথা করে উঠল। পরিষ্কার বুঝল, দাদাকে সে ভয়ানক কষ্ট দিল।

আবার সে দিন রাত সে দাদার কথা ভেবেছে, সংসারের কথা ভেবেছে। এই সংসারের জন্য দাদার কি নিদারুণ পরিশ্রম। তার কোন অভাব দাদা সাধ্যমত রাখতে দেয় নি। ঐ একটা মানুষের পরিশ্রমে এই সংসারের অবস্থিতি। বাবা সমস্ত দায়-দায়িত্বের উর্ধ্বে। তার জন্য তো দাদার শর্তহীন বিরাট কর্তব্য রয়ে গেছে। তার জন্য তো দুশ্চিন্তা থাকবেই। সে কেন জানি দাদার জন্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল কিছুক্ষণ।

ভোরে ফোলা ফোলা মুখ নিয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠল। ঘরের বাইরে আসতে দাদা একখানা সুন্দর কার্ড তার সামনে এগিয়ে দিল। সে পড়ে দেখল, রাজপুত্রর বিয়ের আমন্ত্রণ লিপি। সে দাদার দিকে তাকাল। দাদা বলল, 'ওর বাবা এসে আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেলেন।'

সে ওখান থেকে ধীরে ধীরে পশ্চিমদিকের উঠানের সিঁড়িটার ওপর বসল। নীল—নির্মেঘ নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। শুধু এলোমেলো নানান কথা ভাবতে লাগল। আর ঘুরে ফিরে মনের কোণে ভিড় করতে লাগল, ছোটবেলায় শোনা রূপকথাগুলোর কথা। এখনকার রাজপুত্র গাড়ি চড়ে অনেক সহযাত্রী নিয়ে রাজকন্যার সকাশে যায়। চোখে মুখে মিথ্যে আত্মপ্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা ফোটাতে তাদের সহজাত অভিনয় ক্ষমতা বিস্ময়-

কর। তার হাসি পেল ; কিন্তু হাসল না। বরং পরক্ষণে হুহু করে একটা কান্নার আবেগ তার সমস্ত বুকখানা আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, কিন্তু আমি তো অভিনয় করিনি। আমার তো নিষ্ঠা ছিল। তবে আজ আমার ভাগ্যের ঘট শূন্য কেন?

সে সাময়িক বিহ্বলতার উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। মাথার ওপর নীল-নির্জন আকাশ। সে নির্মেঘ নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলতে লাগল. 'আমি জানি, তুমি অসীম শূন্য। তবু তোমার সেই শূন্যতা, ঐ নীলিমা ঐ হাওয়া ঐ সবিতা চন্দ্র তারা দিয়ে কিছু ভরে তুলেছ। কিন্তু আমার এই শূন্যতা? আমার এই শূন্যতার মাঝে কি রাখব?' কান্নার আবেগে তার ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপতে লাগল।

দাদা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আস্তে করে তার মাথার ওপর হাত রাখল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দাদাকে দেখে তার বুকের মাঝে মুখ লুকাল।

'এখন আমি কি করব?' কথাটা আপনি বেরিয়ে এল তার।

'একটু ভেবে দেখ ; দেখবি কিছুই হয়নি।'

সে চুপ করে রইল।

'তুই আরো যদি পড়তে চাস, পড়।'

দাদার এই বিষণ্ণ স্বরে সে এবার কেঁদে ফেলল। বলল, 'না।'

'তোর যা ইচ্ছে।'

'আমি রাজি আছি।'

'কি?' দাদা অবাক হল।

'তোমার সেই অফিসের ভদ্রলোককে বল।'

'এখনই থাক না। তোর মনের—'

না, আমি রাজী।' সে দৃঢ়ভাবে বলল।

দাদা দ্বিধাভরে বলল, আচ্ছা।'

আবছা অন্ধকারে তার চোখ সয়ে গেছে। সে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। ঐ কাঠগুলোকে মোটামুটি দেখতে পাচ্ছে। এবার সে

খোকনের দিকে পাশ ফিরল। খোকন ঘুমিয়ে পড়েছে। আজকের ঘুম তার ঘুচে গেছে। ঘুম আর হবে না। ঘাড়ের দিক তার জ্বালা করছে। মাথা ভার ভার বোধ হল। সে খোকনের মুখের পানে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল। তারপর ঐ ছোট্ট পাতলা ঠোঁটে আলতো চুমু খেয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'অনেক রাজপুত্রের গল্প বলেছি। কাল আর রাজপুত্রের গল্প বলব না। একটা নতুন রাজকন্যার রূপকথা বলব।'

সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ধীরে ধীরে রাস্তার দিকের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানলা খুলে দিতে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। একরাশ তপ্ত উজ্জ্বল রোদ সমস্ত প্রকৃতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে যেন জড়িয়ে ধরেছে। তার নির্মম আবেষ্টনে সব রুদ্ধ—নিশ্চুপ। দূরে সে একটা গাছের ডালে দুটো শালিখ দেখতে পেল। পাখি দুটো তাদের বিবর্ণ ঠোঁট ফাঁক করে ধুঁকছে। সরু রাস্তাটার পিচ গলে কোথাও কোথাও চিক চিক করছে। দু'পাশে চাপ চাপ উজ্জ্বল ঘাস রাস্তার দু'ধার যেন গ্রাস করতে চায়। কঠিন সুন্দর লাগছে দেখতে। যেন আঁট-সাট একখানা ছবি। সে যেন এখন—এই মুহূর্তে ঐ রাস্তার নীচে—ঐ রাস্তার সোলিং-এর নীচে লক্ষ লক্ষ ঐ সুন্দর ঘাসের ভ্রূণকে অনুমান করতে পারল। ওরা নিরন্তর ঐ নির্মম কাল বাঁধন ফুঁড়ে লক্ষ বাহু হয়ে আলো-হাওয়ার মাঝে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওদের না দেখা গেলেও, ওদের প্রাণসত্ব তো মিথ্যা নয়।

'কি আর হবে খোকনকে রাজকন্যার গল্প বলে,—কি হবে।' সে কঠিন রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভাবল।

বরং সে যেন পরিষ্কার দেখতে পেল, খোকন আগামীকাল ভোরের আলোয় ঐ রাস্তার ওপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ ভ্রূণকে মাড়িয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ঐ দূর দিগন্তে—ঐ শিক্ষালয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিপন্ন বিস্ময়

প্রায় ভোরের দিকে একটা স্বপ্ন দেখে গৌতমের ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নটা অতি সাধারণঃ অনেক ফুল ফোটা সুন্দর একটা বাগান। দক্ষিণা হাওয়া না কি হাওয়ায় বাগানের ফুলগুলো মনোরমভাবে দুলছিল। সে সেখানে যেন হঠাৎ এসে হাজির। তার বেশ ভাল লাগছিল এই পরিবেশটা। সে ঘুরে ঘুরে বাগান দেখতে লাগল। এক সময় অবাক হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, কয়েকটা বড় বড় ফুলের মধ্যে এক একটি করে শিশুর মুখ হাসছে। ঠিক যেন ছোটবেলায় পড়া সাত ভাই চম্পার আঁকা ছবির মতো। সে একবার চারিদিক তাকিয়ে দেখল। —হ্যাঁ, সবাই—সব কটা শিশু-মুখ তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওদের চোখ-মুখের অভিব্যক্তি সে যেন পরিষ্কার বুঝতে পারছেঃ ওরা তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। ওরা ওদের গোল গোল ছোট্ট নিটোল হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ছে যেন! সে-ও পায়ে পায়ে ওদের একজনের কাছে এগিয়ে গেল। আগ্রহভরে হাত বাড়াল; কিন্তু না, কোথাও কিছু নেই। সব শূন্য—ফাঁকা। বাগান ফুল—কিছু নেই। একটা গভীর শ্বাসরুদ্ধ অন্ধকার চারিদিক থৈ থৈ করছে। সে নিজেকে ভীষণ বিপন্ন বোধ করতে লাগল। শেষে ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠতে চাইল।···ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে অসহায়ের মতো চোখ ঘুরিয়ে যতটা পারে এদিক সেদিক দেখতে চাইল। কিন্তু কিছুই ঠাহর করতে পারল না। ঘর অন্ধকার। সে হাত বাড়িয়ে দেখল আস্তে আস্তে, মালা ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে। বাইরে দুই একটা পাখি কাক ইতস্তত ডাকছে। গৌতম বুঝতে পারল, বাইরে আলো ফুটতে এখনো অনেক বাকী। গলার কাছে হাত দিয়ে দেখল সে, কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে গলাটা। সে মালার দিকে পাশ ফিরল। মালার কোমরে আলগোছে হাত রাখল। ও নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। গৌতম বুঝতে পারল, আজ আর তার বাকী ঘুমটুকু আসবে না।

ঘরটা এখনো অন্ধকার বলে গৌতমের খারাপ লাগছিল। জানলা অন্তত একটাও খোলা থাকলে এখন নিশ্চয় কিছু আলো-আঁধারির আভাস পাওয়া যেত। কিন্তু মালা কিছুতেই কোন জানলা খোলা রাখতে চায় না। এ সম্পর্কে কিছু বললেই বলে ওঠে সে, এই ঋতু পরিবর্তনে জানলা খোলা রাখলে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করতে পারে। তা পারে। কিন্তু এখন এই অন্ধকার তার মোটেই ভাল লাগছে না। সে আস্তে আস্তে উঠে বসল। মশারি উঠিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সুইচ টিপে আলো জ্বালবে কিনা একবার ভাবল। শেষে আলো না জ্বেলে অন্ধকারেই আন্দাজ করে স্লিপার খুঁজে নিয়ে পায় পরে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। এসে সে ভীষণ অবাক হল। অসম্ভব কুয়াশা পড়েছে! কয়েক পা দূরের কোন কিছুই যেন দেখা যাচ্ছে না। এত গাঢ় কুয়াশা কোনদিন দেখেছে কিনা, সে মনে করতে পারল না। অন্তত কোনদিন ভোরে যে দেখেনি, সেটা সে পরিষ্কার মনে করতে পারল। কারণ, জ্ঞান হবার পর কোনদিন সূর্য ওঠার আগে তার ঘুম ভাঙেনি। ভোরের সূর্য কি রকম দেখতে? মনে পড়ছে না। আপ্তবাক্যের মতো শুনে শুনে তার মনে হয়, সে যেন দেখেছে, বহুবার দেখেছে —লাল নিরুত্তাপ নিরুজ্জ্বল সেই সূর্য। কিন্তু একটু পরের সূর্যকে সে প্রায়ই দেখে। তার সোনার বরণ, শিশিরভেজা গাছের পাতায় পড়ে পিছলে যাওয়া, বেশ ভাল লাগে তার দেখতে। ছেলেবেলায় আরো ভাল লাগত, গৌতম সেটা মনে করতে পারল। কিন্তু আজ সেই জবাকুসুমসংকাশং সবিতাকে দেখবার সুযোগ যদিও বা এল, এই কুয়াশা ভেদ করে সাতটা সাড়ে সাতটার আগে উঠবে বলে মনে হল না। কেমন দুঃখের মতোই কি একটা বোধ করতে লাগল সে।

গায়ে চাদর থাকা সত্ত্বেও একটু একটু শীত বোধ হচ্ছে। আর কুয়াশা লেগে মুখটা কেমন ভিজে ভিজে—ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। পশ্চিম দিকের কাঁঠাল গাছটার পাতা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। আর নীচেকার শুকনো পড়ে থাকা পাতাগুলোর ওপর পড়ে টস্ টস্ শব্দ হচ্ছে। চোখ বুজে শব্দটা শুনলে অনেকটা, বৃষ্টি শেষে পাতা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার মতো। চোখ জ্বালা করছে গৌতমের। কি যে ছাই-ভস্ম স্বপ্ন! আজকাল

মাঝে মাঝেই সে স্বপ্ন দেখছে। আগে যে একেবারেই দেখত না, এমন নয়। তবে সেগুলো ঘুম ভাঙ্গার পর অথবা এক-আধদিন পর প্রায় কিছুই মনে থাকত না। কিন্তু এখন সে প্রায়ই দেখে। এমন কিছু স্বপ্ন নয়—আজকের মতো। এই সব স্বপ্ন-টপ্নের একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা সে অনায়াসে দাঁড় করাতে পারে—এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু ব্যাখ্যার চেয়ে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে বেশী। তার বিরক্তি লাগল ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে—ভীষণ বিরক্তি।

"তুমি কখন উঠলে? এত ভোরে?"

মালার সদ্য ঘুম ভাঙা ফোলা ফোলা মুখের দিকে সে তাকাল। চুল-গুলোও মালার ফেঁপে ফুলে আছে। একটা হাই তুলল ও। তারপর একটু কাছে এগিয়ে এল। আবার জিজ্ঞেস করল, "কখন উঠলে?"

"অনেকক্ষণ।"

"কেন রাতে ঘুম হয়নি?"

"কি জানি কেন, ঘুমটা ভেঙে গেল।"

"শরীর খারাপ লাগছে না তো?"

"না না।"

মালা ভেতরে চলে গেল।

গৌতমের খারাপ লাগল, সকালের প্রথম কথাটা মিথ্যা বলল বলে। অথচ এর কিছু দরকার ছিল না। তবু সে নির্বিকারে মিথ্যে বলল। এতে তার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হল না। চিন্তারও লাঘব হল না। স্বপ্নের উৎ-পাতটা যে বন্ধ হবে, তাও তো মনে হয় না।

সে একজন তরুণ লেখক। মানে, মাঝে-মধ্যে এক-আধটা মনস্তাত্ত্বিক গল্প লেখে। কিছু কিছু লেখক ও ছোটখাট পত্র-পত্রিকার সম্পাদক তার বন্ধু বলে মাঝে মাঝে তার গল্প ছাপায়; তাই সে লেখক। সে এই স্বপ্নের একটা সুষ্ঠু না হোক, মোটামুটি ব্যাখ্যা অন্তত দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু করতে ভাল লাগল না। মনে হল, অযথা মাথায় কতগুলো জট পাকানো। একেই তো কিছুদিন ধরে কোন কিছু ভাল লাগছে না। কোন কোন ব্যাপারে, কি কি বিষয়ে তার ভাল লাগছে না, তা সে কিছুই জানে না।

অথচ ভাল লাগছে না তার অনেক কিছু। একটা অসন্তোষ তার মনের মধ্যে যেন ছায়া হয়ে আলগোছে ঘিরে রেখেছে। তার বারবার মনে হয়, একটা তীব্র প্রতিবাদ করা দরকার। এরকম নীরবে জ্বলে পুড়ে না মরে একটা সরব সোচ্চার প্রতিবাদ করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কি কি বিষয়ে, কোন কোন ব্যাপারে ? তার কোন স্পষ্ট বিষয় খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ তার দৃঢ় বিশ্বাস, বিষয়গুলো তেমন অস্পষ্ট নয়। ছক কেটে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে বসতে পারলে সমস্যাগুলো নিশ্চয় মূর্ত হয়ে উঠবে। ঠিক এই মুহূর্তে সে একটা সমস্যার কথা ধরে ফেলল ;—সময়। তার সময় কোথায় ! সমস্যাগুলো নিয়ে ভাববার কখন সে সময় পাবে। তার হাতে বস্তুত কোন সময় নেই। অথচ বাড়ির সবাই ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবরা বলে, তার হাতে নাকি যথেষ্ট সময়। আশ্চর্য ! এই সময়ের কথা ভাবতে গিয়ে সে কেমন অবসাদ বোধ করল এবং বিস্মিত হল অন্য সকলের তার সম্বন্ধে অজ্ঞতা দেখে।

"বাবা, চা খাবে এসো।"

গৌতম দেখল, তার পাঁচ বছরের মেয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

"চল।"

"চল।" বলল গৌতম।

চা খেতে খেতে গৌতমের মন আরো খারাপ হয়ে গেল। তার সামনে বসে মেয়ে ও তিন বছরের ছেলে বাপী চা খাচ্ছে দেখে। সে অনেকবার আপত্তি জানিয়েছিল মালাকে, এইটুকুন বাচ্চাদের চা দেওয়া নিয়ে। মালা কথা শোনেনি। উত্তরে বলেছে, "ওতে কিছু দোষ হবে না। অনেক দুধে অল্প একটু চা মিশিয়ে দিই। ওতেই সন্তুষ্ট ওরা। আমরা সামনে বসে খাই আর ওরা জুল জুল করে তাকিয়ে থাকে।"

"তাকিয়ে থাকে বলেই দিতে হবে ? ওভালটিন দাও।"

"আমরা খাই বলে—"

"চা-টা এমন কিছু অমৃত নয়।"

"কাল থেকে আমি চা খাব না।" মালা মুখ ভার করে অসহিষ্ণুভাবে বলল।

গৌতম কোন কথা না বলে চুপ করে যায়। মা-ও মালাকে সমর্থন করে, আজকাল সবাই চা খায়। ওতে কিছু ক্ষতি করে না।"

তারপর থেকে গৌতম কোন কথা বলেনি এ ব্যাপার নিয়ে। বিরক্ত হয়ে চুপ করে থেকেছে। নিজের অসন্তোষ নিজেই পুষে রেখেছে।—বাচ্চারা অনেক কিছুই চাইতে পারে, অনেক কিছুই করতে পারে, তাই বলে কি সব মেনে নিতে হবে? আশ্চর্য! মনে মনে মেনে না নিলেও গৌতম চুপ করে গেছে। মালার জিদই বজায় থেকেছে। আজও। সে এই মুহূর্তে ভেবে অবাক হল মালা তার কথা বজায় রাখবার এত আত্মবিশ্বাস পেল কোথা থেকে। ও নিশ্চয় ভেবেছিল, এই কথার কাছে গৌতম নতি-স্বীকার করবে। এর কি সূত্র হতে পারে? তার কোন দুর্বলতা? গৌতম মালার দিকে আড়চোখে তাকাল। ও খাবার প্লেটগুলো গুছোচ্ছে। বাচ্চা দুটো এখনো চা খাচ্ছে। মালা ক্রমশ মুটিয়ে যাচ্ছে। ওর রঙ আরো ফরসা হয়েছে। গলায় দুটো যেন ভাঁজ পড়তে যাচ্ছে। তার রেখা সুস্পষ্ট। এখন এই গলাটাকে, কী যেন বলে,—কম্বুকণ্ঠ বলা যায় হয়তো। ও যদি আরো মুটিয়ে যায়, তাহলে হাঁসফাঁস করবে। সে আর একবার আড়চোখে তাকাল! এই সকালের তাজা মুখেও মালাকে—মালার চোখ দুটোকে কেমন যেন বিষণ্ণ মনে হল তার। প্রিয় কোন একটা কিছু হারাবার পর মানুষকে যেমন বিষণ্ণ ও অন্তর্মুখীন দেখায়, অনেকটা সেই রকম। গৌতমের এসব কথা ভাবতে খারাপ লাগল। তবে কি তার অনেক সমস্যার মধ্যে এটাও একটা? ছকের মধ্যে কি নিয়ে আসতে হবে? বাচ্চা দুটো তার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। গৌতম ওদের দৃষ্টি লক্ষ করে, ভাল করে ওদের দিকে তাকাল। ওরা কার মুখের আদল পেয়েছে—আমার না মালার? এ নিয়ে সত্যি সে কোনদিন ভাবেনি। মা অবশ্য অনেকদিনই কি কি যেন বলেছিল এইসব নিয়ে।—মনে করতে পারল না। আজকার স্বপ্নের কথা আবার তার মনে পড়ল। কই, ওদের সঙ্গে স্বপ্নে দেখা ঐ সব মুখের কোন মিল তো খুঁজে পাচ্ছে না। তারা যেন আরো সুন্দর, আরো মিষ্টি—

নিষ্পাপ। সত্যি কি তাই? স্পষ্ট কিছু মনে করতে পারল না।

অভ্যাসবশে হঠাৎ তার মনে হল, বেলা হয়েছে ; অফিসে যেতে হবে

চোখ জ্বালা করছিল গৌতমের। জ্বর হবে নাকি! চারিদিকে নাকি পক্‌স-টক্‌স লেগেছে। তার অবশ্য গা হাত পা ব্যথা ট্যথা করছে না। হয়তো অত ভোরে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য এরকম লাগছে। কিছুই ভাল লাগছে না। তার ওপর এই পাখার হাওয়াটা অসহ্য লাগছে। এখনো তো তেমন গরম পড়েনি ; অথচ অফিসে ঢুকেই সবাই যেন পাখা খুলে বসতে পারলে বাঁচে। কি যে হয়েছে! অফিসে এলেই সবার যেন গা দিয়ে গরম ছোটে। এত গরম জিনিস খায় এরা! অনেকের বাড়িতেই তো পাখা নেই জানি। বাড়ি ফিরে গিয়ে তখন কি করবে। কথাটা ভাবতেই গৌতম মনে মনে লজ্জিত হল : মানুষ সম্পর্কে এরকম চিন্তা করা খারাপ—খুব খারাপ। বিশেষ করে নিজের সহকর্মীদের সম্পর্কে তার মনে এই কথাটা এল কি করে! ঘুরন্ত পাখার দিকে তাকিয়ে গৌতম্ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। কি অদ্ভুতভাবে হাস্যকর—লজ্জাজনক চিন্তা-ভাবনা! কেমন চুপি-সাড়ে এসে যায়, টের পাওয়া যায় না। তখন শিক্ষা, যুক্তি যেন ঘুমিয়ে থাকে। অনেকটা—অনেকটা সেই ঘুমের ভেতর স্বপ্নের মতো।...না না স্বপ্ন-টপ্ন নিয়ে আর ভাববে না। সকালটাই মাটি হয়েছে আজ।

বেলা প্রায় দুপুর গড়িয়েছে। কাজটাজ তেমন কিছুই করেনি গৌতম। কাজের কথা ভাববার চেষ্টা করল সে। অনেক কাজ বাকি। সিরিয়াসলি ফাইলপত্র টেনে নিয়ে বসল গৌতম। কিন্তু বাধা পেল।

"একটা কথা ছিল রায়বাবু।"

"আমার সঙ্গে?" অবাক হয়ে তাকাল গৌতম।

"হ্যাঁ।"

"বোসো।"

ছেলেটি কিছুক্ষণ দ্বিধা করে বলল, "একটু বাইরে গেলে ভাল হয়। কনফিডেনসিয়াল।"

গৌতম আরো অবাক হয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটিকে দেখতে লাগল। ছেলেটি দেবাংশু—সুধীরবাবুর বড় ছেলে। সুধীরবাবু তার সহকর্মী। সিনিয়রমোস্ট ম্যান। প্রায় বছর দুই হল দেবাংশুকে এই অফিসে ঢুকিয়েছে। জুনিয়র ক্লার্ক। বছর বিশ বাইশ বয়স। কেমন নিরীহ—ভাল ছেলের মতো দেখতে। গৌতম হঠাৎ ভারী গলায় বলল, "এখানে তো কেউ নেই। এখানে বসেই বল না।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেবাংশু বসল যেন। কিন্তু বসে সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু বলল না। গৌতম লক্ষ করল, ওর মুখ ক্রমশ গম্ভীর আর লালচে হয়ে উঠছে। একটা প্রচণ্ড সঙ্কোচ ও যেন কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

গৌতম একটা সিগারেট ধরাল। সিলিংএর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে সিগারেট টানতে লাগল। অর্থাৎ দেবাংশুকে সঙ্কোচ কাটিয়ে ওঠার সময় দিতে লাগল। গৌতম ভেবে অবাক হচ্ছিল, কি এমন গোপনীয় কথা দেবাংশু বলতে চায়। তার সঙ্গে ওর এমন কোন সম্পর্ক নেই যাতে করে গোপনীয় কথা হতে পারে। সে ভেবে যেন কিছু কূলকিনারা পাচ্ছে না।

"বুঝলেন রায়বাবু—" বলবার চেষ্টা করল দেবাংশু। গৌতম আলতোভাবে ওর দিকে তাকাল। কিন্তু দেবাংশু কথা শেষ না করে দ্বিধা করতে লাগল। গৌতম কোন কথা না বলে চুপ করে রইল। সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, দেবাংশু তাকে ওর গোপনীয় কথা না বলে উঠবে না। অতএব তার দিক থেকে তাড়া দেবার কোন অর্থ হয় না। তবে সময় নষ্ট হচ্ছে। তা হোক। আজ তো অনেক সময়ই নষ্ট করেছে। কিছু ভাল লাগছে না। কোন কাজ করতেও না। একটা অসুস্থ মানুষের মতো অবস্থা।

"আজ ক'দিন ধরে বাবা অফিসে আসছেন না।" দেবাংশু বলল।

"কি হয়েছে সুধীরদার?" গৌতম উৎকণ্ঠা প্রকাশ করল। সুধীরদার

খবরটা যেন তার আগেই নেওয়া উচিত ছিল। এখন মনে হচ্ছে, সত্যিই সে ক'দিন ধরে সুধীরদাকে অফিসে দেখতে পায়নি।

"বাবার অপারেশন হয়েছে।"

"কই, তেমন কিছু তো খবর পাইনি। কি হয়েছিল?" গৌতম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। "কি হয়েছে'রে উত্তর দিতে গিয়ে দেবাংশু আবার দ্বিধা করতে লাগল। শেষে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে এক সময় সে উত্তর দিল, "বাবার—বাবা ভ্যাসেকটমি করিয়েছে।"

কথাগুলো শুনে গৌতম হঠাৎ ঝাঁকুনি খেল। অবাক হয়ে সে দেবাংশুর দিকে তাকাল। যেন কুমার ছেলে দেবাংশু অপারেশনটা করিয়েছে। এইবার সে বুঝ‍ে পারল, দেবাংশু কেন এত সঙ্কোচ—দ্বিধা করছিল। প্রৌঢ় সুধীরদা কেন ভ্যাসেকটমি করল হঠাৎ, তবে কারণ খুঁজতে লাগল গৌতম। কি কারণ থাকতে পারে? চিন্তা করতে গিয়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। তাঁর সাংসারিক জীবনের অনেক কথাই তো গৌতম জানে। এখন অন্তত এইসব করার কোন কারণ সে খুঁজে পাচ্ছে না।···আবার এই বয়সে ছেলেটেলে হবে নাকি? সেই লজ্জায় তাড়াতাড়ি—

"তুমি কি করে জানলে, তোমার বাবা ভ্যাসেকটমি করিয়েছেন?" গৌতম সোজাসুজি প্রশ্ন করল।

"বাড়ির অবস্থা দেখে অনুমান করলাম। তা ছাড়া আমার অনুমান অমূলক নয়।"

"এতদিন ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছেন কেন সুধীরদা? এই অপারেশনে তো দু'একদিন বিশ্রামই যথেষ্ট।"

"বোধ হয় ভয় পেয়েছেন, তাই।"

"হঠাৎ এই বয়সে এসব করতে গেলেন কেন?" অনেকটা স্বগতভাবে গৌতম বলল।

"ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার একেবারে ছোট বোনের বয়স দশ। ···আমরা একটু বেশী ভাইবোন; কিন্তু তাই ব'লে···বুঝলেন রায়বাবু, প্রদ্যোত—প্রদ্যোতবাবুই এ সবের মূলে।" দেবাংশু উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার ঠোঁট কাঁপছে। মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। হিসহিসে গলায়

বলতে লাগল, "হি ইজ দি রুট অব অল ট্রাবলস। আমি ওকে খুন করব—খুন।"

"এই দেবাংশু আস্তে—আস্তে; আশেপাশে শুনতে পাবে।"

দেবাংশু নিজেকে কোনরকমে সংযত করল। কিন্তু রাগে উত্তেজনায় একটা পেপার ওয়েট হাতে চেপে ধরে রাখল। তারপর আবার কিছুটা হিসহিসে গলায় বলতে লাগল, "বাড়ি ঢুকতে লজ্জা করে। বড় বড় সব বোন, কিছু না বোঝে এমন নয়। আজকালকার মেয়ে। আমার বাবা মা ভাই বোনের দিকে তাকাতে লজ্জা করে। হঠাৎ এই সবের কারণ, ভাবতে লাগলাম। অফিসে খোঁজ খবর নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারলাম। আমাদের কম্পাউণ্ডার প্রদ্যোতবাবু প্রমোটার হয়েছেন। বাবাকে নানারকম বুঝিয়ে সুঝিয়ে, বেয়াড়া সব ঘটনার রেফারেন্স টেনে, ভয় দেখিয়ে রাজী করান। এতে তার লাভ আছে। প্রত্যেকটা কেসে কিছু টাকা পান। বাবাকেও নাকি বোঝান হয়েছে, সেও টাকা পাবে। এইসব নোংরা জিনিস কি আর বলব। আমি ঠিক করেছি, ওকে আজ রাস্তায় জুতোবো।''

"না না দেবাংশু ওসব করতে যেও না।"

"কি বলেন রায়বাবু! ওকে মারা দরকার।"

"তাহলে আমাকে এসব কথা বলতে এলে কেন?"

এই প্রশ্নে. দেবাংশু কোন কথা বলতে পারল না চট করে। পরে কিছুটা হতাশার সুরে বলল, "জানেন, কাউকে কোন কথা না বলতে পেরে, আমি ভীষণ অসহায় বোধ করছিলাম। লোকটাকে একটু চেক করা দরকার। জানেন, ঐ লোকটা অনেক বয়স্ক লোককে—যারা দুদিন বাদে রিটায়ার করবে তাদেরও ভজিয়ে ভাজিয়ে তার কার্যসিদ্ধি করছে। তারা অনেকে এর ওর কাছে ওর সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছেন।"

"ঠিক আছে দেবাংশু, আমি যা বলবার বলব প্রদ্যোতকে।"

দেবাংশু উঠে ধীরে ধীরে হেঁটে ওর সেকশানে চলে গেল।

সমস্ত ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে গৌতম অবাক হল। কি যে সব ঘটছে আজকাল! কত তাড়াতাড়ি আমাদের চিন্তা ভাবনা রুচি সমাজব্যবস্থা

পালটে যাচ্ছে—কি দ্রুত ! তা না হলে সুধীরদা এত কচি খোকা নয় ঃ যা বোঝাল তাই বুঝল আর করল। নিশ্চয় কোথাও গণ্ডগোল বেঁধেছে। তাছাড়া এই প্রদ্যোত। একটা আস্ত আহাম্মক। এই ধরনের অনেক অভিযোগ এর আগে সে শুনেছে। না, ওকে একটু সংযত করা দরকার। যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন তাদের না বুঝিয়ে বুড়ো হাবড়াদের নিয়ে টানাটানি। অথচ এই লোকটার কোন বাচ্চা-কাচ্চা নেই। চৌদ্দ পনের বছর ধরে বিবাহিত জীবন যাপন করে একটা সন্তান দিতে পারল না স্ত্রীকে। আর এদিকে অন্য সবাইকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে যাচ্ছে।

গৌতম আর একটা সিগারেট ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে পোড়া কাঠিটা নিবিয়ে বিরক্তিভরে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। চারিদিকে শুধু ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফ্যামিলি প্ল্যানিং। যেখানে সত্যিকারের প্রয়োজন, সেখানে তো সে কিছু দেখতে পায়নি বা পাচ্ছে না। অথচ যত আলোড়ন উত্তেজনা সব এই মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্তদের মধ্যে। যাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে তার চেয়ে কম সন্তান নিয়ে স্বার্থপরের মতো সুখে থাকবার চেষ্টা করছে। সে একটা ক্রোধ অনুভব করতে লাগল। প্রচার দরকার; কিন্তু তার একটা শালীনতা থাকা দরকার। সে কিন্তু এর মধ্যে বিন্দুমাত্র খুঁজে পাচ্ছে না। তার সবচেয়ে খারাপ লাগে ঐ লাল ত্রিকোণ প্রতীকটা। এত অশ্লীল যে তাকান যায় না। দেখলেই তার ওটাকে যাচ্ছে তাই ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। অশ্লীল, চূড়ান্ত অশ্লীল! অথচ ফ্যামিলি প্ল্যানিং এক তরফা শুধু মেয়েদের নয়। না; যৌন ব্যাপারটায় আর কোন গোপনীয়তা থাকছে না।

গৌতম উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় একটা। সে ক্যান্টিনের দিকে পা বাড়াল। যেতে যেতে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল। আগেই পড়া উচিত ছিল। দেবাংশু সব গোলমাল করে দিয়েছে। আড়াইটার সময় সবিতা মেট্রোর লবির নীচে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। কি যে ওর দরকার, কে জানে। ফোনে কারণ জিজ্ঞেস করায় ও কিছু বলেনি। সবিতা সম্পর্কে তার পরিষ্কার করে ভাববার সময় এসেছে। তার যদি এখন বিশ বাইশ বছর বয়স হত, তা হলে পুলকিত হয়ে ছোটা যেত

সবিতার কাছে। একটা নির্জন জায়গা দেখে, কোমর জড়িয়ে ধরে গদগদ করে প্রেমের বুলি আওড়ানো,—হয়তো ভাল লাগত তাতে। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছরে পা দিয়ে এইসব কথা চিন্তা করতে অস্বস্তি লাগে, বিরক্তি বোধ হয়। কি যে চায় সবিতা তার কাছে! গৌতম এইসব নানান কথা ভাবতে ভাবতে

অফিসারের চেম্বারে ঢুকল। অফিসার মিঃ বাসু একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। সে একবার ভাবল, বেরিয়ে যাবে কিনা। শেষে সোজা সামনের চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

"আপনার অফিসের পর গেলে হয় না?" মিঃ বাসু মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল।

মেয়েটি তাদের টাইপিস্ট। গৌতমের সঙ্গে বিলক্ষণ আলাপ আছে। মেয়েটি ঘাড় চুলকোবার ভান করছিল। গৌতম তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাল। খুব খারাপ লাগছিল তার। বিশ্রী লাগছিল দেখতে মেয়েটির জামার বগলের কাছটা। এরা কি নিজেদের সম্বন্ধে তেমন সচেতন নয়?

"আচ্ছা যান। এতে আমার খুব অসুবিধা হয়।"

মেয়েটি বেরিয়ে গেল।

"কি ব্যাপার রায়।" গৌতমের দিকে তাকাল মিঃ বাসু।

"আমারো ঐ একই ব্যাপার।" বলে হাসতে লাগল গৌতম।

"দেখুন, আপনারা যদি একে একে সবাই বেরিয়ে যান অফিস থেকে, তাহলে কি করে চলে। যদি একটা কিছু ঘটে যায়, আমি কি কৈফিয়ৎ দেব ম্যানেজমেণ্টকে।"

"আমার দাঁতটা ক'দিন ধরে ট্রাবল দিচ্ছে। একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছি আজ, তাই।" গৌতম অনায়াসে মিথ্যেটা বলল।

"যান, কি আর বলব।"

চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসেই গৌতমের রাগ গিয়ে পড়ল সবিতার ওপর। ওর জন্যই এই অবলিগেশন।

সবিতা ঠিক দাঁড়িয়েছিল। চোখে একটা সানগ্লাস থাকা সত্ত্বেও গৌতমের দূর থেকে ফিল্মস্টার মনে হচ্ছিল।"

গৌতম হাসতে হাসতে কাছে এসে প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বলল, "তোমাকে দূর থেকে ফিল্মস্টার ফিল্মস্টার মনে হচ্ছিল।"

"তাই নাকি? ওটা তোমারই মনে হয়েছে। অন্য কেউ তো তাকাল না।"

"মেয়ে হিসেবেও তাকায়নি?"

সবিতা হেসে ফেলল।

"আমি অবশ্য মনে হওয়ার কথাই বলেছি।"

"ও।"

"এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?"

"কোথায় যাবে?"

"সে তো তুমি জান।'

"সিনেমা দেখাবে?"

"এই জন্যে আসতে বলেছ?"

"না না, অন্য কাজ আছে। দেখবে?"

"অসম্ভব।"

"তোমাকে বিশেষ সিনেমা দেখতে দেখি না।"

"দেখি। তোমার সঙ্গে তো অনেক দেখেছি। তবে সত্যি বলতে কি, আমার তেমন ভাল লাগে না। ঠায় আড়াই তিন ঘণ্টা বসে থাকা আমার পোষায় না। সিগারেট খেতে পারা যায় না।" বলতে বলতে গৌতম পকেট থেকে সিগরেট প্যাকেট বার করল।

"তবে চল, কোথাও গিয়ে বসি।"

"রেস্টুর‍্যান্টে?"

"চল।"

"বেশ গরম পড়েছে" অনেকটা আত্মগতভাবে বলল গৌতম।

"বিকেলের দিকে তো বেশ ঠাণ্ডা পড়ে।"

"এখন রোদ মোটেই ভাল লাগে না। এই দেখ, কেমন ঘেমেছি।"

"ঘাম দেখছি কেবল তোমারই আছে।"

গৌতম একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে হাসলে। তারপর বলল, "হঠাৎ দেখা করতে বললে কেন?"

"এমনি। অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।" বলে হাসতে লাগল সবিতা।

"সে কি, এই তো দিন তিনেক আগে দেখা হল!" গৌতম বিস্মিত হল।

"তাই কি কম হল।" তেমনি দুষ্টুর মতো হাসতে লাগল সবিতা।

"দেখ, যেভাবে কথা বলছ যেন তুমি আমার নব-বিবাহিত স্ত্রী। বাপের বাড়ি অনেকদিন আছ, তাই লুকিয়ে এসেছ দেখা করতে।"

কথাটা শুনে সবিতা লাল হয়ে উঠল। কিন্তু তেমনি হাসতে হাসতে চতুরভাবে বলল, 'এসব তুমি ভাল জান।"

"যে রকম মনে হল, তাই বললাম।"

"তোমার ছেলেমেয়ে বউ কেমন আছে?"

"ভাল।" বউ ছেলেমেয়ের কথা আসতে গৌতম অস্বস্তি বোধ করল। ঠিক কেন, বুঝতে পারল না। পরস্পরের কথা তারা মোটামুটি জানে, তবুও।

"একদিনও ওদের দেখালে না।"

"তোমাকে তো আমন্ত্রণ জানিয়েছি।"

"তুমি অস্বস্তি বোধ করছ?"

"কেন?"

"শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছ যে।"

"ও। মোটেই না।"

দুজনে চুপ করে রইল। আপাতত আলোচনারই কোন প্রসঙ্গ খুঁজে পেল না। ওয়েটার পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল। গৌতম সবিতার দিকে তাকাল। সবিতা চোখের ভাষায় যেন বলল, যা ইচ্ছে হয় বল। গৌতম যা বলার বলল। ওয়েটার চলে গেল।

"এইভাবে অফিস থেকে চলে আসা একটা অবলিগেশন।" গৌতম অনেকটা বিরক্তির সুরে বলল।

"আমিও তো এসেছি।"

"তোমার সরকারী অফিস ; আর আমার মার্চেণ্ট ফার্ম।"

"সরকারী অফিস বুঝি অফিস নয়?"

গৌতম হেসে ফেলল। বলল, "তোমাদের এসব চালু আছে। ওপেন সিক্রেট।"

"ওইটুকুই তো সুবিধা ; তা ছাড়া আর কি আছে।"

"আচ্ছা সবিতা, একটা কথা বলব। অফ কোর্স তুমি যদি না রাগ কর।

"বল।"

তুমি এখনো বিয়ে করছ না কেন? তোমার আগের দায়দায়িত্ব তো অনেক লাঘব হয়েছে। ছোট ভাই-বোন দুটিও তো চাকরি পেয়েছে। এখন তো আর বলতে পারবে না, সংসারের জন্যে।"

"হচ্ছে না তাই।"

"বাজে কথা। কিন্তু বয়েস—"

"আমার তেমন বয়েস হয়নি।" সবিতা হাসতে লাগল।

"বিয়ে না করলে অবশ্যি চিরকালই কুমারী—হয়তো যুবতীও থাকবে।" গৌতম হাসতে হাসতে বলল, "জান, তোমার ওপর মাঝে মাঝে ভীষণ বিরক্ত হই। ভাবি, তোমার সঙ্গে আমার এত কি প্রয়োজন। যদি বিবাহিত না হতাম, তা হলে একটা কথা ছিল। তুমি হেসো না সবিতা, সত্যি বলছি। আজই বিরক্ত হয়েছিলাম যখন ছুটির জন্য হাত কচলাচ্ছিলাম। অথচ দেখ, না এসে পারলাম না। এসে আবার ভীষণ ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, আসাটা আমার প্রয়োজন ছিল।"

ওয়েটার খাবারের ডিশগুলো টেবলের ওপর রেখে পর্দা টেনে দিয়ে চলে গেল।

"থামলে কেন? বল।"

"তুমি ঠাট্টা করছ?"

"না না সত্যি বলছি।"

"তবে হাসছ কেন।"

"তুমি যদি বল, হাসব না।"

"সবিতা", গৌতমের গলাটা সহসা কাঁপতে লাগল। "তোমায় একটা চুমু খাব।"

"কি বলছ!" মুখটা লাল হয়ে উঠপ সবিতার। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"ডোণ্ট বি সিলি। ডোণ্ট ক্রিয়েট এ সীন. সবিতা।"

সবিতা আস্তে আস্তে বসল আবার।

'তুমি রাগ করেছ?"

সবিতা হাসল। হাসিটা কেমন ম্লান দেখাল। তারপর হঠাৎ সবিতা মুখটা এগিয়ে আনল গৌতমের দিকে। গৌতম ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রাখল।

বড় ক্লান্ত বোধ করতে লাগল গৌতম। বাস স্টপে আরো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কে জানে। একটা সিগারেট ধরাল সে। যাবার সময় সবিতাকে তার সবিতার মতোই মনে হল। হঠাৎ যে কি হল তার! বড় ভাল লাগছিল ওকে। ও যেন দিন দিন আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। ও-ও যে মালার মতো মুটিয়ে যাচ্ছে! গৌতম ভেবে অবাক হচ্ছে, ও এখনো কেন বিয়ে করছে না। কোথায় যে অসুবিধা ওর সে বুঝে উঠতে পারছে না। ওর সঙ্গে আলাপ তার আজ ছ' সাত বছর। কিন্তু সত্যিকারের কতটুকু জানে ওর সম্বন্ধে। কেন যে তার সঙ্গে সবিতা ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ নিবিড় করে তুলছে বুঝতে পারছে না। ঠিক করেছিল ওর সঙ্গে সম্পর্কটা আজ পরিস্কার করে ফেলবে। কিন্তু কি হল? হঠাৎ কাঁধের কাছে একটা হাত পড়তে গৌতম চমকে উঠল। ঘুরে তাকিয়ে দেখল নিশীথ হাসছে। 'কি মাল. দাঁড়িয়ে আছিস? দূর থেকে দেখলাম ঝোড়ো কাকটা দাঁড়িয়ে আছে।"

গৌতম হাসল। বলল, "বাসের জন্য।"

'কোথায় যাবি?"

"আর কোথায়, বাড়ি।'

"সেই ব্যারাকপুরে?"

গৌতম হাসল।

"চল ঘুরে আসি।"

"রাত হয়েছে।"

"রাত কোথায় রে শালা। এই তো সবে সাড়ে সাতটা।"

'ফিরতে রাত হয়ে যাবে রে।"

"রাখ রাখ হয়েছে। চল এবার। বিয়ে করে তো শালা লেখাও প্রায় ছেড়েছিস। বন্ধু-বান্ধব ছাড়বি নাকি? চল চল।"

গৌতম অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলল নিশীথের সঙ্গে।

"লেখা-টেখা ছেড়ে দিলি?" যেতে যেতে নিশীথ বলল।

"না। আবার আরম্ভ করেছি।"

"যাক, সুমতি হয়েছে।"

"তোর লেখা কেমন হচ্ছে।"

"মোটামুটি।"

"চললি কোথায়?"

"চল কোথায়ও। বুঝলি, গেল শনিবার দারুণ একটা দাঁও, মেরেছি। মোট টাকা রে। পাপের টাকা। খরচ করতে হবে। খচ খচ করছে।"

"পেলি কোথায়?"

"ঘোড়ার লেজ ধরে।"

"তা, যাবি কোথায়?"

"চল না. অনেককে পাবি সেখানে।"

"কফি হাউসে?"

"দূর দূর, ওখানে আজকাল ঢোকা যায় না। আবার দুপুরের দিকে গিয়ে দেখবি হয়তো টুইস্ট হচ্ছে।" একটু থেমে বলল, "একটা বারে যাচ্ছি।"

"এই এখন মাল গিলবি?" উৎকণ্ঠিত সুরে গৌতম জিজ্ঞেস করল।

"ন্যাকা চৈতন। এতদিন গিলে এখন সাধু সাজছিস। বউ বকবে নাকি?"

বারে ঢুকে আরো তিনটি মক্কেল পাওয়া গেল। গৌতম আস্তে নিশীথকে

জিজ্ঞেস করল। "তোরা আজকাল এখানে বসিস নাকি?"

ওদের কাছে যেতে সত্য বলে উঠল, "নিশীথ, এই কেন্নোটাকে কোত্থেকে ধরে আনলি?"

গৌতম হাসল।

"বাস স্টপ থেকে। শালা বলে কিনা, এত রাতে মাল গিলবি! বোস্টম হয়েছে।"

"না আজকাল আর খেতে ভাল লাগে না। আজ যখন সব ক'টা পাপী আছিস, তখন সামান্য খাব।" তারপর নিশীথের কানের কাছে মুখ নিয়ে গৌতম বলল, "এখন কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে নিশীথ।"

"আরে বাব্বা পালের শুয়োর যাবে কোথায়? খোঁয়াড় কতক্ষণ ভাল লাগে। হ্যাঁ রে বাদল, সুজিত আসেনি?"

"রাখ ওর কথা" বাদল বিরক্তির সুরে বলল, "সবিতার সঙ্গে গেছে হিল্‌টি দিতে। শালা কতদিন আর ঘুরবি এভাবে?"

"কোন সবিতা?" গৌতম ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

"সুজিত বলে, ওর ফিয়াসেঁ। আমি বলি ওর প্রেতাত্মা। গড়পারে থাকে। চিনিস?" বাদল বলল।

গৌতম আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ল।

"তুই যে ভাবে জিজ্ঞেস করলি যেন তোর চেনা।" সত্য ব্যঙ্গের সুরে বলল।

"ও হো, তোরও তো এক সবিতা ছিল। কি খবর রে? এখনো ইয়ে টিয়ে আছে?" নিশীথ বলল।

"হয় মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ।" গৌতম আলতোভাবে বলল।

"আলাপ করিয়ে দে না। তুই তো বিয়ে করেছিস;—বউ আছে, আর কি দরকার। আমাদের লাইফটা যে হেল্ হয়ে গেল।"

"বিয়ে কর।"

"তুই শালা ডাঁটা চচ্চড়ি।"

ওয়েটার কাছে আসতে গৌতম আস্তে বলল, "নিশীথ, মাংস স্যালাড বেশি করে আনা। মাইরি, প্রায় খালি পেট, ডাউন হয়ে যাব।"

"গৌতম, তুই আর খাসনে। তোর চোখ লাল হয়েছে—ভীষণ।" নিশীথ সাবধান করল।

"ঠিক আছে। ভয় নেই।"

"বললি একটু খাবি, এখন বোতল হয়ে বসে আছিস।"

"খেতে বসে ঘোমটা টানতে ভাল লাগে না।"

"আরে শালা ঘোমটার মধ্যে খ্যামটা নাচ জমে ভাল।" সত্য হাসতে হাসতে বলল।

"সে তো বটেই। ঘরে বউ চরিত্রের সার্টিফিকেট আর বাইরে সবিতা-রাধিকা—আরাধিকা।" নিশীথ গম্ভীর গলায় বলল।

গৌতম হাসল। ঘড়ি দেখল, দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। গৌতমের খারাপ লাগল। অনেক রাত হয়েছে। শরীরটা বেশ হাল্কা বোধ হচ্ছে। আর একটু বসে থাকবে কিনা ভাবল। চারিদিকে একবার তাকাল। অমলের মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে। ও সারাক্ষণই কম কথা বলছিল। এখন একেবারে চুপ—স্থির। তার নাকি চোখ লাল হয়েছে। নিশীথ নিজের চোখ দেখতে পাচ্ছে না তাই, না, হলে "আতকে উঠত। হঠাৎ গৌতমের নজরে পড়ল নিশীথের অনেক চুল পেকেছে। কি আশ্চর্য! কাল বসে নেই। তার ছাপ রেখে যাচ্ছে ঠিকই। সে ভেবেছিল তারই অকালে চুল পেকেছে।

সব কিছু কেমন স্তব্ধ হয়ে আসছে। ঘড়ি দেখতে আর ইচ্ছে করছিল না। ঘরের মধ্যে একটা ক্ষীণ ওয়েস্টার্ন মিউজিক বাজছে। সুরটায় কেমন ঘুম ঘুম আসছিল। ইতস্তত কিছু লোক টেবল চেয়ার আঁকড়ে বসে আছে। ঘরের বিবর্ণ হলদে আলো দেখতে দেখতে গৌতমের এক সময় নিজেকে বড় নিঃস্ব মনে হচ্ছিল। বাদল নিজের হাতের রেখা দেখছিল। সত্য নিশীথ ফিস ফিস করে কি এক গভীর আলোচনা করছে। নিশীথ এখন মাথা নীচু করে শুনছে। সত্য এবার আত্মার কথা বলছে। সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতো গভীর প্রজ্ঞা বলে আত্মার শ্রেণী বিভাগ করছে। সব আত্মাই সমান নয়। মানুষের আত্মা আর মানবেতর জীবের আত্মা নাকি কখনই এক হতে পারে

না। কেননা পরিশীলিত হতে হতেই মানব আত্মার উত্তরাধিকারী হওয়া যায়। রাত পৌণে এগারোটা হল। গৌতম ভাবতে লাগল, তাকে যেতেই হবে। আর একটা মাত্র ট্রেন বাকী আছে। তা না হলে মালা চিন্তা করবে। কাল আবার অফিস। রাতে আবার সেই স্বপ্ন দেখবে হয়তো। অত সুন্দর স্বপ্নও বিশ্রী লাগে। না না, ওটা নিয়ে না ভাবাই ভাল। হয়তো কালই সবিতা আবার ফোন করবে। কেন ও তাকে নিয়ে এত ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। কি চায় ও। শুধুই বন্ধুত্ব? ওর কাছে আমি যা চাইব ও তা দেবে—নিশ্চয় দেবে। ওর দেহমন সব—। সব কিছু আশ্লেষেও আপত্তি করবে না—না, করবে না। না, না, আমি চাই না—চাই না সবিতা, আমি গৌতম তোমাকে বুঝতে পারছি না—একেবারেই না। তুমি আমার সব জান। কিন্তু মালা কিছুই জানে না। আমার একটা পাপ বোধ হচ্ছে। সত্যি হচ্ছে। আমি ঠকিয়েছি মালাকে এবং এখনো ঠকাচ্ছি। মিথ্যে তিন সন্তানের ডিক্ল্যারেশন দিয়ে আমি মালাকে ডাক্তার দিয়ে বন্ধ্যা করিয়েছি। ও আর কোন সন্তানের মা হতে পারবে না। আমার যেন আজকাল বার বার মনে হচ্ছে. মালা আর একটা বাচ্চা চায়। আমি স্বার্থপরের মতো—ভাল মতো বাঁচতে ঝুঁকি কম নিতে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য—ভবিষ্যতের জন্য—আমার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আর একটি সন্তান আনতে চাইনি। অথচ আমার উপভোগ করা ঠিক চাই। ভাল মতো চাই। ভাল মতো চাই। আর মালাকে নিয়ে ভয় নেই। আমি ঐ মাংস পিণ্ডটাকে সহবাস করব—সম্ভোগ করব অথচ সন্তান চাই না। ভয় নেই কোন, নেই কোন উৎকণ্ঠা। এ আর ভাল লাগে না। না লাগে না। আচ্ছা সবিতার তো সন্তান হতে পারে? ছি ছি, না না! গৌতম সোজা হয়ে বসল। ওয়েস্টার্ন মিউজিকের সুরটা আলগোছে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়া সব যেন স্তব্ধ। গৌতম উঠে দাঁড়াল। ভীষণ গরম লাগছে। সমস্ত মুখটা ঈষৎ জ্বালা করছে। অমল তেমনি ঘাড় ঝুঁকিয়ে বসে আছে। বাদল এখনো নিজের হাতের রেখা দেখছে। সত্য তেমনি বুঝি মুখ নেড়ে তার প্রজ্ঞার কথা বলছে। নিশীথ শুনছে। গৌতম আস্তে বলল, "সত্য নিশীথ. রাত হল। উঠি কেমন?"

বাইরে এসে গৌতম অবাক হল। দেখল, চারদিকে—দূরে অদূরে—মাঠের কাছাকাছি সকালের মতো কুয়াশা পড়েছে। রাস্তার আলোর চারপাশে কুয়াশা যেন ওৎ পেতে আছে। পথ এক রকম জনবিরল। তবু ইতস্তত কিছু লোক কুয়াশার মধ্য দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটা তার অদ্ভুত লাগল। অবাক হয়ে দেখতে লাগল। আর বারবার ভাবতে লাগল ওরা কারা? হঠাৎ গৌতম আবিষ্কার করল, ওরা সব যেন তারই চেনা চেনা। কিন্তু কারা? বিপন্ন বিস্ময় নিয়ে ভাবল, সুধীরদা মালা ইত্যাদি ওরা এখানে কেন! এত রাতে—লুকিয়ে লুকিয়ে! এত—এত সব। ওরা। তবে তো ওরা অনেক—অনেক! চেনা বড় কষ্ট যে!

ওদেরই দেখবার জন্য গৌতম তাড়াতাড়ি কুয়াশার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

লিফট থেকে ফ্লোরে পা বাড়িয়ে দিয়েই নিজের চেম্বারের দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে নিলেন। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন মিস্টার সরখেল। একটু চাপ দিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। ঘরের চারিদিক মুহূর্তে তাকিয়ে দেখে নিলেন। বাড়তি সবকটা চেয়ার দখল হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তাকে দেখে সবাই মোটামুটি একই আগেপিছে করে উঠে দাঁড়াল। তিনিও সবাইকে মর্ণিং জানিয়ে 'এক মিনিট' বলে ব্রিফ্‌কেসটা টেবিলের ওপর রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। ঠিক একই গতিতে গিয়ে টয়লেটে ঢুকলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সবকিছু তাড়নার থেকে মুক্ত হয়ে বেসিনের কাছে এলেন। যত্ন করে মুখ ধুলেন। তোয়ালে দিয়ে একটু ঘষে ঘষে মুখ মুছলেন। তারপর আয়নার দিকে তাকিয়ে চুল আচড়াতে আচড়াতে নিজের মুখের দিকে তাকালেন। সবকিছু ঠিক একই রকম আছে। অবিকল। তোয়ালে দিয়ে একটু বেশী ঘষার জন্য মুখখানা ঈষৎ বেগুনী আভা ফুটে উঠেছে। এটা তার ভালো লাগেনা। তবুও তিনি করেন। এতে একটা পরিচ্ছন্নতার তৃপ্তি পাওয়া যায়। আর অভিজ্ঞতায় জানেন, কিছুক্ষণের মধ্যে সবকিছু মিলিয়ে গিয়ে নিবিড় হয়ে আসবে। এই বয়সে এসে রংটং নিয়ে আর তেমন বেশী ভাবায় না। অথচ কৈশোরে আয়নায় নিজেকে কিন্তু খারাপ লাগত না। বেশ ভালই লাগত তখন। সে সময় নিজেকে সুন্দর দেখার বয়স। তারপর যত দিন যায় তত নিজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হয়। ত্রুটিমুক্ত হওয়ার চেষ্টা বাড়ে। কিন্তু গায়ের রং নিয়ে তো আর করার কিছু নেই। ছেলেবেলা থেকেই তো তার বর্ণ মাহাত্ম্য নিয়ে শুনে আসছেন। বন্ধু-বান্ধবরা প্রায়ই লেগপুল করত। বলত, 'তুই কি করবি বলত সুকুমার? তোর বিয়ে করার ল্যাঠা আছে।'

অন্য কেউ ন্যাকা সেজে জিজ্ঞেস করত, 'কেন?'

'ওকে কেন বিয়ে করবে ?'

'কেন বিয়ে করবে না বল ? ভাল ছাত্র, ইন্‌জিনীয়ার হয়ে বেরোলে তখন মেয়ের বাপ-মা হুমড়ি খেয়ে পড়বে।'

'হ্যাঁ তা পড়বে। কিন্তু বিয়ে করবে তো বাপ-মার মেয়ে।'

'তা অবশ্য ঠিক। তা হলে সেরকম মেয়েই পাবে। পচা কাঁঠালের ঘোয়ো খদ্দের।'

'তা হলে ও সুন্দরী মেয়ে পাবে না ?'

'পাবে। তবে ঘুষ দিতে হবে। মেয়ের মাকে জড়োয়া সেট। বাপকে নিদেনপক্ষে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কার। অন্তত সেরকম সখ তার থাকবে। আর শালাকে ফরেন পাঠানোর প্যাসেজ মানি।'

আর একজন তখন ভদ্রভাবে উপদেশ দেয়, 'তা হলে তো তোর মোটা টাকার ধাক্কা। তুই এক কাজ করিস, চাকরি পেয়েই টাকা জমাতে শুরু করবি। যেন সামনেই তোর মেয়ের বিয়ে।'

এই রকম অবস্থায় সে শুধু হাসত। বরং রাগলেই বিপদ হত। ওরা দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে যেত।

পরে তার বন্ধু-বান্ধবরা সবিস্ময়ে দেখলে, সে রুচির সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে এবং অতঃপর বিবাহ।

সে যাই হোক, তার বর্ণ-কৌলিণ্য অর্থোন্নতি ও সুন্দরী বউ প্রাপ্তিতে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। আজ ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে এই নামী কোম্পানির সেলস ম্যানেজার। মিস্টার সরখেল যেমন দ্রুত এসেছিলেন তেমনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলেন। দ্রুত হাঁটাচলা তার বৈশিষ্ট্য।

চেম্বারে ঢুকে বললেন, 'আপনারা বসুন।' নিজেও বসলেন। ব্রিফ কেসটা টেবিলের একপাশে সরিয়ে দিয়ে সবাইকে এক লহমায় দেখে নিলেন। পরে বললেন, 'বলুন আপনারা। একে একে বলুন।'

মুখোমুখি বসা ভদ্রলোকই প্রথমে বলতে শুরু করলেন, 'মিস্টার সরখেল, আমার অর্ডার গত এইটটি থ্রির মার্চে প্লেস করেছিলাম। এবং এটা আর্জেন্ট অর্ডার ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন রেসপন্স পাচ্ছি না। আমার বড্ড—'

হ্যাঁ, এই কারণেই আজ আপনাদের আমি আসতে বলেছি। যদিও আমার হাতে সময় খুব কম। আজ রাতের ফ্লাইটে দিল্লি যেতে হচ্ছে একটা গ্লোবাল টেণ্ডারের ব্যাপারে।'

পেছন থেকে একজন বলল, 'কিন্তু আমাদের—'

'সে জন্যই তো আপনাদের আমি ডেকেছি। খোলাখুলি আলোচনার জন্য। আপনারা আমাদের মাল যথা শীঘ্রই পাবেন। অন্তত চেষ্টা করব। আমাদের ওয়ার্কস থেকে খবর পাচ্ছি, সেখানে একটু ট্রাবল চলছে। আর পাওয়ারের যে কি অবস্থা তা তো আপনারা জানেন।' বলে মিস্টার সরখেল উঠে দাঁড়ালেন, 'এক মিনিট আসছি।'

চেম্বারের বাইরে এসেই তার পি, এ,-কে ডাকলেন, 'সুমন্ত!'

'ইয়েস স্যার।' সুমন্ত কাছে এসে দাঁড়াল।

'এজেন্টরা সব এসেছে। চাপ দিচ্ছে। ওয়ার্কসে ওয়ার্ক লোড প্রচণ্ড। অন্তত সেরকমই খবর পাছি। ওদেরও তো ইয়ার এণ্ডিং এসে গেছে। বিজনেস বেশী করতে হবে। সে যাক। ওদের বোঝাবার চেষ্টা করছি। তুমি এক ফাকে এসে দেখে আমায় বলবে, আলোচনার সময় আমাকে কোন আফ্‌রিকান কান্টির প্রেসিডেণ্টের মত দেখায় কিনা।'

অভ্যস্ত সুমন্ত হেসে ফেলল।

'নো, হাসি নয়। যা বললাম।' বলে মিস্টার সরখেল চেম্বারে ঢুকে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমাদের জেনারেটর আছে। চারটে। বেশ পাওয়ারফুল জেনারেটর। কিন্তু তা দিয়েও পুরো ওয়ার্কস রান করানো যায় না। আপনাদের অনেকেরই স্পেশাল স্পেসিফিকেশনের অর্ডার, জেনারেল মাল নয়। একটু সময় তো দিতে হবে। আর—' টেলিফোনটা বেজে উঠতে কথা শেষ না করে রিসিভার তুলে নিয়ে বললেন, 'হাল্লো, সরখেল স্পিকিং।' আর ঠিক তখনই সুমন্ত চেম্বারে ঢুকে ঘরের একোণে একবার ও কোণে একবার দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখতে লাগল। মিস্টার সরখেল সুমন্তের দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'কেন আমি তো আসবার সময় সবকিছু ঠিক দেখে এলাম। ……আমি চলে আসার একটু পরেই?…

আমি এখুনি যাচ্ছি। তার আগে একটা কাজ কর, তুমি এখুনি ডক্টর মুখার্জিকে ফোন করে আসতে বল। ওঁর ফোন নাম্বার জানতো ?…আচ্ছা। আমি এখুনি যাচ্ছি। আর শোন, তুমি স্কুলে যেয়ো না… আচ্ছা।

মিস্টার সরখেল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি। আপনাদের সব কথা তো শুনলাম। যতটা পারি একটা ব্যবস্থা করব। আর সুমন্ত ?'

সুমন্ত তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়াল।

'আমার ফ্লাইট বুক্‌ড হয়েছে ?'

'আজ্ঞে।'

'আমি তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করব। জানি না কী হবে। আর যা বলছিলাম—'

'না স্যার, ভালই লাগছিল দেখতে।' নীচু গলায় সুমন্ত বলল।

'আমড়াগাছি কর না পাঁচু। বলে ব্রিফ কেসটা নিয়ে মিস্টার সরখেল দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। এবং নীচে নেমেই সোফারকে বললেন, সিঁথি।'

সোফার অবাক হয়ে তাকাল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, দমদম সিঁথি। একটু তাড়াতাড়ি যাবে।'

মিস্টার সরখেল এইভেবে অবাক হচ্ছিলেন বার বার, কী হতে পারে রুচির ? এক সঙ্গেই তো তারা ব্রেকফাস্ট সারলেন। গপ্‌ গপ্‌ করে গোটা দুই পোচ্‌ টোস্ট চীজ্‌ আর সবকিছুই বেশ নির্বিকারভাবে। আর তিনি তখন কড়া টোস্টে নামমাত্র মাখন লাগিয়ে গরুর মত জাবর কাটছিলেন। কারণ, তার নাকি কোন কিছু খাওয়ার উপায় নেই। তাহলে কোলেস্টেরোল বেড়ে যাবে। ডাক্তারদের নির্দেশ, কেবল ডায়েট কনট্রোল কর। ওটা খেওনা, সেটা খেওনা। তবে খাবটা কি, ঘোড়ার— খাওয়াও চলবে ওষুধের ব্যবস্থা থাকবে, তবে না চিকিৎসা ? যত সব পাঁচু ! মিস্টার সরখেলের মেজাজটা ক্রমশ খিঁচড়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ ভাবলেন, এখন খেলে কেমন হয়। একটু খিদে খিদে যেন বোধ করছেন। অবশ্য লানচের সময় এখনো হয়নি। তবু খেলে ক্ষতি কি ? এক ডিশ চিলি চিকেন আর একটা বড় পেগ। হোটেলের দিকে গাড়ি ঘোরাতে বলবেন কিনা, ভাবলেন

একবার। তারপরই ঠিক করলেন না। এখন এসব ঠিক নয়। তার যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি পৌঁছান দরকার। কী হয়েছে রুচির, কে জানে। সকালে অবশ্য মুখখানা গম্ভীর ছিল। থাকবারই কথা। কাল রাতে একটু মন কষাকষি হয়েছিল। এগজিবিশনে কাল গিয়ে গরু ছাগল ভেড়ার চামড়ার কিসব জিনিস কিনে একগাদা টাকার শ্রাদ্ধ করে এসেছিল। তারপরই রাতে শুয়ে পুষির মত ফিস ফিস করে ভিডিও-র আব্দার জুড়ে দিল। চামড়ার একজিবিশনের আঘাতটা একটু নরম হয়ে এসেছিল, কিন্তু এবারে ফের দপ করে জ্বলে উঠল।

'অসম্ভব।'

'এখনই নয়, কয়েকদিন পরে কিনো।'

'পরে নয়।'

'সুমিতাদি কিনেছে।'

'তোমার সুমিতাদি কেবল সন্তানটাই বাপের বাড়ি থেকে আনতে পারেনি।'

'তার মানে?'

'জানি না।'

'জানতে হবে। এবার বলো, কি বলতে চাইছ।'

'কিছু না।'

'কিছু না মানে? তুমি এই বয়সে এসে ডাউরি যৌতুক চাইছ?'

'না।'

'না মানে? জানো তোমাকে আমি উদ্ধার করেছি।'

'জানি। কিন্তু তোমার রুচির প্রশংসা করতে পারি না।'

'তার মানে?'

'জানি না।'

এই সব কাল রাতে হয়েছে। চারিদিকে যা কাণ্ডকারখানা চলছে তাতে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। অঘটন ঘটলে কেউ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না। বউটউ হলে তো কথাই নেই। মিস্টার সরখেল মনে মনে ভীষণ উদ্বেগ বোধ করেন। সচেতন হতেই দেখেন, তিনি তাঁর গন্তব্য স্থানের

কাছেই প্রায় এসে গেছেন।—'হ্যাঁ, পাণ্ডে, ঐ সাদা বাড়িটার কাছে দাঁড় করাও।'

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই মিস্টার সরখেল সেলুনের দরজা খুলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে নেমে এলেন। গ্রিল গেট পেরিয়ে দ্রুত ক'পা এগিয়ে তারপর ক'ধাপ সিঁড়ি তরতর করে উঠে এসেই দরজার কলিং বেলটা টিপে ধরলেন। আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এসব ব্যাপারে সাক্ষীটাক্ষী থাকা ভাল।

'কে?' ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর।

কিন্তু মিস্টার সরখেল একটু ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে বেল টিপতেই থাকলেন। ভেতরে যেন পাগলা ঘন্টি বাজছে।

বিরক্ত মুখে দরজা খুলে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। তারপর একটু অবাক হওয়ার হাসি হেসে মেয়েটি বলল, 'আরে পিসেমশাই! আসুন, ভেতরে আসুন।'

'না না তাড়া আছে। তোমার বাবা বা কাকা কেউ আছেন বাড়িতে?'

'না তো। বাবা সাইটে গেছেন, আর কাকা অফিসে।'

একটু ভেবে নিয়ে মিস্টার সরখেল জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ঠাকুরমা?'

'ঠাম্মা ওপরে।'

'চল।' বলে মিস্টার সরখেল দোতলার সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলেন।

উপরে উঠেই মিস্টার সরখেল ডক্টর মুখার্জির সঙ্গে মুখোমুখি হলেন।

'আপনার এত দেরী হল? আমি এসে তো শুনলাম, আপনি অনেক আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছেন।'

'একটু সিঁথি হয়ে আসতে হল। আপনি ভেতরে যান মা।' মিস্টার সরখেল শাশুড়ীর দিকে তাকালেন।

শাশুড়ী ভেতরে যেতে ডক্টর মুখার্জি জিগ্যেস করলেন, 'উনি কে?'

'মাদার-ইন-ল। যা দিন কাল, বলা তো কিছু যায় না। সাক্ষীটাক্ষী থাকা ভাল। কিছু হলেই নন্ বেলেবল। একেবারে হাজত।

ডক্টর মুখার্জি হাসলেন।

'আচ্ছা ওর কি হয়েছে?'

'তেমন কিছুই না। অল্পক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। আপওয়াড´ উইণ্ড ডায়াফারমে একটু চাপ দিয়েছিল।'

'কেন? হঠাৎ'

'খাওয়া-দাওয়ায় একটু অনিয়ম করে ফেলেছিলেন।'

'হ্যাঁ, কাল লেদার এগজিবিশনে গিয়েছিল।'

'শুনলাম। ওখানে গিয়ে ঘুগনি ভেলপুরীটুরী খেয়েছিলেন।'

'ওকে ডায়েট কনট্রোল করতে বলেছেন তো?'

'না না, তার দরকার নেই। এক-আধদিন একটু রেসট্রিকশনে থাকলেই হবে।'

মিস্টার সরখেলের মুখখানা ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে এল। মনে মনে বলতে লাগলেন, আর আমার বেলায় শুকনো টোস্ট। নো চীজ, নাথিং এলস, কেবল ডবল টোনড মিল্ক। তুমি আবার বড় ডাক্তার? পাঁচু।

'বাই।'

'বাই।'

ডক্টর মুখার্জি বেরিয়ে গেলেন।

'হ্যাল্লো, কে সুমন্ত? আমার ফ্লাইটের কি হল?...আচ্ছা আচ্ছা। আমি একটু বাদেই অফিসে যাচ্ছি। আর শোন, তোমার শ্বশুরবাড়ি তোমার বাড়ি থেকে কতদূর?......সে কি অত দূরে থাকা তো ঠিক নয়। এটা আনওয়াইজ ব্যাপার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি বাড়ি শিফট কর। দিনকাল খুব খারাপ। কখন কি যে ঘটে যায়!' মিস্টার সরখেল ক্রেডেলের ওপর আস্তে করে রিসিভার রাখতে রাখতে বললেন, যত সব!

এ ঘরে ঢুকেই সুহাসের কেন জানি মনে হল, আজ দিনটা তার ভাল যাবে না। বাবা ডাক্তারির ব্যাগ গুছিয়ে-টুছিয়ে টেবিলের একটার পর একটা ড্রয়ার টেনে টেনে কি যেন খুঁজছেন। যতই তাঁর কাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটছে, ততই মুখ ক্রমশ গম্ভীর হয়ে আসছে। এক সময় খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে ড্রয়ারগুলো ঠেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। একটু সময় কি যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেন। মা জপ-আহ্নিক করছিলেন আর আড়চোখে সব লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। শেষে বললেন, 'পেলে?'

'না।'

'কি হারিয়েছে?'

'একটা কাগজ। পেয়েছ? এক টুকরো রংচঙে ছোট্ট কাগজ।'

'না বাপু। দ্যাখগে তোমার ডাক্তারখানায় পেয়ে যাবে।'

'মনে হয়।' বলে বাবা চিন্তিতভাবে ব্যাগে হাত রাখলেন।

'যাবার আগে দশটা টাকা রেখে যেও।'

'কেন?' বাবা ভ্রূ কোঁচকালেন।

'দরকার আছে।'

'তোমার তো সব সময়েই দরকার হচ্ছে। কি দরকার?'

'হিসেব দিতে হবে নাকি?'

মার জপ-আহ্নিক আপাতত বন্ধ। জপের মালা ক্রমশ শক্ত হাতে চুলের মুঠি যেমন ধরে তেমনি ধরেছেন। মার উত্তোরত্তর ক্রোধের সঞ্চার হচ্ছে দেখে সুহাস শঙ্কিত হল। আর এখানে নয়, ঘটনা মনে হয় অনেকদূর গড়াবে। সে বরাবর লক্ষ্য করেছে, এ বাড়ির যেখানেই যা কিছু ঘটুক না কেন, কখন যে সে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে পড়ে। তারপরই যা হয়, পড়ে পড়ে মার খাওয়া। এটা যেন তার অনিবার্য ঘটনা! ললাট লিখন। সে

আস্তে আস্তে বাইরের ঘরের দিকে চলে এল। যাবার সময় দেখতে পেল, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সুরজিৎ। সঙ্গে সঙ্গে সুহাসের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, মা বাবার কাছে হঠাৎ কেন দশ টাকা চাইলেন। আদরের নাতির যে খুব প্রয়োজন !

সুহাস কোন কথা না বলে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে এল। আকাশে থমথমে মেঘ। ভ্যাপসা গরম। একটুও হাওয়া নেই। জামা-প্যান্ট ঘামে জবজব করছে। বড্ড অস্বস্তিকর। অথচ কাল সারারাত টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়েছে। সে ভেবে পায় না এখানে এত বৃষ্টি হওয়ার কি প্রয়োজন। এখানে ওখানে শুধু জল জমে আছে। কোন কাজে আসেও না। গত ক' বছরের অনাবৃষ্টিতেও এখানকার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। চাষ আবাদ হবে তো গাঁয়ে। সেখানে হলেই তো হয়। অবশ্য তার ছেলেবেলায়—এখনো সে স্পষ্ট মনে করতে পারে, আশেপাশে অনেক জায়গায় চাষ হত। এখন সে সব জায়গায় বড় বড় বাড়ি উঠে গেছে। চেনবার উপায় নেই কোন। এখন ব্যাঙ্কপাড়া যেখানে, সেখানে কত ফুটবল ক্রিকেট খেলেছে তারা। এই বছর দশেক আগেও। এখানকার পশ' এরিয়া বলতে এখন ঐ জায়গাটাকেই বোঝায়। সবই কেমন দ্রুত বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে না কেবল তার অবস্থা। পাক্কা ছ'বছর ধরে বেকার। অবশ্য সরকারী চাকরি পাওয়ার বয়স এখনো চার বছর আছে। ইদানিং সরকার বাড়িয়েছে বলেই তাই। আচ্ছা, বয়স বাড়িয়ে বাড়িয়ে যদি সাতান্ন বছর করে, তাহলেও কি তার চাকরি পাবার কোন সম্ভাবনা আছে? মনে মনে হাসল সুহাস। কনফার্মড বেকার। তবু হাল ছাড়ার উপায় নেই। সব জায়গায় আবেদন করে যেতেই হবে। প্রত্যেকবারের জন্য ফর্ম, খাম, ডাকটিকিট, পোস্টাল অর্ডার কিনতে হবেই। একগাদা টাকা। তার জন্য বাবা-মা'র কাছে এই বয়সে হাত পাতা যায় না। লজ্জা করে। অতএব কিছু উপার্জন করতেই হবে। তার জন্যই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র-ছাত্রী তালিম দিতে হয়। সপ্তাহে তিন দিন করে সকালে এক, রাতে দুই। মোট তিন দুগুণে ছয়। রবিবার বাদে তার হাতে আর কোন সময় নেই। এত করে হাতে আসে তার চারশ' সাড়ে চারশ'র মত। কিন্তু এই কি তার ভবিষ্যৎ?

আর ভবিষ্যৎ! ভাবতে ভাবতে সুহাস সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখল। বাইকে উঠতে গিয়ে তার নজরে পড়ল, পেছনের চাকায় হাওয়া নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট গালাগাল বেরিয়ে এল। গতকাল দুটো চাকায় কুড়ি পয়সা দিয়ে হাওয়া দিয়েছে। আজ আর নেই। তার মানে আরো কিছু গচ্চা। যদি টিউবে লিক হয়ে থাকে তবে তো কথাই নেই। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল একবার, সাইকেলটা বাড়িতে রেখে আসবে কিনা। কি লাভ? কাল সকালেই তো ছাত্র ঠেঙাতে দরকার হবে এটা। না হলে বাড়ি বাড়ি হেঁটে ঘোরা অসম্ভব। সে সাইকেল ঠেলে ঠেলে বাজারের দিকে এগোতে লাগল।

সুহাস গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে উঠল। মন তার ক্রমশ বিরক্তিতে ভরে উঠেছে। অবশ্য কাল বিকেল থেকেই মনটা বিশেষ ভাল নেই। ছন্দার সঙ্গে এবার সম্পর্ক চুকোতে হবে। তাই যদি হয়, তবে এটা নিয়ে হবে তার পঞ্চম বিচ্ছেদ। সে বারবার লক্ষ্য করছে, সে যে কটি মেয়ের সঙ্গে ভাবসাব করে প্রেমের উদ্যোগ পর্বে যখনই পৌঁছেছে, অমনি তাদের হয় বিয়ে হয়ে গেছে না হয় চাকরি পেয়েছে। যারা চাকরি পায় তারা বেটার লাইফের স্বপ্ন দেখে। ছন্দা অবশ্য এখনো চাকরি পায়নি। কিন্তু পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনায় সুর পাল্টাতে শুরু করেছে। কথায় কথায় কালই এক সময় বলছিল, 'এখন ভালয় ভালয় চাকরিটা পেয়ে গেলে হয়।'

'পেলে কি হবে?'

'কি আর হবে, চাকরি করব।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি?'

'বিয়ে করবি না?'

'করব।'

'কাকে?'

'তার এখন কি। দেখেশুনে পরে ঠিক করব।'

'কোন চাকরিওয়ালাকে তো?'

'তবে কি বেকার কে?'

'কেন নয়!' ছেলেরা তো বেকার মেয়েই বিয়ে করে।'

'চাকরি করা মেয়ে বিশেষ পায় না বলে। তবে তোকে আমি পেট ভরে খাওয়াব।'

সুহাস এ কথার কোন জবাব দেয়নি বটে, তবে মনে মনে গজর গজর করেছিল। তারপর আর বিশেষ কথা হয়নি। সে ততক্ষণে বুঝতে পেরেছিল, এই প্রেম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এরপর কিছু কড়া কথার বিনিময় হয়েছে। সুহাস জানে, ওর সঙ্গে এরপর আর বিশেষ দেখাশুনো হবে না। শুধু শুধু গদ গদ হয়ে একগাদা অনর্থক কথা বলে লাভ কি। শেষ সময়ে অবশ্য সে একটু হেসে শুভেচ্ছা জানিয়ে এসেছিল।

তাই ভাবছিল সুহাস, আর কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমট্রেম করবে না। সে লক্ষ্য করছে, তাতে ওদের ভাগ্য আশ্চর্য রকম খুলে যায়। সে অনেকটা ক্যাটালিটিক এজেন্টের মত। সে কিন্তু যেমনকার তেমনই থাকে। ভাগ্যটা তার নেহাতই খারাপ। না হলে সে দ্বাদশতম সন্তান হবে কেন। সব অর্থে মা-বাবার পড়ন্তবেলার সন্তান। তাঁদের ভাগ্যের শেষ তলানিতে এসে তার জন্ম। বাবার প্র্যাকটিস তখন ধীরে ধীরে কমে আসছে। আগে ডাক্তার বলতেই বোঝাত কুশারী ডাক্তার। এল এম এফ পাশ। এখন তো অনেক বড় বড় ডাক্তার এসেছে। তাদের এখনও প্র্যাকটিস জমেনি। তারপর ই এস আই দৌলতে সেই সব ডাক্তাররা আস্তে আস্তে ভাগ্য ফেরাতে লাগল। আর বাবা অহমিকায় ই এস আই স্কিম নিলেন না। কেননা তাঁর যে ভীষণ প্র্যাকটিস। সময়ের চাকা ওল্টায়। এখন তিনি বসে বসে মাছি মারেন। সকাল বিকাল যত সব বৃদ্ধরা বসে বসে তাঁর সঙ্গে আড্ডা দেয়। তাতে বাবার কিছু হয় কিনা, সুহাস জানে না। তবে তিনি সদানন্দের দোকান থেকে নিয়মিত লটারির টিকিট কেনেন। কিন্তু কেন যে কেনেন কে জানে! এখন তাঁর এত কি অর্থের প্রয়োজন! দরকার তো সুহাসের। একটা ভালমত বাঁধাতে পারলে সব ব্যাপারটা একবার দেখে নিতো!

সুহাস হাঁটতে হাঁটতে বাজারের কাছে নিকুঞ্জের সাইকেল দোকানের কাছে এসে দাঁড়াল। রবিবারের বাজার। চারিদিকে লোক গিশ্‌গিশ্‌

করছে। বাস আর লরির ডিজেলের ধোঁয়া, সাইকেল রিক্সার প্যাঁক প্যাঁক তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল। অথচ তার আড্ডার জন্যই এটা। কোনদিন এরকম মনে হয়নি। কিন্তু আজ তার এসব কিছুই ভাল লাগছে না। রাস্তার ওপারেই সদানন্দের দোকান। সুহাস ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। সদানন্দ আনন্দেই বসে আছে তার স্কুলজীবনের বন্ধু সদানন্দ। ছোটবেলায় অসম্ভব ডাংপিটে ছিল। লেখাপড়াও বিশেষ এগোয়নি। এখন একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। সুহাস নিকুঞ্জের দোকানে সাইকেল দিয়ে রাস্তা পার হয়ে সদানন্দের দোকানে এল।

'কিরে আজকের খবর কি?'

'দারুণ দারুণ। আয় ভেতরে আয়।'

'সুহাস দোকানের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'কি দারুণ খবর রে?'

'আজ লটারির রেজাল্ট বেরিয়েছে।'

'আমি সকালেই দেখেছি। টাকা দশটা জলে গেল।'

'জলে বলিস না। লাক ট্রাই তো করতে হবে।'

'এই বলে বলেই তো তুই সবাইকে টুপি পরিয়ে যাচ্ছিস। দেখুন, আপনার ভাল সময় এসে গেছে। কিছুদিন টিকিটটা কেটেই জান না।'

'সদানন্দ হাসতে লাগল। বলল, 'না কাটলে কি পাওয়া যায়? দেখ না, তিন তিনটে টিকিট আমার এখান থেকে লেগেছে। বোর্ড লিখতে দিয়েছি। এলেই ঝুলিয়ে দেব।'

'কত টাকার?'

'পঞ্চাশ টাকার দুটো আর দশ টাকার একটা।'

'উল্লুক। এতেই আবার বোর্ড ঝোলাচ্ছিস?'

সদানন্দ হেসে ফেলল। বলল, 'পাবলিসিটি।' এরপর আর কোন কথা এগোল না। কিছু ভাগ্যান্বেষী এসে গেল। দেখতে দেখতে বেশ একটু ভিড় জমে উঠল। সদানন্দ দ্রুত টিকিট ছিঁড়ে ছিঁড়ে খামে ভর্তি করে দিতে লাগল। সুহাস উদাসভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, বাবা ছাব্বিশ ইঞ্চি সাইকেল চেপে সবার মাথা

ছাপিয়ে ডিসপেনসারির দিকে যাচ্ছেন। প্রতিদিনের সব আড্ডাধারীরা এতক্ষণে জুটে গিয়ে হয়তো কাছে-পিঠে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে তাঁর অপেক্ষায়। তার মানে মার সঙ্গে আজ বাবার ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে গেছে। সুহাস নিজেকে এই মুহূর্তে যথেষ্ট ভাগ্যবান বলে মনে হল। অন্তত সেই সময় তাকে বাড়িতে থাকতে হয়নি।

'দুটো পেয়েছে মোহনপুরে আর একটা নতুন পাড়ায়, বুঝলি।' সদানন্দ কথাটা বলল বটে, কিন্তু ওদিকে হাত সমানে চলছে!

'কি করে জানলি?' সুহাস একটু চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তিন জনেই আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে।'

'ও'। সুহাস আলগোছে বলল।

'ওদের আমি পরে আসতে বলেছি। কাল ওদের আমি এখান থেকেই পেমেন্ট করে দেব।'

কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'আজকের খেলায় লেগেছে নাকি?'

'হ্যাঁ, গতকালের র‍্যাফেলের খেলায় তিনখানা বেঁধেছে। আমার এখান থেকে।' কিছুটা উচ্চকণ্ঠে সহাস্যে গর্বের সঙ্গে বলল সদানন্দ।

সুহাসের মনে পড়ল, এই সদানন্দ প্রথম লটারির ব্যবসা শুরু করেছিল কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ নিয়ে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জোরজার আদর আব্দার করে টিকিট গছাত। এখন তো মনে হচ্ছে, বেশ গুছিয়ে বসেছে। আর সে এখনো—এই পাঁচ বছর ধরে—বি এ পাশ করার পর থেকেই চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি হল? একটা ব্যবসা করলে কেমন হত? কিন্তু সে কি ব্যবসা করবে? লটারিতে একটা ভাল রকম টিকিট বাঁধলে তো হত।

'বুঝলি, তোদের ঐদিকটায় একটা জমি দেখে এসেছি।' সদানন্দ বলল।

সুহাস চমকে উঠল। দেখল, দোকান কখন আবার ফাঁকা হয়ে গেছে। বলল 'ফাঁকা?'

'এরকমই হয়। কখনো কখনো একজন কি দুজন। কখনো আবার ভিড় করে আসে। তারপরই আবার ফাঁকা।"

'ভিড় বাড়লে বুঝি শুনিয়ে দিস কটা টিকিট লাগল ?'

সদানন্দ হাসতে লাগল। বলল, 'ঐ তো বললাম—পাবলিসিটি। শুনলে পরে খদ্দেরের মনে আস্থা আসে।"

'তোদের ওদিকে একটা প্লট দেখেছি। কিনব।'

'কত করে কাঠা ?'

'পনের হাজার।'

সুহাস হাসতে হাসতে বলল, লটারি পাচ্ছিস তো তুই।'

আবার খদ্দের ঢুকতে চুপ করে গেল ওরা। সুহাস ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় পৌণে বারটা। এ বেলাটা কোন কাজের কাজ হল না। ও বেলায় একটা সিনেমা দেখতে হবে। এখন আর মারদাঙ্গা হিন্দি ছবি দেখতে ভাল লাগে না। প্যানপেনে বাংলা বইও অসহ্য। ইংরাজী বই বড় একটা আসে না। তবু যা হোক একটা ছবি দেখতে হবে। আজ রবিবার। বাড়ি ভর্তি লোক। বাবা রবিবার আবার একবেলা ডাক্তার-খানা বন্ধ রাখে। কি করা যায়। সুহাস উঠে দাঁড়াল। 'চলি সদা।'

'আয়।' বলে হাসল সদানন্দ।

সুহাস চেয়ার সরিয়ে দোকানের বাইরে বেরিয়ে এলো। চারিদিকে একবার তাকাল। রাস্তায় লোকজন অনেক পাতলা হয়ে এসেছে। আকাশ এখনো থমথমে। মেঘের ভারে আকাশ যেন নিচে নেমে আসতে চাইছে। একদম হাওয়া নেই। সুহাস ধীরে ধীরে রাস্তা পেরিয়ে নিকুঞ্জের সাইকেলের দোকানের দিকে এগোতে লাগল।

বারান্দায় সাইকেল ওঠাতে বাবার উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সুহাস একটু দাঁড়াল। একবার ভাবল, আবার বেরিয়ে যাবে কিনা। ঘড়ির দিকে দিকে তাকাল। প্রায় পৌণে একটা। নাঃ, এখন বেরিয়ে যাবার কোন মানে হয় না। কি এমন ঘটল যে বাবা ডিসপেনসারি থেকে ফিরে এসেই এত গরম হয়ে উঠলেন। সে গুটি গুটি মায়ের ঘরের দিকে এগোল। ঘরে

ঢুকেই দেখল, বাবা সকালের মত টেবিলের ড্রয়ারগুলো হাতড়াচ্ছেন। আর মা কোমরে হাত দিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে।

'তোমার ডাক্তারখানায় ভাল করে দেখেছিলে তো?'

'কতবার বলব।'

'কি হারিয়েছে তা তো স্পষ্ট করে বলছ না।"

"কত আর স্পষ্ট করে বলব? একটা লটারির টিকিট। আজ ফল বেরিয়েছে।" তাঁর হাত সমানে খুঁজে চলেছে। মুখ-চোখ অনেকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত। লম্বা সাদা চুলগুলো পাখার হাওয়ায় উড়ছে। যেন রূপোর ঝালর। মুখের রং টকটক করছে। ঈপ্সিত বস্তু তাঁর চা-ই চাই। সুহাসের এই মুহূর্তে মনে হল, বাবা যেন কিং রিচার্ড দ্য থার্ড। মুখ চোখের অভিব্যক্তিতে মনে হচ্ছে, এ টিকেট। এ টিকেট। মাই প্রসপারিটি ফর এ টিকেট!...

'ও, এর জন্য সকাল থেকে এত লঙ্কা কাণ্ড? তাতে হয়েছেটা কি। তোমার কপালে ঐ ছাই জুটবে নাকি?'

সুহাস বুঝতে পারল, মা এতক্ষণে তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ফিরে পাচ্ছেন। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে এল। টেবিল থেকে র‍্যাফেলের টিকিটটা নিয়ে মার ঘরে ফিরে এল। বাবার দিকে টিকিট এগিয়ে দিয়ে অক্লেশে বলল, 'এটা আমি বসবার ঘরে পেয়েছি।'

ডাক্তার কুশারী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে টিকিটটা নিলেন। ইতিমধ্যে মেজবৌদি কখন যে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে সুহাস লক্ষ্য করেনি। সে-ও একটা টিকিট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন তো এটা কিনা। আমি পেয়েছি।'

মা অবাক হয়ে সবার দিকে তাকাতে লাগলেন। কিছু একটা যেন বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে বড় বৌদিও এঘরে এসে ঢুকল। পেছনে সুরজিৎ। সবাইকে থমকে থাকতে দেখে কিছুটা অবাক হল। তারপর একটা টিকিট মার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার বড় ছেলে পাঠিয়ে দিল।'

সকলে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে।

'রাঙাবৌ ন'বো এখনো এল না?' মা গম্ভীর স্বরে যেন গোটা ঘরকে জিজ্ঞেস করলেন। 'হ্যাঁ, রে সুহাস, এগুলোর দাম কত?'

'দশ টাকা করে।' সুহাস কিছুটা ভয়ে ভয়ে বলল।

"তার মানে ছটা। ষাট, যা-ট, টা-কা?' ঘরটা যেন নিঃশব্দে ডুবে আছে। শুধু পাখার সাঁই সাঁই শব্দ।

'বড় বৌমা?'

'আজ্ঞে।'

'দুদিন বাজার হবে না। বুঝলে ডাল আর ডালের বড়া।'

'বাচ্চাদের কী দোষ, মা?' বড় বৌদির ক্ষীণ প্রতিবাদ

না, যা বললাম ডাল আর ডালের বড়া। দু দিন। আরে বড় হলে ও গুলোও তো ওই হবে। আমড়া গাছে তো আর ল্যাংড়া হয় না॥

সে অতীন যেন নেই আর। বদলে যাচ্ছে। দিন দিনই বদলে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে সবাই,—মা বোন ভাই। এড়িয়ে চলে অতীনকে তারা—সংসারে থেকে যতটা পারে।

অতীনও বোঝে সব ঃ তার দিনকে দিন ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা, তাকে সবার এড়িয়ে চলা। কিন্তু বুঝেও তো কিছু করে উঠতে পারছে না। নিজেকে সংযত করবার জন্য যুক্তির সন্ধান করেছে ঃ সেই যুক্তিগুলিই যে কখন তাকে সমর্থন করছে, বুঝতে পারেনি। যখন পেরেছে তখন অন্তঃস্থল থেকে উত্থিত হয়ে অস্পষ্ট স্বরে একটি কথাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, এ আমার অন্যায়, স্বার্থপরতা।

এই অন্যায় ন্যায় হয়ে, স্বার্থপরতা স্বার্থত্যাগের রূপ নিয়ে দেখা দেয় রাতের অন্ধকারে। রাতটা অতীনের কাছে এখন দুর্বিসহ হৃদয়হীন ক্লান্তিজনক—অভিশাপের মতো। রাতটা এত কুৎসিত কেন, এতদীর্ঘ কেন। এ রকম সবার বেলা নাকি শুধু তার বেলা। সমস্ত কিছু কেমন যেন শূন্য শূন্য মনে হয় ঃ বস্তু জগতের সূক্ষ্ম স্থূল থেকে অনুভূতির প্রত্যেক তন্তু পর্যন্ত। শুধু কি শূন্য? না শূন্য নয়। শূন্য হলে কোন কিছুর ক্ষোভ থাকবার কথা নয়। যা নেই—কেবল শূন্য, তাকে নিয়ে কি ক্ষোভ করা যেতে পারে কখন, না করা যায়? যার বর্ণ নেই কোন বর্ণ বিশ্লেষণ করা যায় নাকি? ক্ষোভ হয়—থেকে না থাকায়, পেয়ে না পাওয়ায়! তার তো সবই আছে। কিন্তু রাতের এই নিঃসঙ্গ শয্যায় মনে হয়, তার কিছুই নেই।

কি না আছে তার। সব আছে। তিরিশ বসন্তে ঘেরা তার স্বাস্থ্যময় দীপ্ত যৌবন। লোকসমাজে শিক্ষিত বলে পরিচয় দেবার মতো

বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ছাড়পত্র। বেকারের গ্লানিময় জীবন ঘুচেছে আজ বেশ কয়েক বছর। তবু সে কেন পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না। সব কিছু উপাদান

থাকা সত্ত্বেও কেন ধূসরময় মরুভূমির মতো নীলিমার স্নেহ কোমল আশা-ভরা আসমানের দিকে চেয়ে আপন হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে মেঘমল্লারের সুর পৌঁছে দিচ্ছে নিষ্ফলের মতো। কোন দিন কি ওয়েসিস্ জন্ম নেবেনা। শুধু নিষ্ফল আকুতির নৈবেদ্যই সাজিয়ে যাবে?

সে কোন আদর্শ দিয়ে জীবনকে বাঁধতে চায় না। সাধারণ মানুষের মতোই বেঁচে থাকতে চায়। একেবারে সাধারণ মানুষের মতো: আর পাঁচটা লোক যেমন রয়েছে। কিন্তু তাও বা কৈ পারল আজ পর্যন্ত। না পারবার মুলে কি তার অক্ষমতা, না অন্য কিছু। অক্ষমতাই হয়তো। না, তা নয়। তা হলে অনেক—অনেককে এই ভাবনায় নিয়ন্ত্রিত হতে হতো। নিষ্ফল গাছে ভরে যেত সবচেয়ে বেশী এ সমাজ-মাটি। তা ছাড়া এও তো দেখছে চারিদিকে সে, তার সঙ্গে তুলনা চলেনা এমন লোকও তার আকাঙ্ক্ষিত জীবনযাপন করছে!

তবে আর কি হতে পারে; তার বর্তমান সাংসারিক অবস্থা? হ্যাঁ তার সংসার! কিন্তু তার জন্য কি সে দায়ী না তার বাবা? যদি তাই হয় তবে কেন সে তাঁর অপরাধের দায় ভাগী হবে। না কি যাতা আজকাল ভাবছে সে। নেহাৎ স্বার্থপরের মতো, আত্মসুখের জন্য।

নতুন দিনের নতুন আলোতে গত রাতের দেহমন বিষণ্ণতার সুরের রেশ একেবারে মুছিয়ে দিতে পারেনা,—কিছুটা থেকে যায়। অনেকটা কীর্তন গানের ধুয়োর মতো। অনেক কিছু গেয়ে—সারা দিন কাজের মধ্যে থেকে,—আবার সমে পড়া—একই মানসিকতার পটক্ষেপণ। কোন কোন দিন এই বিষণ্ণতার সুর ধীরে ধীরে উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে—উদারা, মুদারা, তারায়: একটা বোবা কান্নায় পেয়ে বসে সে রাতে। পরের দিন তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। সংযত রাখতে চেষ্টা করে নিজেকে অতীন। কিন্তু পারে না। তবু নিজের দৈনন্দিন কর্তব্য করে যায়: বাজার করা জল তুলে দেওয়া, চায়ের আসরে বসা।...চায়ের আসরটা এখনো আছে পর্যন্ত—কোন সজীবতা নেই আগের—মেশিনের মতো চলে আসছে। কোন কোন দিন বিগত দিনের ছিটেফোঁটা মধুরতার স্বাদ বয়ে আনে বটে; কিন্তু তার ভারসাম্য হয় এরকম একদিনে: সামান্য ভুলচুকে রুখে ওঠে অতীন। আর

তার যত রাগ যেন মঞ্জুলিকার ওপর। কেন যে এরকম হয় বুঝতে পারে না অতীন।—ওই বা কোন সুখে আছে। এক এক সময় ভাবে অতীন, আমার যত অন্তর্বেদনা, তার চেয়ে কি ওর কোন অংশে কম? ওকি পেয়েছে আজ পর্যন্ত বা ভবিষ্যতে পাবার আশা করে। কিছুই না। আগে হয়তো—হয়তো কেন, নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখতো নিশ্চয়। কিন্তু এখন দেখে আগামী দিনে তার বিগতশ্রী হয়ে ভাইদের সংসার-মরুভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে দিন গুজরান করা। হয়তো এখনো রাতে আঁধারে চোখের জলে বালি ভেজায়; কিন্তু একদিন দেখবে চোখের জল ফুরিয়ে গেছে। সমস্ত মরুভূমি হয়ে গেছে। কোথাও ছায়া নেই সেখানে; পড়বার সম্ভবনাও নেই। কেবল হাওয়া বইছে। তাতে উত্তাপ বালুকার উথাল পাথর …বোঝে বলেই কি সমমর্মিতা জানাতে রাগ হয়ে তা প্রকাশ পায়। না মার ওপর অভিমান রাগ হয়ে অভিব্যক্ত হয় মঞ্জুলিকার ওপর দিয়ে।—নাঃ ওকে কিছু বলবে না আর।

মঞ্জুলিকাও কোন কথা বলে না। নীরবে সব ঘাড় গুঁজে শুনে যায়। দোষ না হলেও তা স্খালন করবার চেষ্টা না করে মেনে নেয় অপরাধ বলে। তারপর, এক সময়—যখন অফিসে চলে যায় অতীন, মা'কে জড়িয়ে ধরে সে বলে, দাদা এমন কেন হয়ে যাচ্ছে মা! কথার সুর কেমন যেন কাঁপতে থাকে। মিথ্যা দোষারোপে অভিমানের বাষ্প পুঞ্জিত হতে থাকে। বিন্দু বিন্দু জমতে থাকে, যেমন জমে ওঠে ভোরের শিশির বিন্দু দুর্বার গায়ে গায়ে। সমবেদনার নাড়া পেলেই অন্তক্ষয়িত সমুদ্রের স্বাদমাখা মুক্তার ঢল গাল বেয়ে নেমে আসবে।

বিভাবতী চুপ করে থাকেন—কোন কথা বলে না। কিই বা বলবেন, সবই তো দেখতে পাচ্ছেন নিজের চোখে। অশান্তি কি তার কারো চেয়ে কম। অন্তর্জ্বালায় তিনিই কি পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছেন না নিশিদিন। একটা মাত্র তার মেয়ে। বয়েস কম হলোনা, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সুরাহা করতে পারলেন না। দু'ছেলে এখনো পড়ুয়া। একমাত্র রোজ-গেরে বড় ছেলে—অতীন। আয় তো ঐ, ডানে আনতে বায়ে কুলোয় না। অথচ বয়েস হতে চলল—। তিনি কি আর কিছু বোঝেন না: সব

বোঝেন। মাঝে মাঝে তাঁর সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। উঠবে না? তিনি নিজের চোখে দেখেছেন ঠিক সময় বিয়ে না হবার জন্য কত ছেলেমেয়ে কত কি হয়ে গেছে। দিন দিন যে রকমসকম দেখাচ্ছেন অতীন তাতে না না না······কেঁদে ফেলেন বুঝি বিভাবতী। আর মনে মনে সান্ত্বনা খোঁজেন, উনি বেঁচে থাকলে আজ সংসারের এ হালটা হতো না।

—তুমি এবার দাদার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

নীরবে মুখ তুলে চাইলেন মেয়ের দিকে বিভাবতী। তারপর বললেন, সংসারের কী হাল—

—তার জন্য কি ওকে বিয়ে দেবে না, রোজগের ছেলেকে আইবুড়ো করে রাখবে?

—আইবুড়ো তো শুধু ওই নয় মঞ্জু।

বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল কেন যেন মঞ্জুলিকার। এলো-ও, রোধ করতে পারল না। অন্যদিন হয়তো একটুকরো শীর্ণ হাসি ওষ্ঠপুটে মাখিয়ে বলত, আমার জন্য চিন্তা করোনা মা। আজ আর কিছু না বলে মাথা নিচু করে চলে এলো অন্য ঘরে। বিভাবতী স্থির দৃষ্টিতে মেয়ের চলে যাওয়ার ভঙ্গীটুকু দেখলেন। কেন জানি তাঁর বুক উথাল পাথাল করে কান্নার বেগ চাপতে লাগল।

পাঁচ জনের সংসার। তার ভেতর তিনজন তো সারাদিন বাইরে বাইরে। ঘরে সব সময় থাকবার মধ্যে বিভাবতী আর মঞ্জুলিকা। এরও মধ্যে যদি সর্বক্ষণ বিষাদের মেঘ পুঞ্জীভূত থাকে তবে বিভাবতী ঘরে থাকেন কি করে। স্কুল-কলেজ বাদে কেন যে ছেলে দুটো বাইরে বাইরে থাকে; বুঝতে কষ্ট হয় না বিভাবতীর। ওরা তো এখন আর ছোট্টটি নয়। সংসার মেশিনের কোন অংশ থেকে আর্তনাদ উঠছে তারা বিলক্ষণ বুঝতে পারে। হয়তো এর জন্য নিজেদের অপরাধী করছে। তাই চোরের মতো সব সময় নিজেদের লুকিয়ে রাখছে। মঞ্জুও হয়তো একদিন—না না না···তার চেয়ে অতীনের বিয়ে দেওয়াই ভাল। কিসে কি হয় তা তো আর বলা যায় না। ঐ একই রকম মায়নায় তো মণিময়ও গোটা দুই বাচ্ছা, কাচ্চা নিয়ে বেশ

সংসার চালাচ্ছে। সংসার তেমন অচল হলে অসিত-অমিতাকে কাজে ঢোকালেই হবে। বাঁচতে হবে তো। বাঁচলে পরে পড়া যাবে। আর এমনো তো হতে পারে, বলা তো আর যায় না, বিভাবতী আশ্বাস খোঁজেন,—বলেনা স্ত্রীভাগ্যে ধন : অতীনের হয়তো উন্নতি হতে পারে চাকরিতে।

ধীরে ধীরে এ ঘরে মেয়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন বিভাবতী। মঞ্জুলিকা জানলার গরাদে কপাল ঠেকিয়ে অন্যমনস্কে বাইরে—সামনের নিম গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিল। বিভাবতীর হাতের স্পর্শ কাঁধে অনুভব করতেই চমকে ফিরে তাকাল সে। প্রশ্নময় দৃষ্টি এগিয়ে দিল মঞ্জুলিকা তার মার দিকে।

—এবার অতীনের বিয়ে দেব।

মঞ্জুলিকা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিভাবতীর দিকে। কিছুক্ষণ নীরব দু'জনে। বিভাবতী কি বলবার জন্য দ্বিধা করতে লাগলেন। তারপর এক সময় অসহায়ের মতো বলে ফেললেন, কিন্তু মেয়ে কোথায়!

শুনে হেসে ফেলল মঞ্জুলিকা। বলল, তারজন্য ভেবো না তুমি। একটু থেমে বলল, শুধু দু-একজনকে বল।

বিভাবতী চুপ করে রইলেন। কি আর বলবেন। তা তিনি বেশ হাড়ে হাড়েই জানেন।

পাত্রীর সন্ধান চলছে। চুপে চুপে। শুধু অতীনকে বাদ দিয়ে। অতীনও যে কিছুটা আঁচ না করতে পেরেছে এমন নয়। মা-বোন-ভাইদের ফিস্‌ফাস মাঝে মাঝে কানে আসে। মন ভাল থাকলে হাসে না হলে দাঁতে দাঁত চাপে : ভণ্ডামি! তাকে প্রতারণা করা হচ্ছে; স্বার্থপর! সে বুঝতে পারে সব। তাকে না শোনাবার ভান করে শোনান। করুক করুক, আর কত ভণ্ডামি করবে!

অতীন স্নান সেরে ঘরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়াল। শুনল, অঞ্জুলিকা ফিস্‌ফিসিয়ে বলছে, অফিসে যাবার আগে ওর কাছ থেকে কয়েকটা টাকা

চেয়ে রেখো ; যাতায়াতে লাগবেই। তোমার কাছে তো একটি পয়সাও নেই।

—না। বিভাবতীর কণ্ঠস্বর। কিন্তু এ সময় চাওয়া কি ঠিক হবে : রাগারাগি না শুরু করে দেয়। তা ছাড়া মাসের শেষ, ওর হাতে টাকা-পয়সা আছে কিনা কে জানে।

—আজ যাবে বলে যে কথা দিয়েছ।

—আমি কি বলছি যাব না। বলছিলাম, এই অফিসে যাবার আগে যদি অনর্থক রাগারাগি করে অফিসে যায় ; এই জন্য। আজ শনিবার, তাড়াতাড়ি তো অফিস থেকে ফিরবে ; তখন চাইলেই হবে। যাব তো সেই বিকেলবেলা।

—দাদা তো আজকাল তেমন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে না।

—না হয় কালই যাব।

—আচ্ছা মা, দাদাকে খোলাখুলি বললেই হয় মেয়ে দেখতে যাব। লুকোচুরি কি আছে এতে।

—না না, এখুনি বলে কাজ নেই। দেখতে পাচ্ছিস না, আজকাল আমাদের কাউকে, কোন কথাই বিশ্বাস করে না। সবে তো এই প্রথম দেখতে যাচ্ছি ; কিনা কি হয় তার ঠিক নেই। তারপর কিছু না হলে রাগারাগী আর অবিশ্বাসের মাত্রা আরো বেড়ে যাক আর কি।

অতীন ঘরে ঢুকতে ওরা চুপ করে গেল।

খেতে বসে অতীন ভাবছিল, টাকা চাইলেই হয়। চাইলে কি আর আমি দিতাম না। সত্যি, না এ আরেকটা নতুন চাল। চমৎকার ; কত-রকম ফন্দিই না আঁটছে!

শনিবার। অফিস থেকে দেড়টায় বেরোল অতীন। ট্রাম স্টপে এসে দাঁড়িয়ে ভাবল অতীন। বাড়ি যাবে এখন, না অন্য আর কোথাও ঘুরবে। বাড়ি গিয়ে এখন কি করবে সে। চুপচাপ বসে থেকে চিত্ত বিক্ষিপ্ত করা।

বাড়ির কথা মনে হতেই আজ সকালের ঘটনা মনে পড়ে গেল : না না ও সব মিথ্যা—ধাপ্পা। যুগ যুগ ধরে বাড়ি বসে থাকলেও ওরা কখন টাকা চাইবে না ; কিন্তু চাইবার কথা শোনাবে।—না এখুনি ওখানে গিয়ে কাজ নেই। যেখানে চাপ চাপ নৈরাশ্য ভগ্নোৎসাহ আর স্বার্থপরতার জীবাণু জমাট বেঁধে রয়েছে দেওয়ালের সাদা প্রলেপের পরিবর্তে ; সেখানে মন কতক্ষণ আত্মস্থ থাকতে পারে। বিষাক্ত করে মনকে,—দেয় পঙ্গু করে। সেখানে আজকাল বেশী সময় থাকার অর্থ একই চিন্তার রোমন্থন করা : মানসিক তন্তুগুলিকে চড়া করে বেঁধে রাখা : শরীর খারাপ করা। তারচেয়ে কিছুক্ষণ ঘোরা মন্দ নয়। সিনেমায় যাবে কি? অনেক দিন ধরে কোন ছবি দেখছে না। রাজপথের জনস্রোতে গা এলিয়ে দিয়ে এগোতে লাগল অতীন। মেট্রোর লবিতে দাঁড়ায় এসে এক সময়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্টিল ফটোগ্রাফিগুলো দেখতে লাগল। তারপর একে একে এলিট, মিনার্ভা, লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার অনিশ্চিতভাবে ঘুরল। না আর ভাল লাগছে না তার। কোথায় যাওয়া যায় ; ভাবল অতীন।—মনিময়ের বাড়ি গেলে কেমন হয়ে। অনেক দিন ধরে দেখা-সাক্ষাৎ নেই তার মনির সঙ্গে। সময় কাটান যাবে বেশ। আর হাঁটা যায় না—পা ধরে গেছে।

বাঁধান উঠোন পেরিয়ে মনিময়ের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল অতীন। ভাবছিল ডাকবে কি না। ঘরের ভেতর তুমুল ঝগড়া চলেছে। দূর থেকেই শুনতে পেয়েছিল অতীন। ভাবছিল অন্য ঘরে। ভাড়াটে তো মনিময়রা একা নয়—অনেকগুলি। এক কথায়, বস্তির ভদ্র সংস্করণ। তবে খোলার ঘর নয়—পাকা বাড়ি। পাঁচ গৃহস্থের এক কল এক পায়খানা। এর চেয়ে তারা কিছু ভাল আছে : সেখানকার অনেক দিনের ভাড়াটে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অতীন। একবার তাকাল চারিদিকে,—না কেউ চেয়ে নেই। এটা হয়তো প্রতি ঘরের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অতীন এলোমেলো শুনতে পেল, ভেতর থেকে মেয়ে কণ্ঠ বলছে,···তখন তাদের ভাবা উচিত ছিল···বছরে তিন টাকা ইনক্রিমেন্ট···আর এদিকে···একটি ছেলে।

—জন্ম দাও কেন।

—তখন খেয়াল থাকে না।···আর রাগীও না। বছর বছর সয়ে আসছি।···আমার তো মোটে দুটি ছেলে, কত লোকের তো এরও বেশী—

—সাম্যর্থও তাদের বেশী।

—দুটিও যাদের সামর্থের বাইরে, তারা কি বিয়ে করে শুধু······

—বিনু!

—থাক আর, আদরে কাজ নেই······

অতীনের কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছিল। টলছিল বুঝি পা দুটো, সব যেন একাকার মনে হচ্ছিল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ।

—আমার আত্মহত্যাই করতে হবে শেষ পর্যন্ত! মনিময় বলল।

—বালাই ষাট, তুমি কেন?

আবার একটানা কথা বলতে শুনে কিছু মনে ধরে রাখতে পারে না অতীন। তারপর এক সময় মনে হলো, সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঝড়ের পর যেমনটা হয় চারিদিক। কিন্তু হঠাৎ—কিছু পরে হঠাৎ এক শিশুকণ্ঠ কেঁদে উঠল। কয়েক সেকেণ্ড বাদে শুনতে পেল ধুপধাপ শব্দ হতে ছেলেটা গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল।

—মর, মর, মরে যা সব।

—বিনতা! তারস্বরে চীৎকার করে উঠল মনিময়—

অতীন যে কিছু বুঝতে পারছিল না, তা নয়,—পারছিল। সে অনেকটা বোঝা না বোঝার মধ্য পর্যায় থেকে দ্বন্দ্ব। আলো আঁধারির খেলা। ধুপছায়া। কেন না এখানে এসে কোনদিন এ রকম ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি তাকে। আশ্চর্য হচ্ছিল। না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। বিস্মিত হলেও বেশ বুঝতে পারছিল সে, এখন এখানে থাকা তার সমীচীন নয়, উচিতও নয়। কিন্তু পা আর উঠছিল না। বজ্রস্পৃষ্ট মানুষের মতো দাঁড়িয়ে রইল। সহসা ভেজান দরজা ঝড়ের মতো খুলে বেরিয়ে এল ঘর হতে বিনতা। খুলতেই সামনে অতীনকে দাঁড়ান দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখাচোখি হতেই মুহূর্তের আত্যন্তিক চেষ্টায় অতীন হাসিরেখা দু'ঠোঁটে জড়িয়ে নিয়ে বলল এই যে কি খবর—। বিনতা ভ্রূক্ষেপ না করে

তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারোয়ারি বাঁধান চিলতে উঠোনটুকু পেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। অতীন দেখছিল বিনতাকে। দেখছিল বিনতার যাওয়ার ছান্দিক ভঙ্গীটুকু। ধীরে ধীরে দড়ি পাকিয়ে যাওয়া বিনতার তনুলতাটিকে। এইতো সেদিন—বছর চার আগের শিল্পিক ছাঁদের দেহটিকে। ওই ও কিনা মনিময়কে কিছুদিনের জন্য বন্ধু মহলে কিছুটা ঈর্ষার পাত্র করে তুলেছিল। কারণ এ রকম সুন্দরী মেয়ে ওর পাওয়া উচিত ছিল না; স্ত্রী ভাগ্য যতই ভাল থাক। এ যে অন্যায় রকমের ভাল। এই সেই বিনতা! এই কিনা—! ভাবতেও আজ আশ্চর্য লাগে অতীনের।

কিন্তু এখন ইচ্ছা থাকলেও ফেরা যায় না।

ঘরে ঢুকল অতীন। ঢুকে দেখে, খাটের ওপর মনিময় দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে বসে। ওরই অদূরে তিন বছরের টুবুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর একটু এদিকে শোয়ান তিন মাসের শিশুটি। অতীন খাটের ওপর বসতে মুখ তুলে তাকাল মনিময়। অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করল, কখন এলি? কি কৌতূহল হীন প্রশ্ন!

—এই এখন।

—আর কোন কথা বলো না। নীরবে অস্বস্তিভরা মুহূর্তগুলি কেটে যেতে লাগল মন্থর গতিতে। স্তব্ধময় ঘরে শুধু টুবুলের ক্ষীণ ফোঁপানি আর নবীন আগন্তুকের গলা থেকে মাঝে মাঝে নিঃসৃত মিষ্টি ঘড় ঘড় শব্দ।

এরপরও বিনতা এক সময় নীরবে এসে চা দিয়ে গেল। একটি কথাও বললো না। অন্যদিন হলে কথার তীব্রবাণে, ব্যঙ্গ কৌতুকে ঘরে হাসির হিল্লোল তুলত। আজ আর কোন কথাই হলো না। চা খাওয়ার পরও কিছু সময় নীরবে কাটল। এক সময় হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে অতীন বললো, আজ উঠি মনি; রাত হলো।

কোন কথা না বলে মনিময়ও উঠে দাঁড়াল। অতীনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এল। উঠোন পেরিয়ে সদর দরজা হতে বেরোতেই একটা কাঁচা সরু বে-কর্পোরেশনের অন্ধকার রাস্তা। তার ওপর একটা বড় আম গাছ তার পত্রপুষ্ট ডালপালা নিয়ে ঝুঁকে পড়ে রাস্তার অন্ধকারকে আরো নিকষ কালো করে তুলেছে। সেখানে আসতেই মনিময় হঠাৎ অতীনের বাঁ-হাতখানা

চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চুপচাপ কিছুক্ষণ। অতীনও কোন কথা বলতে পারল না। স্থানুর মত দাঁড়িয়ে দু'জনে। পরস্পরই অন্ধ। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না এই সারাৎসার অন্ধকারে। সহসা অতীন অনুভব করল এক ফোঁটা ঈষদুষ্ণ কি কেন পড়ল বাঁ-হাতে। আরো কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। এবং যখন অতীন বলল,—নিম্নকণ্ঠে—একটু ধরা ধরা গলায় 'ঘরে যা মনি' এটুকু পথ আমি যেতে পারব'খন।

ঘুরে ঘুরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরল অতীন। এত রাত করে সাধারণতঃ সে বাড়ি ফেরে না। বিভাবতী চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। অতীন ঘরে ঢুকতে তিনি দেরীর কারণ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে গেলেন। আগে আগে খুব করতেন; কিন্তু উত্তর ক্রমশঃ অভদ্রজনোচিত হচ্ছিল বলে নিজের মান বাঁচাবার জন্য আর করেন না। শুধু বুঝিয়ে দিলেন, রান্নাঘরে ঠিক আছে,—খেয়ে এসো গে।

রাত অনেকটা এগিয়ে গেল।

ঘুম আসছিল না কিছুতেই অতীনের। বার বার আজ মনি—বিনতার কথাই মনের ভেতর তোলপাড় করে তুলছিল। কি দেখে এল! অথচ কি ধারণা ছিল ওদের সম্পর্কে। এবং কত মধুর ছিল সেটা। শুধু যে সেটা কাল্পনিক ছিল না তার প্রমাণও তো কত পেয়েছে। তবে কেন আজ···না না ওরা ভঙ্গুর: অল্পতেই ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু সে? না কিছুতেই না··· আনন্দের ভেতরে তো কষ্ট থাকবেই···অথচ ওরা কিনা···অনুভূতিহীন জড় জীবের মত পড়ে রইল।

পরের দিনটাও ভূতে পাওয়া মানুষের মত একটা ঘোরে কেটে যেতে লাগল। সকালের পর এল দুপুরে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে ছিল। গভীর আলস্যে সমস্ত শরীরটা থৈ থৈ করছিল। অনিয়মের অবসাদ। বিকেলে বেরুতে হবে। ওরাও হয়তো···বিভাবতী এসে দাঁড়ালেন। পেছনে পেছনে মঞ্জু। দু'জনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখে হেসে ফেলল

সে। বলল, এইতো বেশ সেজেছিস মঞ্জু। চল সবাই মিলে সিনেমা দেখে আসি।

—না, ও যাবে না। মঞ্জু যাবে আমার সঙ্গে। বিভাবতী বললেন। হাঁ করে তাকিয়ে রইল অতীন।

—আমায় দুটো টাকা দিতে পারিস অতীন।

মায়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল সে, টাকা দুটো নাই বা নষ্ট করলে মা···

ঝড়ের বাঁশ পাতার মতো ঠোঁট দুটো থর থরিয়ে কাঁপতে লাগল বিভাবতীর। চোখ দুটো স্যাঁতসেতে হয়ে এল। আর এই নোনা কান্নার নোনা স্বাদে তাঁর মনে হলো অতীন মঞ্জু ঝাপসা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

কুসুম চালের বস্তাগুলো নিয়ে ট্রেনের শেষ দিকের একটা কামরায় উঠল। ক্লান্ত পায়ে সে যখন স্টেশনে এসেছিল, সূর্য তখন অনেকটা হেলে পড়েছে পশ্চিম দিকে। তার দাপট কমলেও জ্বলুনি কমেনি এতটুকু। পুবের দিগন্ত বিসারী প্রান্তর—দূরে-অদূরের গাছপালা প্লাটফরম রেললাইন আর তার পাশ দিয়ে সোজা চলে যাওয়া কাঁচা রাস্তাটা উজ্জ্বল রোদের আলোয় জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। কোথাও একটা কাকও যেন ডাকছে না, সব কিছু যেন ধুঁকছে। প্লাটফর্মের যেখানে যেখানে গাছের ছায়া এসে পড়েছে, সেখানে চাল কারবারী মেয়ে-পুরুষ আর একরাশ বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনের অপেক্ষায়, ছোট ছোট চালের বস্তা নিয়ে। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কোলাহল করছে। কুসুমও এসে ওদের পাশে দাঁড়াল। তার শরীরটা অবশ—কেমন ভার ভার বোধ হচ্ছে। অন্যবারের চেয়ে এই পঁচিশ কেজি চাল বড় বেশী ভারী বোধ হচ্ছে। এক একবার মনে হচ্ছিল, কি দরকার এই পাপগুলোকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার। কি হবে, কতটুকুই বা সাশ্রয় হচ্ছে সংসারের! কিন্তু পারেনি ফেলতে। অসহ্য লাগছিল তার সমস্ত শরীর। গা রিরি করছিল। আর ঘুরে ফিরে শ্রীদামের কথা মনে পড়ছিল বার বার। তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠছিল কুসুম। মনের মধ্যে একটা তিক্ত জ্বলুনি বোধ করছিল সে। শ্রীদামের ওপর রাগ হচ্ছিল, না অভিমান, না দুঃখ, কুসুম তা ঠিক বুঝতে পারছিল না।

গাড়িতে উঠে আসনগুলোর নীচে ছোট ছোট চালের বস্তাগুলো তিন ভাগে সাজিয়ে রাখল সে। অন্য সময় গাড়িতে উঠেই তাড়াহুড়ো করে নানান জায়গায় ছিটিয়ে ছড়িয়ে লুকিয়ে রাখত, যাতে করে গাড়িতে উঠে পুলিশ অথবা তার সাকরেদগুলো সহজে খুঁজে না পায়। এখন তেমন কিছুই না করে সে এসে ফুটবোর্ডের দরজার কাছে বসে পড়ল। মাথা নীচু করে আজকার ঘটনা, নিজের অদৃষ্ট, আর ঘুরে ফিরে শ্রীদামের কথা ভাবতে লাগল। এখন সে কি করবে, কি বলবে গিয়ে শ্রীদামকে? এর

চেয়ে পাঁচটা বড়িতে ঠিকা কাজ করা যে অনেক ভাল ছিল। কিন্তু শ্রীদাম তাকে দিল না তা করতে। এখন ইজ্জত কোথায় রইল!

কুসুম বাইরের উজ্জ্বল প্রান্তরের দিকে তাকায়। উষ্ণ হাওয়াটা তার চোখে মুখে এসে আছড়ে পড়ছে। গাড়ি তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। সব কিছু দ্রুত পেছনে সরে যাচ্ছে—মাঠ ঘাট মাঝে মাঝে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু উপনিবেশ হেডওয়্যারের স্টিলের থামগুলো। অথচ দূরের ঝাপসা গাছগুলো একটা স্রোতের আবর্তের মত ধীরে ধীরে ঘুরে সামনের দিকে এগিয়ে এসে শেষে কখন যেন পেছনে সরে যাচ্ছে। ঠিক যেন নদীর স্রোতের আবর্ত। কুসুমের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তার আড়িয়াল খাঁর কথা মনে পড়ে। এখনো যেন সেই আবর্ত আর স্রোত দেখতে পায়। উঃ কি প্রচণ্ড স্রোত! আড়িয়াল খাঁর পাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে তখন শ্রীদামের বাড়ির কাছে এসেছে। সেইরকম সময় কুসুমের বিয়ে হয়েছে। তখন বছর পনের কি ষোল বয়স তার। দাঙ্গা বাধার কিছুদিন আগে। কাছাকাছি কোন পুকুর ছিল না, তাই অন্যান্য অনেকের মত শ্রীদাম সে নদীতে স্নান করত। শ্রীদাম সাঁতার কাটত। বিরাট চওড়া বুক নিয়ে শক্ত হাতে জল কাটত। নববধূ কুসুম অবাক হয়ে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখত। শ্রীদাম তীব্র উজানে সাঁতার কাটছে—প্রাণপণ দক্ষিণের স্রোতে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তবু শ্রীদাম শক্তহাতে সাঁতার কাটছে। চোখাচোখি হলে কুসুম ভয়ে ভয়ে হাসত। শ্রীদাম সাঁতার কেটে চলেছে।···আর সে কিছুতে আসবে না এখানে। আর চালের ব্যবসা নয়। শ্রীদামের সঙ্গে আজই ফয়সালা করে ফেলবে সে।

গাড়ি নৈহাটি ঢুকতে কুসুম চঞ্চল হল মনে মনে। কিন্তু একটুও নড়ল চড়ল না। একবার প্লাটফরমের দিকে। তাকিয়ে তারপর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল। উত্তেজনা উৎকণ্ঠা অনায়াসে দমন করল। এখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, শ্রীদামের ওপর তার রাগ অসম্ভব।

তার গা ঘেন্নায় বিজ্ বিজ্ করছে। খিদেয় পেট কচলাচ্ছিল অসম্ভব। কিন্তু খেতে তেমন ইচ্ছা করছিল না। স্নান করতে পারলে বুঝি গা ঘিন্ ঘিন্ কমত। নৈহাটি থেকে গাড়ি ছাড়তে কুসুমের বুকের ভেতরটা কেমন

তোলপাড় করে উঠল। চোখ দুটো আবিল হয়ে এল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "ইজ্জতের লাইগ্যা দ্যাশ ছাড়লাম; ইজ্জত রইল কৈ!

ওর পাশে এসে একটি মেয়েছেলে জিজ্ঞেস করল, "কি লো কুসুম, পুলিশে কি তোর সব লইয়া গ্যাছে?"

"বাকী আর আছে কি দিদি!" বলে ডুকরে কেঁদে উঠল কুসুম।

রাস্তার মোড়ে চালের বাজারে এসে কুসুম দেখল, শ্রীদাম সমানে হেঁকে চলেছে, "পঁচাত্তর—পঁচাত্তর—দুই পঁচাত্তর।" কুসুম চাল নিয়ে এসে ওর পাশে বসল। চালের বস্তাগুলো শ্রীদামের পেছনের দিকে ঠেলে রাখল। শ্রীদাম এখন খদ্দেরকে চাল মেপে দিচ্ছে। কুসুম ভাবতে লাগল, এখন সে কি করবে; কি বলবে। বলার কথা অনেক আছে, আবার বলার মত কিছুই নেই। কি করে বলবে সে-সব কথা। শ্রীদামই বা নেবে কি ভাবে। শেষে রাস্তার মাঝেই যদি একটা তুলকালাম কাণ্ড করে বসে! তখন কি হবে? বাড়িতে গিয়েই ফয়সালা করা যাবে সব। শেষে কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াল কুসুম। বলল, "আমি বাড়ি চল্‌লাম। আইজকা আর যামু না।"

শ্রীদাম অবাক হল। বলল, "ক্যান?"

"আমার শরীল খারাপ লাগতাছে। জ্বর আইব বুঝি।"

"আইতে অত দেরী হইল ক্যান?"

কুসুম হঠাৎ দ্বিধায় পড়ল। কি করবে সে এখন। সবকিছু বলার এইতো সুযোগ। একটু ক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর সহজ ভাবে বলল, "চাউল পাইতে দেরী হইল।"

"আর একবার যাইতে পারলে ভাল হইত। চাউল তো আর নাই। কাটতি ভাল।"

"ওই তো আইন্যা দিলাম।" বলে কুসুম চলে এল।

বাড়ি এসেই কুসুম প্রথমে স্নান করল। একটুকরো সাবান খুঁজে পেতে যোগাড় করে কাপড়খানাও কেচে নিল ভাল করে। তবুও সে তেমন তৃপ্তি

পাচ্ছিল না যেন। ঘুরেফিরে দুপুরের ঘটনাটাই বারবার মনে পড়তে লাগল ; আর তার ফলে সমস্ত শরীর তার বিজ্‌ বিজ্‌ করে উঠছিল। তবু সে এই বিজ্‌ বিজে—ঘিন্‌ঘিনে শরীর নিয়ে ভাত খেয়েছিল। মুখ তার বিস্বাদ, অরুচি আর ওদিকে পেটে প্রচণ্ড খিদে। এই খিদের তাড়নায় খেয়ে নিয়েছিল সে। তারপর অসীম অবসাদ। এই অবসাদে তার ভারী ঘুমোতে ইচ্ছা করছিল ; কিন্তু ঘুমোতে পারল না। বাড়িটা এখন ফাঁকা। ছেলে মেয়েগুলো কে কোথায় যে গেছে, কে জানে। খাওয়া দাওয়ার পর তার শরীরটা সুস্থির বোধ হতে লাগল। কুসুম শ্রীদামের কথা বার বার ভাবতে লাগল আর ঠিক করতে লাগল ; শ্রীদামকে কিভাবে কথাগুলো বলবে যে, সে আর চাল আনতে পারবে না। কিন্তু ভয় হচ্ছে, কি ভাবে শ্রীদাম কথাগুলো নেবে। যদি কারণের জন্য সে চাপাচাপি করে ;—তাহলে ? ব্যাপারটা ভেবে কুসুম চঞ্চল হল। নিজেকে বড় অসহায় বোধ করতে লাগল। শেষে এক সময় সে জোর করে চিন্তাটা ঝেড়ে ঝুড়ে ফেলতে চাইল। বাইরে তাকিয়ে দেখল, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এখুনি হয়তো ছেলেমেয়েগুলো ফিরে আসবে। একটু বাদে খাওয়ার জন্য চিৎকার শুরু করে দেবে। তারপর ? কুসুম তাড়াতাড়ি হেঁশেলের দিকে পা বাড়াল।

হারিকেনের আলোটা আরো একটু উস্কে দিল কুসুম। তা না হলে কষ্ট হচ্ছিল দেখতে। মশারিটায় এত তালি মারার পরও, আরো যে কত ফুটো আছে, কে জানে। রাতে মশারিতে মশা ঢোকে। কামড়ায়—জ্বালা করে। ভোরে উঠে দেখে ঘামাচির মত হাতে পায়ে মশায় কামড়ানোর দাগ অজস্র ! কুসুম খুঁজে পেতে মশারির ফুটোগুলো বার করে সেলাই করে নিচ্ছিল ; অথবা তালি দিচ্ছিল অবস্থা বুঝে। আর মাঝে মাঝে পাশে শোয়া ছোট ছেলেটাকে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করে মশা তাড়াচ্ছিল। বড় মশা ! ঘরের ওদিকে—দক্ষিণ কোণে আর একটা মশারিতে বড় মেয়েটা বাকি তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে শোয়। আর এই মশারিতে ছোট ছেলেটাকে নিয়ে সে আর শ্রীদাম শোয়। ওরা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কুসুমের

হঠাৎ মনে হল, অনেক রাত হয়েছে। পাড়াটা চুপচাপ মনে হল। এতক্ষণে শ্রীদামের আসা উচিত ছিল। তার চোখ দুটোও যেন জড়িয়ে আসছে। সে তাড়াতাড়ি ভাল করে পাখা দিয়ে হাওয়া করে মাশারিটা টানাল। তারপর চার পাশ গুজে দিল। হারিকেনের আলো একটু কমাল। আধা আলো-অ াঁধারিতে ঘরটা কেমন থমথম করতে লাগল। কুসুমের তুপুরে সেই ঘরটার কথা মনে পড়ল। অনেকটা এই রকম আলো যেন।···শ্রীদামকে সে কি করে বলবে? যদি না বলে তা হলে কাল ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হবে। ওরা সব ডাকতে আসবে। রাত তো অনেক হয়েছে! খেয়াল করেনি এতটা।

এবারে কুসুম রীতিমত উদ্বিগ্ন হল। এর অনেক আগেই রোজ আসে শ্রীদাম; কিন্তু আজ এখনো এল না। কি হল লোকটার! এত রাত হচ্ছে কেন! বাড়ি ফেরার সময় তো সে দেখা করে এল। হল্লা ধরে নিয়ে গেল না তো! আশঙ্কায় বুকখানা কুসুমের কেমন করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে অন্ধকার, কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশ স্বচ্ছ,—তারা ফুটে আছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাঠের পায়ে হাঁটা পথটা কুসুম এতক্ষণে অস্পষ্ট দেখতে পেল। না, সেখানে কোন লোকের চলা-ফেরার আভাসটুকুও নেই। সমস্ত পাড়াটা অদ্ভুত নিঃশব্দ,—নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে যেন। তারও ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। সারাদিনের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি; তারপর—। কথাটা ভাবতেই কুসুমের বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। বিড়বিড় করে বলল, "হায়রে পোড়া প্যাট! পোড়া প্যাটরে!" বলে পেটে একটা কিল মারতে গিয়ে কুসুম থেমে গেল। "আবার হয়তো একটা শত্রুর আইতাছে। আবার একটা প্যাট বাড়ব। কোথায় যে যামু আমি—ভগমান!"

মাস খানেক আগে তার নোংরা হওয়ার কথা। কিন্তু আজ পর্যন্ত নোংরা হল না। কি যে উদ্বেগ! কয়েকদিন আগেও সে শ্রীদামকে বলেছিল, "আমার কিন্তু ভাল ঠ্যাকতাছে না। কত তো ওষুধ-বিষুধ আছে শুনি; ডাক্তাররে কইয়া লইয়া আস না।" কিন্তু কে কার কথা শোনে। উল্টে গাল পারল শ্রীদাম, "বছর বিয়ানী মাগী। আমার সময় কই?"

সময় শ্রীদামের মোটেই নেই ইদানীং। পাঁচটা ছেলেমেয়ে আর তারা দুজন,—সাতটা পেটের রসদ যোগাতে শ্রীদাম নাস্তানাবুদ হচ্ছিল। দিন দিন মেজাজও ক্রমশ তিরিক্ষি হচ্ছিল। কুসুম কোন কথা—সে ভালই হোক আর মন্দই হোক, বললেই খেঁকিয়ে উঠত। সংসারের তো এই হাল তার ওপর মানসিক এই অশান্তি, কুসুমেরই এক এক সময় মন পাগল পাগল করে; আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়। অথচ এক লোকটা—এক সময়ের জোয়ান এই মানুষটা কিই না ভালবাসত! সে-সব দিনের কথা মনে পড়লে কুসুমের এখন কান্না পায়। তবুও কি সে মাঝে মাঝে এই লোকটার উত্তাপ পায় না? কিন্তু কি করবে মানুষটা,—বাঁচবে না ভালবাসবে? কিনা করল মানুষটা! কিন্তু কোনটাই ধরে রাখতে পারল না। প্রথমে করল পান-বিড়ির দোকান। ছোট্ট দোকান। তাতেও বাকী পড়ল। গেল ব্যবসা। তারপর একটা স্কুলের দপ্তরীগিরি। পারল না রাখতে। কি একটা লাইব্রেরীর বই চুরির গণ্ডগোলে গেল সেটা। শেষে দুটাকা চার আনা রোজে একটা ফ্যাক্টরীর মজদুরী। তাও ছাঁটাই হয়ে গেল। ভাবনা-চিন্তায় জোয়ান লোকটা শুকিয়ে শুকিয়ে একেবারেই কণ্ঠাসার হল। কুসুম আর কিছুতেই আগের শ্রীদামের সঙ্গে এখনকার শ্রীদামকে মেলাতে পারে না যেন। সেই চওড়া বুক, শক্ত শাবলের মত হাতের মানুষটা। কি সুন্দর! আজও চোখ বুজলে কুসুম স্পষ্ট দেখতে পায়, সেই খাড়া পাড় আড়িয়াল খাঁ। নতুন বৌ সে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে। শ্রীদাম তীব্র উজানে সাঁতার কাটছে—প্রাণপণ। দক্ষিণের স্রোত তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তবু শ্রীদাম শক্ত হাতে সাঁতার কাটছে। চোখাচোখি হলে সে ভয়ে ভয়ে হাসছে। শ্রীদাম সাঁতার কেটে চলেছে।···সত্যি মানুষটার জন্য কষ্ট হয় কুসুমের। যত কষ্ট বোধ করত আর তত রাগ গিয়ে পড়ত পেটের আপদগুলোর ওপর। কিন্তু কি আর হবে; কোন তো উপায় নেই। শেষে অনেক ভেবে একদিন কুসুম বলল, "শোন। একটা কথা কমু।"

"কি?" শ্রীদাম জিজ্ঞেস করল।

কুসুম দ্বিধা করতে লাগল। কি করে যে কথাটা বলবে, ভেবে পেল

না। শেষে ভনিতা জুড়ে বলতে লাগল, "ছ্যাখ সংসারের তো এই হাল। কি কইর‍্যা যে কি হইব, বুঝতে পারতাছি না। তাই কইতাছিলাম—" কুসুমের গলা কাঁপছিল। আর যেন বলতে পারছিল না। শ্রীদাম চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। কুসুমের চোখ ভিজে এসেছিল। ছোট ছেলেটা মার মুখের দিকে ব্যাপারটা বোঝবার জন্য অবাক হয়ে বোবা চোখে তাকিয়েছিল। ধীরে ধীরে কুসুম আবার বলতে লাগল, "তাই কইতাছিলাম, তুমি তো আর এ্যাকা এ্যাত বড় সংসারটা চালাইতে পারতাছ না। আমি যদি একটা কিছু করি তো—"

শ্রীদাম অবাক হয়ে বলল, "কি করবা ?"

"পুষ্পীর মা কইতাছিল, অনেক বাড়িতে নাকি কাজের লোক খোঁজে। আমি যদি দুই একটা বাড়ীতে কাজ—"

"কি কও কুসুম ? ঝিগিরি শ্যাষে—এ্যা ?" শ্রীদাম বিস্ময়ে ফেটে পড়ল, "মাইনষে কইব কি আমারে ? আমি একটা মরদ। আমি কি মইর‍্যা গেছি ?"

কুসুম অপরাধীর মত মাথা নীচু করে নিশ্চুপ বসে রইল।

শেষে সেদিন রাতে শুয়ে শুয়ে শ্রীদাম কুসুমকে বলেছিল, "জান কুসুম, আমি বুঝি। আমার কষ্টের লাইগ্যা তুমি এই ঝিগিরি করতে চাইতাছ। কিন্তু ইজ্জত থাকব কই। যে বাড়িতে যাবা হেইখানে কত বদলোক থাকতে পারে। তোমার দিকে যদি একবার নজর দ্যায়, তখন ?"

"আমি পাঁচটা পোলা-মাইয়ার মা। আমার আর কি আছে। মোরে তুমি সন্দো কর ?"

"তা না কুসুম। তোমার পাঁচটা না সাতটা পোলা মাইয়া হয়তো খোঁজও লইবে না। নজর লাগলেই হইল। পয়সা আছে অগো। অগো বাড়ি। যদি কিছু একটা কইর‍্যা বয়, কি করব্যা তখন ? যে ইজ্জতের লাইগ্যা দ্যাশ ছাড়লাম, আবার সেই—"

কুসুম কাঁদতে লাগল। হায়রে ইজ্জত ! ইজ্জত রইল কৈ ভগমান !"

সে জানলার কাছ থেকে সরে এল। পাড়াটা এখন স্তব্ধ—নিঝুম। রাত

যে কত হল কে জানে। যদি সে কাল যায় তাহলে আবার সকালে উঠতে হবে। ওরা ডাকতে আসবে। পাঁচটার লালগোলা ধরতে হবে। না হলে দিনে চার ক্ষেপ দেওয়া যাবে না। সব কিল হজম করে, কাকপক্ষীকে না জানিয়ে আবার শিউপূজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। চাল আনতে হবে। তা না হলে শ্রীদাম সন্দেহ করবে "হ্যাঁ ইজ্জত। কৈ রাখলা না তুমি···স্বোয়ামী? শ্যাষে তো তুমি আমারে লাইনে লামাইলা। আমি তো যাইতে চাই নাই।"

দিন চারেক আগে শ্রীদাম এসে তাকে বলেছিল, "অমি আর একা পারতাছিনা। চাউল লইয়া আইস্যা, বাজারে বসনের তেমন সময় হয়না। সব মাইয়া লোকেরা চাউল আনতে যায়। পুষ্পীর মা-ও যায়। সুবিধা আছে। আমি অগো কইয়া দিমু। তুমিও যাও অগো লগে। বাজারে বইয়া বিক্রিরি করতে পারুম অনেক। না হইলে যে আর পারতাছিনা।"

কুসুম অবাক হয়ে শুনল। শুনে বুকটা তার কাঁপাত লাগল। সে কি করে করবে এসব? কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না। একবার মনে মনে ভাবল, আগের সেই ইজ্জতের কথা শ্রীদামকে শোনাবে কিনা। কিন্তু শুনিয়ে কি করবে সে। পেট যে এদিকে আর চলে না। দেশে থাকলে অন্তত নুন-ভাত জুটত। কিন্তু দেশ ছেড়েছে সেই পঞ্চাশের দাঙ্গর পর। শ্রীদাম আর সেখানে থাকতে চাইল না। ষোল সতের বছরের আঁটো সাঁটো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বউয়ের ইজ্জত আর জাতের কথা ভেবে এদেশে চলে এসেছিল। সে সব কথা শুনিয়েও বা লাভ কি। অতএব কোন কথা না ব'লে চুপ করে রইল।

পরদিন ভোরে পুষ্পর মা তাকে নিয়ে গেল। সমস্ত দিন অজানা কাজের জন্য আশঙ্কা আর বাড়ির জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। এই কয় দিনে এইসব উপসর্গ সয়ে এসেছিল। প্রতিদিন চার ক্ষেপে এক কুইন্টাল করে চাল এনেছে। কিন্তু আজই সব গেল। কুসুমের কান্না পায়। তিন নম্বর ক্ষেপে গিয়ে দেখে চাল নেই। অথচ তার আগের মেয়ে কটাও গেল। আরো চাল আসবে নাকি; কিন্তু এখনো এসে পৌঁছয়নি। কুসুম অন্য জায়গায় চালের খোঁজে যাবে কিনা ভাবতে লাগল। কিন্তু শিউপূজন ছাড়া

আর কোন কারবারিকে চেনে না সে। পুষ্পর মা বলল "আমি চলি কুসুম। সময় নাই। তুই পরের গাড়িতে চাউল লইয়া আয়।"

"হাঁ হাঁ, ঠ্যারো না থোরা বাদমে আযায়গা।" শিউপূজন আশ্বাস দিল।

কুসুম পুষ্পর মার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "কখন আইব, কে জানে।"

"আরে বইঠো না। জরুর আযায়গা।" বলে শিউপূজন চলে গেল।

কুসুম বারবার ভাবতে লাগল, এখন কি করবে। অন্য কোথাও থেকে খুঁজে নিয়ে যাবে কিনা। তা না হলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

একটুক্ষণ বাদে শিউপূজন ঘুরে এল। কুসুমকে এসে বলল, "হামকো পাস থোড়া চাউল বা। লে যাও। কিতনা দেরী করোগী। আও হামকো সাথ।" বলে সে কুসুমকে নিয়ে অদূরের একটা চালাঘরের কাছে এল। দরজার তালা খুলে শিউপূজন ভেতরে ঢুকে একটা চালের বস্তা টেনে বার করল। কুসুম দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিল। শিউপূজন তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আও লে লেও।"

কুসুম ভেতরে ঢুকল। বস্তাটা মেলে ধরল। শিউপূজন মেপে মেপে পঁচিশ কেজি চাল দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কুসুম তার চাল ঠিকঠাক করতে লাগল। তারপর দাম দেবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই সে দেখল শিউপূজন দরজা বন্ধ করছে। সে তাড়াতাড়ি চিৎকার করে উঠল, "দরজা বন্ধ করতাছ ক্যান?"

ততক্ষণে শিউপূজন কুসুমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তার মুখ শক্ত হাতে চেপে ধরেছে। তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। সে দু'হাত দিয়ে অসুরের শক্ত হাতটা সরিয়ে দিতে চাইছিল প্রাণপণ। অসুরটা আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরছিল। আরো—আরো—নিবিড়। সে নিজেকে বড় অসহায় মনে করছিল। বড় দুর্বল। সে যেন মরে যাবে। বুকের পাঁজরাগুলো যেন ভেঙ্গে যাচ্ছিল। বড় কান্না পাচ্ছিল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ভীষণ জল খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। একবার

অস্ফুট গলায় জল খেতে চাইল। অসুরটার যেন কোন কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান নেই। কুসুম তৃষ্ণা আর কান্না সম্বল করে মৃত্যুর জন্য যেন শুয়ে রইল।

শিউপূজন উঠে গিয়ে ঘরের কোণের একটা কুঁজো থেকে গ্লাস ভরে জল নিয়ে এল। "উঠ। পানি পিয়ো।"

কুসুম উঠে বসে জল খেল। সে তখন অঝোরে কাঁদছে।

'আরে রোও মাৎ।"

কুসুম উঠে দাঁড়াল। কাপড় ঠিকঠাক করে নিল। তার গা ঘিন্ ঘন্ করে উঠল। আর ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল '

শিউপূজন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বলল, "আঁশু মুছ লেও। রোণেকা ক্যায়া ফয়দা। জলদি করো।"

কুসুম কাঁদতে কাঁদতে চোখ মুছতে লাগল। শিউপূজন অস্বস্তি বোধ করছিল। তার আর দেরী সইছিল না। আবার কে এসে যায়। অনেকক্ষণ দরজা বন্ধ। তাই তাড়াতাড়ি একখানা দশটাকার নোট ট্যাঁক থেকে বার করে কুসুমকে দিতে গেল। কুসুম হাতটা সরিয়ে দিল। কিন্তু শিউপূজন শুনল না। কুসুকে টেনে ধরে তার জামার মধ্যে টাকা দশটা গুঁজে দিল। কুসুম তাড়াতাড়ি পেছনে সরে এল। মনে মনে ভয় পেল, "পশুটার খাউজ এখনো মেটে নাই।"

চালের বস্তাগুলো নিয়ে কুসুম যখন বেরিয়ে এল ঘর থেকে, বাইরে তখন ঠা ঠা রদ্দুর।

এসব কথা শ্রীদামকে সে কি করে বলবে? না, সে বলবে না। অনায়াসে শ্রীদামকে ফাঁকি দেওয়া যাবে। তাছাড়া ও জানে, তার পেটে একটা আসছে। এটা না হলেও কোন সমস্যা ছিলনা। কিন্তু অনেক রাত হল; ও তো এখনো এল না। হল্লা ধরে নিয়ে গেল না তো! তাহলে তো দুই একদিন হাজত বাস। কি করে চলবে তাদের। তার কাছে যদিও পঞ্চাশ আর দশে ষাট টাকা আছে। এ টাকা একান্তই তার। শ্রীদাম

ছাড়াও সে এখন ব্যবসা চালাতে পারে। কিন্তু ইজ্জত? "হ প্যাটে ভাত নাই। ইজ্জত ধুইয়া কি জল খামু।"

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কুসুমের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সে যেন এখনো আড়িয়াল খাঁর স্রোতটা দেখতে পায়। সেই একটানা তীব্র স্রোত। সেই স্রোতে এখানকার কণ্ঠাসার শ্রীদাম সাঁতার কেটে উজানে আসার চেষ্টা করছে—প্রাণপণ। দক্ষিণের স্রোত তাকে টেনে নিয়ে চলেছে সমানে। দুর্বল হাতে আর যেন জল কাটতে পারছে না। কুসুম অসহায়ের মত বোবা চোখে তাই যেন দেখতে লাগল।

বেশ ভোরেই ঘুম ভাঙ্গল আদিত্যর। অন্যান্য দিনের মত। এ অনেকটা অভ্যাসবশে। তা না হলে ঠিক সময় মত আজ ঘুম ভাঙ্গার কথা নয়। কাল শুতে শুতে তাদের অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। নীতার সঙ্গে একটা বিশ্রী তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। যার জের চলেছিল অনেক রাত অব্দি। ইদানীং প্রায়ই এরকম টানা-পোড়েন চলছে। সে লক্ষ্য করেছে। কাল সেটা গিয়ে চরমে পৌঁছেছিল। নীতা যে ঠিক গলা উঁচিয়ে ঝগড়া করেছে তা নয়, তার কথার মাঝে মাঝে আদিত্যরই পুরানো কথার জের টেনেছে, মন্তব্য করেছে, টিপ্পনী কেটেছে। প্রচণ্ড উষ্মায় নীতার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আদিত্য মাঝে মাঝেই চীৎকার করে উঠেছিল। সে নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি। এক সময় তো বড় মেয়েটা ঘর ছেড়ে গিয়ে রান্নাঘরে বসেছিল। ও হয়তো আর সহ্য করতে পারছিল না। ছোট মেয়ে আর ছেলেটা কিছুটা ভয়ে, অস্বস্তিতে মা-বাবাকে দেখছিল। এখন আদিত্যর এসব কথা মনে পড়তে খুব খারাপ লাগল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। সময় ঠিক আন্দাজ করতে পারল না। বাইরে কেমন ঘষা ঘষা আলো। ঘট্‌ঘট্‌ করে পাখাটা সামনে ঘুরে চলেছে। অর্থাৎ কারেন্ট আজ এখন পর্যন্ত আছে। ঘরের গুমোট ভাব অন্যদিনের চেয়ে অনেক কম। আদিত্য দেওয়ালের তাকে রাখা টেবিল ঘড়িটার দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তাকের কাছে গিয়ে ঘড়ি দেখল। সোয়া পাঁচ। না, প্রায় ঠিক সময়েই ঘুম ভেঙ্গেছে তার। কিন্তু এই সময় তো বাইরে আরো আলো ফোটার কথা। সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটু অবাক হল। দেখল, ঝির ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ গাঢ় মেঘে এখনো ছেয়ে আছে। সে চারিদিকে একবার তাকাল। এখানে ওখানে অনেক জল জমে আছে।

তার মানে, রাতে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সে একেবারেই টের পায়নি। কখন বৃষ্টি নামল! কাল ঝগড়াঝাঁটি করে অনেক রাত অব্দি তার ঘুম আসেনি। শুধু এপাশ ওপাশ করেছে। কই, তখনও তো বৃষ্টি নামেনি। হয়তো শেষ রাতের দিকে নেমেছে। সে ঘরের সবার দিকে তাকাল একবার। জোড়া তক্তপোষের ছড়ানো বিছানায় নীতা ছেলেমেয়ে তিনটে নিয়ে শুয়ে আছে। নাইলনের মশারির জন্য বাইরে থেকেও এই আধো-অন্ধকারে বেশ স্পষ্ট ওদের দেখা যায়। অকাতরে ঘুমোচ্ছে সব। আদিত্য মেঝেয় পাতা নিজের বিছানাটা তুলবে কি না ভাবল একবার। যদিও কোন দিন সে তোলে না। কেন যে এই কথাটা ভাবল সে, ঠিক বুঝতে পারল না। হয়তো কালকের কথা ভেবে। নীতা বলেছিল, 'কুটো-গাছটি কেউ তোমরা নাড়বে না। সংসার শুধু আমার। রাতদিন শুধু গাধার মত খেটে যাও।'

রাগের মাথায় সেও যে সব কথা বলেছে, তাও ভাল নয়। বলেছিল, 'তুমি কোন রাজ-নন্দিনী?'

'দাসী-বাঁদীর মত গায়ে-গতরে খাটতে হবে এমন কথাও তো ছিল না'। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে নীতা বলেছিল, 'কেউ রাজপুত্তুরও নয়'।

নীতার একথার মধ্যে বেশ একটু খোঁচাও ছিল। আদিত্য বুঝতে পেরে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল। একটা কড়া কিছু বলতে গিয়েও কোন কথা বলতে পারল না। নীতা তাদের বিয়ের আগের কথাবার্তার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল। এ ব্যাপারে এখন সত্যিই কিছু তার বলার নেই। নীতাদের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। ওর বাবাকে বোঝান হয়েছিল, আদিত্য খুব ভাল কোম্পানীতে চাকরি করে। ভীষণ উন্নতি করবার সুযোগ আছে। হীরের টুকরো না হলেও একেবারে ফেলনা ছেলে নয়। এইসব বুঝিয়ে সুঝিয়ে নীতার বাবার কাছ থেকে আদায়পত্তর তার বাড়ির লোকেরা কিছু কম করেনি। কিন্তু সে-সব এখন শুধু স্মৃতিতে আছে। কারখানার একবারের লক-আউটে আদিত্যর কাছে নীতা-ই কেবল অক্ষত আছে, আর সব বায়ুভূতে লীন। এই ব্যাপারে আদিত্যর কি করার আছে। কারখানার মালিক তো আর সে নয়, যে ইচ্ছা করে সে-ই বন্ধ করে দিয়েছে। শ্রমিক-

কর্মচারির কোন দাবি উঠলেই কোম্পানির অবস্থা খারাপ হয়, বাজার মন্দা হয় ভীষণ, অর্ডারপত্তর থাকে না। কত যে সব কারণ। অজুহাতের অভাব থাকে না। অর্থাৎ তোমরা শুধু মুখ বুজে কাজ করে যাও। তোমাদের সংসার এই মাগ্‌গিগণ্ডায় চালাতে পার আর চাই না পার। ধ্যাত্তোর, এইসব ভেবে আর কি হবে। তার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আদিত্য তাড়াতাড়ি হাতের চেটোতে খানিকটা মাজন নিয়ে দাঁত ঘষতে লাগল। বাইরে যাওয়ার আগে একবার নীতার দিকে তাকাল। ওকে ডেকে তুলবে কি না ভাবল একবার। কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হল। যদিও কালকের রাগ আর তার নেই। সত্যি, ওর কোন দোষ নেই। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সে বহুদিন ধরে ওদের সমানে শুনিয়ে আসছে। তার মাইনা-কড়ি বাড়ছে শিগ্‌গিরি। বহু টাকা বাড়বে। প্রমোশন এবার হবেই। একেবারে কিছুই যে হয় না, তা নয়। যা হয় তাতে সর্বগ্রাসী বাজার কখন যে খেয়ে নেয়, টেরই পাওয়া যায় না। যেই তিমির সেই তিমির। না, দিন দিন আরো খারাপ হচ্ছে। নীতা শুকনো স্তোক আর কতদিন শুনবে।

আদিত্য ঘরের বাইরে এল। মুখ ধুতে ধুতে সে বুঝতে পারল, নীতা উঠেছে। এখনি তার এক কাপ চা দরকার। তা না হলে পায়খানায় ঢোকা নিরর্থক। সে প্রথমে চা খাবে. তারপরেই একটা বিড়ি।

কারখানায় এসেই আদিত্য সুখবরটা পেল। ট্রাইপার্টাইট ইন্‌জিনীয়ারিং এগ্রিমেণ্ট হয়েছে। তাদের মোটামুটি আটাত্তর টাকার মত মাইনা বেড়েছে। শুনে তার খুব ভালই লাগল। প্রায় সবাই খুশি। অথচ কয়টা টাকার ব্যাপার নিয়ে কাল নীতার সঙ্গে কী না বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। ও কেবল বলেছিল—খুব সাদাসিধেভাবে বলেছিল, 'মেয়ে ছুটোর জন্য তুমি কিছুই ভাবছ না।'

'মানে ?'

'মানে আবার কি। ওরা বড় হচ্ছে না; বিয়ে দিতে হবে না ?'

'হবে তো। তার এখন কি ?'

'এখন কি নয়। গানটান শেখাতে হবে না? ওদের গানের গলা কিন্তু সুন্দর।'

'লেখাপড়া তো করছে। গানফান শিখে কিস্যু হয় না।'

'হয়। কাজে লাগে। আজকাল ওটা চায়।'

'ধ্যুৎ।'

'ধ্যুৎ আবার কি। তোমরা এসে আমার গান শুনতে চাওনি?'

'কোন কাজে লেগেছে? ওটা একটা ফ্যাশান।'

'ফ্যাশান হোক আর যাই হোক, ওদের গান শেখাব।'

'আমার অত টাকা নেই।'

'যা আছে ওই দিয়ে চালিয়ে দেব।'

'না, চালানো যাবে না। এতেই দেখছ, সংসার চলছে না।'

'চলবে।'

'একে চলা বলে না। কটা দিন মাছ খায়? তুমিই তো বলছিলে ছেলেমেয়েরা কিস্যু খেতে চায় না।'

'তা হোক, গান শেখাব।'

'না, আমি পারব না। ধার করে আমি কিচ্ছু করব না। লক-আউটের সময় ছাড়া কোনদিন ধার করিনি। ধার করে ফুটানির মধ্যে আমি নেই॥ জানি তো ধার করলে হাল কি হয়। বহু বন্ধুবান্ধবকে তো দেখছি। একবার শুরু হলে ক্রমশঃ বেড়েই যায়।'

'তা হলে খাওয়াদাওয়া লেখাপড়া বন্ধ করে দিলেই হয়. তোমার টাকা বাঁচবে।'

'কি আলফাল বলছ!'

'কথা বললেই আলফাল। আচ্ছা বল তো, আমাদের কোন শখ-আহ্লাদ মিটিয়েছ আজ পর্যন্ত? কোনরকমে খাচ্ছি আর শুচ্ছি।'

'ভারতবর্ষের বহু বহু লোকের এটুকুও জোটে না।'

'কিন্তু তারা তোমার মত প্রমোশনের কথাও বলে না, টাকা বাড়বার কথাও বলে না।'

তখনই আদিত্যর মাথা গরম হয়ে যায়। আর ধৈর্য রাখতে পারে

না। ···যাকগে সে-সব। ওসব ভেবে এখন কি হবে। আজ বাড়ি গিয়ে গানের মাস্টার রাখার কথা নীতাকে বলবে কি না ভাবল একবার। বাড়তি টাকার একটা অংশ দিয়ে গানের ব্যবস্থা করা যায় অনায়াসে। অনায়াস কথাটা মাথায় আসতে আদিত্য দ্বিধায় পড়ল। ব্যাপারটা অত সহজ নয়। শুরুতেই অনেক টাকার ধাক্কা। নতুন হোক আর পুরনো হোক আগে একটা হারমোনিয়াম কিনতে হবে। এই কেনার প্রসঙ্গ উঠলেই নীতার যেটা ছিল অর্থাৎ বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে যেটা পেয়েছিল সেইটার প্রসঙ্গও উঠবে। ওটা তো গেছে লকআউটের সময়। বহু পুরানো ব্যাপার। সেই পুরানো ক্ষতের আশেপাশে নতুন করে হয়ত হাত বুলানো শুরু হবে। সে এক অসহ্য ব্যাপার হবে। তার চেয়ে পুজোর বোনাসটা পেয়েনি তখন না হয় একটা চেষ্টা চরিত্তির করা যাবে। আর তো বেশী দিন পুজোর দেরী নেই।

সময় কিন্তু ঠিক বয়ে যায়। এক এক দিনের প্রচণ্ড উত্তেজনা কালের নিয়মে তা প্রশমিত হয়। নীতার এক এক দিনের আকস্মিক জেদ স্তিমিত হতে হতে এক সময় বিলীন হয়। সে-ও তো এই সমাজ-সংসারের যূপকাষ্ঠে শিকার হয়ে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞ হয়েছে। সাধ আর সাধ্যের ব্যবধান তার একেবারে অজানা নয়, তবুও অবুঝ—অবাধ্য সাধ জাগে। তখন আর মন যেন মানে না। মানতে চায় না। মানসিক বিক্ষোভ জাগে। দেহমন সংক্ষুব্ধ হয়। আবার বিলীন হয়। এই করেই তো পনেরো-ষোলটা বছর কেটে গেল। নীতার নিজের জন্য কোন দুঃখ টুঃখ হয় না এখন আর। এইভাবেই তো এতদিন কেটে গেল, বাকীটাও হয়তো কেটে যাবে। শুধু ছেলেমেয়েদের জন্য একটা বোধ্য তাড়না তাকে মাঝে মাঝে ব্যাকুল করে তোলে: ওরা কি পেল! ভবিষ্যৎ ওদের জন্য কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এই কোয়ার্টার-জীবনের প্রতিটি পরিবারের দিকে তাকিয়ে তো কারো কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে না সে। সরকারী এই আবাসিক স্থানে বিভিন্ন কারখানার বিভিন্ন লোকজন থাকে। কখন কোন পরিবারের সাময়িক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে, ঠিক টের পাওয়া যায়। আবার কখন স্তিমিত হয়

তাও। কেউ কারো প্রতি দেমাক দেখাতে ছাড়ে না। সবাই যেন সবার প্রতিযোগী। অথচ সকলেরই জীবন-মরণ যেন একটা পলকা সুতোর ওপর ঝুলছে।

পুজো প্রায় এসে যায়। কোন কোন কোয়ার্টারে খুশির আমেজ লেগে গেছে। অর্থাৎ সেই সেই কোয়ার্টারের কর্তাদের বোনাস হয়ে গেছে। আর এদিকে আদিত্য আশ্চর্যরকম চুপ। নীতা এই চুপচাপের কারণ একটা অনুমান করে নিয়েছে। তবু মন ছটফট করে। যে লোকটা সামান্য আশা-আকাঙ্ক্ষায় সব সময় উচ্ছল হয়ে ওঠে, সে আজ আশ্চর্যরকম নীরব। তার মানে, গতবারের মত এবছরও আদিত্য পুজো বোনাসের ব্যাপারে অসুবিধায় আছে। কিন্তু গতবার তবু পুজোর মুখোমুখি সে বোনাস পেয়েছিল। ফলে নীতাকে সব কিছুতে ভীষণ তাড়াহুড়ো করতে হয়েছিল। কেমন একটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গিয়েছিল সবকিছুতে। কিন্তু এখন তো আর পুজোর ক'টা দিন মাত্র বাকী। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে নীতা একসময় আদিত্যকে জিজ্ঞেসই করে ফেলল, ছেলেমেয়েদের কাপড়-জামা তো কিনতে হবে।'

'জানি।'

'কিন্তু পুজোর তো আর আর দেরি নেই।'

'আমাদের বোনাস নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে।'

'কেন ?'

'কেন আবার কি। কোম্পানি বলছে, কুড়ি পার্সেন্ট বোনাস দিতে পারবে না।'

'কেন দেবে না ?'

'তার আমি কি বলব। লাভ নাকি তেমন হয়নি।'

'বললেই হল ? সারাটা বছর তোমরা সমানে খাটলে আর—'

আদিত্য ম্লান হাসল। বলল, 'ইউনিয়ন কুড়ি পার্সেন্টের কম বোনাস নেবে না। আন্দোলন চলবে।'

'কতদিন চলবে ?'

'তার কি কোন ঠিক আছে। যতদিন না পাওয়া যায়।'

'পুজো তো শেষ হয়ে যেতে পারে?'

'পারে। আবার কারখানা বন্ধও হয়ে যেতে পারে।'

নীতার মুখখানা কেমন কালো হয়ে এল। অজানা আশঙ্কা কেমন যেন তাকে ক্রমশঃ গ্রাস করতে লাগল। কোন কথা না বলে সে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে এসে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

মাইকে ঢাকের শব্দে খুব ভোরে আদিত্যের ঘুম ভাঙ্গল। কাছেই একটা বারোয়ারী পুজো। গতকাল থেকে সমানে 'মাইক টেস্টিং, মাইক টেস্টিং' চলছিল, আর চলছিল হিন্দি সিনেমার গান। কিন্তু আজ ভোরে তাতে ঢাকের কাঠি পড়ল। আজ বোধন। আদিত্যের আজও কারখানা খোলা। কাল থেকে ছুটি। ছুটির চিন্তাটাও ভাল লাগল না। কি করবে ছুটি নিয়ে। শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। সারাটা চাকরির জীবনে সে কি করল! প্রায় বিশ বছর ধরে চাকরি করছে। শুধু কারখানা আর বাড়ি, বাড়ি আর কারখানা। কখনো কোথাও সে বেড়াতে যায়নি। কোন সঞ্চয় নেই তার। পরিবারের কারোর তেমন কিছু সাধ-আহ্লাদ মিটিয়েছে কি না মনে করতে পারল না। শুধু খাওয়া-দাওয়া আর নিতান্ত না করলে নয় গোছের কর্তব্যগুলো করে গেছে। তবে তার কোথাও কোন ধার নেই। ধার করতে ভাল লাগে না। শুধু একবার কারখানা তিন মাসের লকআউটের সময় কিছু ধার-দেনা হয়েছিল। সংসারের অনেক কিছু বিক্রি করেও যখন সামলাতে পারেনি, তখনই দেনা করতে হয়েছিল। সে ক্ষত শুকোতে প্রায় বছর দুয়েক লেগেছিল। আদিত্য জানে ধার-দেনার পরিণতি কি ভয়াবহ। সে তার অনেক সহকর্মীকে তো প্রতিদিন দেখছে। প্রতি মাসে ঋণের সুদ দিতে দিতে কেমন জেরবার হয়ে যায় তারা। অবশ্য তাদের কারো কারো অনেক আনুষঙ্গিক দোষ আছে। কিন্তু তার তো সে-সব কিছু নেই। নেশার মধ্যে তার একটু চা আর বিড়ি সিগারেট···কি হবে এ সব ভেবে। আদিত্য বিছানা ছেড়ে উঠল। আজ আর তাড়া নেই। দুপুর দুটোর শিফট্।

নীতা চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'বাজারে যাবে না ?'
'চা খেয়েই যাব।'

বাজার থেকে বাড়ি ফিরে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আদিত্য বেরিয়ে গেল। সাধারণতঃ এই সময় সে বাড়ি থেকে বড় একটা বেরোয় না। কিন্তু আজ তার ঘরে বসে থাকতে অসহ্য বোধ হচ্ছিল। ষষ্ঠির দিন, চারিদিকে মাইক বাজছে ; অথচ ছেলেমেয়েগুলো পড়ার বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে নিষ্প্রাণ বসে রয়েছে। এছাড়া, ওরা আর কীই বা করতে পারে। ছোট মেয়ে আর ছেলেটা তার দিকে মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছে। ওদের ম্লান মুখ আর করুণ চাউনি তাকে অসহায় করে তুলছিল। নীতা নিজেকে হয়তো ইচ্ছা করেই রান্নাঘরে আবদ্ধ করে রাখছিল। বরং এর চেয়ে আজ মর্ণিং শিফট্ ঢের ঢের ভাল ছিল। কিন্তু কাল ? ওরা মনে মনে ঠিক ভেবে রেখেছিল, বাবা পুজোর আগে তাদের নিশ্চয়ই জামা-কাপড় কিনে দেবে। এখন হয়তো বুঝতে পেরেছে, তা আর হওয়ার নয়। ওদের বন্ধু-বান্ধুবদের সকলেরই হয়তো নতুন জামা-জুতো হয়েছে। কারোর কারোরটা হয়তো ছুঁয়েছেনে দেখেছে। ···তা হোক, এই সমাজ ব্যবস্থায় এই-ই হয়। এখন থেকেই ওরা বুঝতে শিখুক। আজ আমরা যেমন অর্থের জন্য বোনাসের জন্য লড়াই করছি, দিন আসছে—ওদের শুধু বাঁচার জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের কোম্পানি তো এইট পয়েণ্ট থ্রি থ্রি বোনাস রেডি করে সেজেগুজে বসে আছে। যে কেউ এসে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি—আমরা কেউ তা নেব না, কিছুতেই না। তার জন্য যত দূর যেতে হয় যাব। ···সহসা তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা বাড়ায় আদিত্য। নীতাকে, ছেলেমেয়েদের এই কথাগুলো বলা যে একান্ত দরকার : 'এক মাসের বোনাস কোম্পানি সাজিয়ে রেখেছে। আমরা আমাদের দাবির পুরোটা চাই। ওটা ডেফার্ড ওয়েজেস। মিথ্যা ওজর আপত্তি করে আমাদের ঠকাতে পারবে না।'

কারখানায় গিয়েও আদিত্য তেমন স্বস্তি পেল না। তবে বাড়ির মত

অতটা অসহায় বোধ করল না এখানে তারা প্রায় সবাই একই চিন্তা-ভাবনায় জড়িয়ে একাকার। সকলেই যে মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তায় সমান নয়, তা সে জানে। এবং এও জানে স্বার্থবাজ, ধান্দাবাজ দালাল এতগুলো লোকের চাপে মুখ বুজে আছে সুযোগের অপেক্ষায়। তা ওরা থাকুক, কিন্তু এবার তারা ছাড়বে না। একটু আগে ইউনিয়নের নেতারা জানিয়ে গেছে, মালিকপক্ষ নাকি কথা দিয়েছে, তারা আবার নতুন করে বিবেচনা করবে। অর্থাৎ সুর একটু নরম হয়েছে। তবে, শ্রমিক-কর্মচারীরা এক মাসের যে বোনাস দেওয়া হয়েছে তা যেন তুলে নেয়। কিন্তু আমরা সাফ জানিয়ে দিয়েছি, দাবির পুরোটা একসঙ্গে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা বোনাস তুলব না। পুজোর পর আমরা বৃহত্তর লড়াই-এর দিকে যাব।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আদিত্য পেচ্ছাবখানার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ তার পশ্চিমদিকে চোখ পড়ল। পরিচ্ছন্ন আকাশে একখণ্ড কালো মেঘের গায় রোদ পড়ে ধীরে ধীরে আশ্চর্যরকম লাল হয়ে উঠেছে। আদিত্য অপলকে তাকিয়ে রইল। কখন সুধীর তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি। সে আদিত্যর কাঁধে হাত রেখে বলল, কি অত মনোযোগ দিয়ে দেখছিস ?

আদিত্য একটু চমকে উঠল। পরে হেসে বলল, 'কিছু না।'

'ঐভাবে তাকিয়ে আছিস ?'

'ঐ মেঘটা দেখছিলাম।'

'ও।'

'পুজোয় এবার ওভারটাইম হবে নাকি ?'

'শুনলাম তো হবে না। এবার কি আর সেই অবস্থা নাকি ?'

'তার মানে কাল থেকে পাঁচদিন ঘরে বসে থাকতে হবে ?'

'কেন, ঘুরে ঘুরে পুজো দেখবি।'

'আর পুজো দেখা ! হাতে নেই টাকা পয়সা ; ছেলেমেয়েদের কিছুই কিনে দিতে পারলাম না—'

'আমি আগেই কিনে দিয়েছি।'

'কি করে দিলি ?' আদিত্য কিছুটা অবাক হয়।

'দিলাম। কি আর করে—জানিস তো—ও যখন বোনাস পাব তখন দিয়ে দেব।' বলে হাসতে হাসতে সুধীর চলে যায়।

আদিত্য ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সে জানে, সুধীরের অনেক দেনা। তবু ওর সাহস আছে। তার চেয়ে ও অনেক নিশ্চিত।

আদিত্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, সে এখন কি করবে। দূর থেকে—বিভিন্ন দিক থেকে মাইকের আওয়াজ ভেসে আসছে। ছেলে-মেয়েদের সকালের ম্লান মুখগুলো চোখের ওপর ভেসে উঠল। কোন বছরই সে আগে থেকে বাড়ির কারো মুখে হাসি ফোটাতে পারেনি। কেমন যেন একটা তাড়াহুড়ো চিরকাল করে এল: আর এবার? সে যেন আর স্থির থাকতে পারল না। ঐ মাইকের ক্ষীণ আওয়াজ যেন তাকে টেনে নিয়ে চলল শঙ্করলালের খোঁজে। আদিত্য যেন ছুটতে লাগল গেট অফিসের দিকে। ওখানেই থাকে শঙ্করলাল। যদি এখন ও না থাক? ঠিক আছে, মুনিলাল, মুনিলাল আছে। ধরমরাজ পাণ্ডে আছে। অত কি ভাববার আছে! এতদিন আগুপিছু অনেক কিছু ভেবেছে। ভেবে ভেবে কি করতে পেরেছে আজ পর্যন্ত। শুনছে তো গোটা ভারতই নাকি দেনায় ডুবে আছে। তা হলে—তা হলে সে তো কোন্ ছার্! দেনাও চলবে, লড়াইও চলবে। সে শঙ্করলালের কাছে এসে দাঁড়াল।

'কেয়া আদিৎবাবু কেয়া বাত্?'

'আমাকে ছ'শো টাকা দিতে হবে।'

'দেগা লেকিন্ বারো পার্সিণ্ট্।'

আদিত্যর চোখের পাতা কাঁপল একটু। মনে মনে হিসাব করল, মাসে মাসে বাহাত্তর টাকা। সে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। তার হঠাৎ বড় মেয়ের মুখখানা মনে পড়ল। ও যেন গান গাইছে।

'কেয়া আদিৎবাবু।'

আদিত্য শঙ্করলালের দিকে তাকাল। দূর থেকে একইভাবে মাইকে সুর ভেসে আসছে। আদিত্য আস্তে আস্তে ঘাড় কাৎ করল।

অলিন্দের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু ক্লান্তি লাগছিল। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করল ; আবার ঠিক তেমনি ভাবে উজাড় করে দিল। একটু হাল্কা বোধ করল। কোনোদিকে তাকাল না। সে জানে, আশে পাশে পেছনে অনেকে তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এতে ওরা কিছু অবাকও হয়নি, অন্য কিছু ভাবেওনি। কেননা, ওরা জানে, সে কখনো কখনো এইভাবে চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে. কথা বলতে বলতে একেবারে চুপ করে যায়. বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় আবার বসে পড়ে স্বাভাবিকভাবে। এবার সে প্রশস্ত চত্বরে পা বাড়াল। ধীরে ধীরে—মোটামুটি মন্থরগতিতে এগোতে লাগল। আশপাশ পেছনের কেউ কেউ এবার তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। এবং দ্রুত যেতে থাকল। ওরা কেউ কেউ গুনগুন করে কথা বলছে। অনেকের মুখই থমথমে। দেখলে মনে হয়, উত্তেজনার পথ হঠাৎ কে যেন নিরুদ্ধ করে দিয়েছে।

সে আবার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারিদিকে তাকাল একবার। বড় ভাল লাগল। পশ্চিমে সূর্যাস্তের আয়োজন। নির্মেঘ আকাশ। যদিও ঈষৎ কুয়াশায় রক্তিমাভা বিবর্ণ—আবিল। বিস্তীর্ণ বাগানের সযত্ন ঘাস সারাদিন রৌদ্রদহনের পর নিস্তেজ নিষ্প্রভ। কিন্তু মরসুমী ফুলগুলো এখনো আশ্চর্য সতেজ। সে কিছুক্ষণ ফুলের বর্ণ সমারোহের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে মনে ভাবল, বাস্তবের সবকিছু এমনি সাজানো গোছানো যায় না। গেলে কেমন হত ? অসম্ভব ! তাহলে আজ যা এতক্ষণ ধরে হল, তা কি হয় কখনো ! নাঃ, শেষ পর্যন্ত দড়িটা আজো টিঁকে গেল। হ্যাঁ, মনে হয়েছিল আজই ছিঁড়ে যাবে। উদ্বিগ্ন হয়েছিল বৈকি। তূণের সব অস্ত্র নিয়েই সে আজ প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। কিন্তু এক সময় সে রীতিমতো বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। যত অস্ত্র তার সব তো

নিরস্ত্র করা, বশে রাখার—হত্যা বা সব কিছু শেষ করার জন্য নয়। কিন্তু দড়িটা টিঁকে গেল। অলৌকিকভাবে নয়। তাকে অভিনয় করতে হয়েছে রীতিমত : ভয় দেখান, শাসানো কখনো বা উদ্বেগ উষ্মা প্রকাশ—কি না! সে আনমনে ভাবতে ভাবতে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখখানা মুছল। একটু মাথা ধরেছে বুঝি। আবার তার সেই ছোট বেলাকার ঘটনাটা মনে পড়ল। আজ কেন জানি বার বার ঘুরে ফিরে মনে পড়ছিল। সেই গুণিন! না, এবারেও দড়িটা ছেঁড়েনি। একে টিঁকিয়ে রাখতেই হবে—যে করেই হোক।

সে আবার পরিচ্ছন্নভাবে তাকাল পশ্চিম দিকে। সূর্য নেই। শুধু পড়ে আছে তার রক্তিম রেশ। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। ঘাসগুলো এখন কালচে, ফুলগুলো নিষ্প্রভ। মোরেন ছড়ানো পথে পা রাখল। পাশে এসে একজন দাঁড়াল। সে ঘুরে তাকাল। ঈষৎ ভ্রূকুটি করল।

লোকটি বলল, 'সাড়ে ছ'টায় পৌঁছতে হবে।'

'কোথায়?' সে জিজ্ঞেস করল।

'নর্থ ছাব্বিশে।'

'আজই?'

'হ্যাঁ, আজ।'

সে একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘাড় ফিরিয়ে বাড়িটা দেখল। সুরক্ষিত বাড়িটার উচ্চ চত্বরে এখনো কেউ কেউ দাঁড়িয়ে। এতদূর থেকে ঠিক কাউকে চিনতে পারল না। তবু ওরা এখনো আছে। অতএব দড়িটা আরো শক্ত করতে হবে। সে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে মোরেনের ওপর মৃদু শব্দ তুলে এগোতে লাগল। যেতে যেতে বলল, 'এভাবে আর ভাল লাগে না।'

লোকটা শুধু হাসল।

'এর অর্থ?' সে গম্ভীরভাবে বলল।

'এমনি।'

তুমি নিশ্চয়ই জান, আমি কোন কিছুর 'এমনি' অর্থ ধরি না।'

'জানি।'

'তবে ?'

'তোমার ভাল লাগা না লাগার ওপর সব কিছু নির্ভর করে ?' লোকটা হাসতে হাসতেই বলল।

শুনে সে ভ্রূকুটি করল। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, 'না।'

'তবে ?'

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এটা একটা দৌড়বাজ পাগলা ঘোড়ার মত।' লোকটা একটু ভারিক্কী গলায় বলতে লাগল। 'এর ওপর একবার যে চেপে বসে তাকে ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হয়। নামতে পারবে না। নামতে গেলে চূড়ান্ত বিপদ। অর্থাৎ এই পথের জীবন শেষ।'

'অর্থাৎ পাগলা ঘোড়া আমাকে ঠিক মত ছোটাতেই হবে।' সে হাসল।

লোকটা হাসল।

'তাহলে চল নর্থ ছাব্বিশে।'

গাড়িতে বসেও সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। শারীরিক অস্বস্তি। মাথাটা যেন ক্রমশ বেশী করে চিন্ চিন্ করছে। এ্যাসপিরিন জাতীয় কিছু খাবে কিনা, ভাবল একবার। নাঃ, পরে দেখা যাবে। গাড়ি ছুটছে। মোটামুটি নির্জন রাস্তা দিয়েই এগোচ্ছে। তবু চোখে পড়ে যায় অদূরের রাস্তায় ট্রাফিক আর জনতার শ্বাসরুদ্ধ করা জটলা। যেন উইঢিপি থেকে অযুত নিযুত উই বেরিয়ে এসেছে। প্রচণ্ড ধুলো পড়া এক বর্ণাঢ্য ছবি যেন : সব কিছু ধূসর—অস্পষ্ট। এই সময় শহরে ধোঁয়াশা বেশী থাকে বলে মনে হয়। রাস্তার সারি সারি আলোগুলো কেমন ম্লান। ভোল্টেজ কি কম, না এই ধোঁয়াশার জন্য ? হঠাৎ তার রাস্তার মোড়ের হোর্ডিংটা চোখে পড়ল। ছবির একটু নিচের দিকে 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে' লেখা। তার বুক থেকে সহসা একটা গভীর শ্বাস বেরিয়ে আসতে আসতে তীর্যক হাসিতে রূপান্তরিত হল। নাঃ, সমস্যা অনেক—জটিল সব সমস্যা। ভাবা যায় না। মাথাটা তাহলে সত্যি সত্যিই ধরল। গলাটা একবার ভিজিয়ে নিলে কেমন হয়। অসহিষ্ণুভাবে ভাবল একবার। উঁহু, এখন

উচিত হবে না। ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে। দেখা যাক, আজ কতদূর গড়ায়। সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েগুলোর কি হল?'

'কোন্ মেয়েগুলো?' লোকটা প্রশ্ন করল।

প্রশ্ন শুনে সে একটু হাসল।

লোকটাও হাসল।

'তা বটে। ঐ যাদের দ্বিতীয় পর্যায় চাকরির জন্য পাঠান হল।'

'বেশ কিছু পেয়েছে, বাকী ঘুরছে।'

'পাবে?'

'সে তো তুমি জান।'

'রেজাল্ট?'

'সবাই এনট্যাঙ্গেল্ড।'

'রিপোর্ট?'

'হ্যাঁ, তৈরী।'

'কন্‌ক্রীট?'

'হ্যাঁ' বলে লোকটা ব্রিফকেস খুলতে গেল। সে বাধা দিয়ে বলল, 'এখন থাক। আমাদের ফেবারে কিনা?'

'সেন্ট পার্‌সেণ্ট।'

'থ্যাংকয়ু।'

গাড়ির গতি হঠাৎ মন্থর হয়ে এল। সে এপাশে ওপাশে তাকাল। তেমন কিছু দেখতে পেল না। গাড়ির গতি হারালে তার ভীষণ খারাপ লাগে। সে ভ্রূ কোঁচকালো। গাড়ি আবার ছুটতে লাগল। হয়তো রাস্তায় বড় রকমের কোন গাড্ডা ছিল। নাঃ, শহরের রাস্তাগুলো সত্যিই একেবারে গেছে! 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে' মনে পড়তে সে উত্তেজিত হল। তবু নিকথায় সময় কাটতে লাগল।

'এসমস্যা মেটানো যায় না?' লোকটা আত্মগতভাবেই যেন জিজ্ঞেস করল।

'কোনটা।'

'এই যে সকাল থেকে গ্রুপ গ্রুপ নিয়ে বসছ।'

,চেষ্টা তো করছি।'

'তার মানে, পাগলা ঘোড়া ছুটবে।'

'ছুটবে।'

'সমস্যা।'

'সমস্যা তো থাকবেই।'

'কোন কাজের কাজ তো হচ্ছে না।'

'তাই তো দেখছি।'

'এর থেকে কি কোন মতেই বেরিয়ে আসা যায় না?'

'এখনো তো আশা রাখছি।' একটু থেমে ফের বলতে লাগল, 'দেখ, এ ব্যাপারটা দাঁড়ি পাল্লায় মেপে সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়ার জিনিস নয়। তাহলে সমস্যা মিটে যেত অনেক আগেই। দেখ, মানুষের মন আর ঈর্ষার গতি বড় বিচিত্র। কোথাও যেন তৃপ্তি নেই। তৃপ্তি পেতে জানে না। এই তোমাকেই যদি বলি, মাত্র এক মিনিট মন কনসেনট্রেটেড্ করে যদি ভগবানের কাছে তুমি কিছু চাও তো পাবে। দেখবে, তুমি পারছ না। প্রথমে যত চাইবে বলে ভাববে, পরক্ষণেই চিন্তা করবে, যখন পাবই তখন আরো একটু বেশী চাইনা কেন।' বলে অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগল।

লোকটা নীরবে শুনে যাচ্ছিল। উত্তরে সন্তুষ্ট হল কিনা বোঝা গেল না। স্থির দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

'পরের সেট্ রেডি করেছ?' সে আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল।

লোকটা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'কোনটা?' পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। তারপর একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'এবার বিলির ভার কাদের হাতে দেবে?'

সে একটু হাসল। চুপ করে রইল একটুক্ষণ। পরে বলল, 'যাদের নিয়ে এতক্ষণ কাটিয়ে এলাম, তাদের।'

'তার মানে, আবার সমস্যা।'

'দেখা যাক।'

লোকটা চুপ করে রইল। তার মুখটা হঠাৎ ভারী হয়ে এল। পরে ধীরে ধীর ভাবলেশহীন হল।

সে একবার আড় চোখে লোকটার দিকে তাকাল। মনে মনে হাসল। কোন কথা বলল না।

এবারে সত্যিই মাথাটা ধরেছে। সে রাস্তার দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইল। কোন কিছুই যেন সে দেখছে না। শুধু কতগুলো চিন্তা গুটি গুটি যেন এগিয়ে আসতে চাইছে তার দিকে। উপায় নেই, ওরা আসবেই। শুধু সমস্যা আর সমস্যা। নাঃ, সমস্যা তো থাকবেই। এত বড় একটা ব্যাপার। যখন বছরের পর বছর চলতে হবে চালাতে হবে। কিন্তু কতদিন? আবার তার ঘটনাটার কথা মমে পড়ল: সেই ছেলেবেলাকার গুণিন। সে অবাক হল, আজ কেন বার বার তার এই গল্পটা ঘুরে ফিরে মনে আসছে। সেও কি ঐ গল্পের অবস্থায় ক্রমশ এগিয়ে আসছে। না, আর ঐসব ভাববে না। সে জোর করে এই ভাবনাটা ভুলবার জন্য আজকের ঘটনাগুলোর বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে লাগল।

সে ঘড়ি দেখল, পৌনে নয়। এখনো কোন সমাধানে পৌঁছানো যায়নি। গণ্ডগোল সমানে চলেছে। অভিযোগ আর তার পাল্টা অভিযোগ। সে থমথমে মুখে এক গ্লাস জল চাইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জল এসে গেল। দুটো ট্যাবলেট সে খেয়ে নিল। একজন উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?' সে একটু উঁচু গলায় বলল, 'মাথা ধরেছে।'

হঠাৎ ঘরে সাময়িক নীরবতা নেমে এল। সে ক্ষণিকের জন্য। এবার সে মুখ খুলল, 'দেখুন, আপনাদের সব অভিযোগ অনুযোগ শুনলাম। আমি এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোন নৈরাজ্য আসতে দেব না। আপনারা যেভাবে যা যা অনুযোগ করলেন বা করছেন তারাও ঠিক সেইভাবে একই জিনিস করছেন। আমার কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই। এটা আমি জোরের সঙ্গেই বলছি।'

'আহা আহা মধু মধু' একটা চাপা ধ্বনি উঠল ঘরের উত্তর দিকের কোণ থেকে। বাধা পেয়ে সে একটু থামল। যেন কিছু হয়নি এইভাবে আবার

আরম্ভ করল সে, 'তবু সন্দেহের বশে আমার ওপর মিথ্যা দোষারোপ করছেন। আমার কাছে আপনারা সবাই সমান প্রয়োজনীয়। আমরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। একথা মনে রাখা দরকার আমরা একত্রিত হয়েছি বা হতে পেরেছি আত্মকলহ আত্মহননের জন্য নয়—কাজের অঙ্গীকারে। আমাদের সামনে এখন অনেক—অনেক কাজ। একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শ আমাদের সামনে আছে। সেইটাই আমাদের বড় পাথেয়।'

'আদর্শ! তাই নাকি? টুপি পরানো? বটে বটে।' কোথা থেকে যেন কিছু লোক ব্যঙ্গভরে বলল। প্রথমে একটু চাপা হাসাহাসি, পরে একটা চাপা গুঞ্জনে হঠাৎ হলঘরটা ভরে গেল।

সে আবার আরম্ভ করল—আরো গম্ভীর গলায়, 'নিজেরা যদি ধ্বংস হতে না চান তবে নিজেরাই নিজেদের ফয়সালা করে নিন। সময় কিন্তু বেশী নেই। কাজ কিন্তু অনেক। আত্মকলহ স্বার্থ সব ভুলে যান। আমাদের প্রবল প্রতিপক্ষের হাত শক্ত করবেন না। ভালভাবেই জানেন আপনারা কত রক্ত অশ্রু আর ঘামের বিনিময়ে আমরা আজ বর্তমান অবস্থায় আসতে পেরেছি। এ সুযোগ চলে গেলে—ভাবা যায় না, কি দিন আসবে। হয়তো সে সব দিন বড় ভয়ঙ্কর হবে। সেই প্রবল বাধা অতিক্রম করে আর আমরা একত্রিত হতে পারব কি? ইট্ উইল বি ইমপসিবল্ টু এনাইহিলেট্ দ্য বেরিয়ার। আই'ম নট্ থে্রটেনিং য়্যু বাট…।' সে উত্তেজনায় অসন্তোষে অনর্গল ইংরাজীতে বলে যেতে লাগল; যার মূল কথা হল সাবধান—সাবধান।

শেষে এক সময় সে থামল। একটু হাঁপাতে লাগল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। গলা শুকিয়ে গেছে। এখন আর সাদা জল খাবে না। এখনি বেরিয়ে পড়তে হবে।

'কিন্তু আমাদের মূল অভিযোগের কি হল?' একজন অসহিষ্ণুভাবে দাঁড়িয়ে বলল।

শুনে সে ভ্রূ কোঁচকাল। রাগতভাবে বলল, 'কি অভিযোগ? আমি এতক্ষণ কি বললাম তবে? আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো দেখবেন? আমার কাছে কনক্রীট্ আছে।'

অভিযোগকারী একটু সময়ের জন্য সঙ্কুচিত হল। তারপরই উদ্ধত ভাবে বলল, ওদেরগুলোও আমাদের কাছে আছে—কন্‌ক্রীট।'

'হ্যাঁ, আমার কাছেও আছে। তার জন্যই বলছিলাম, মিটিয়ে ফেলুন। ওতে কোন লাভ নেই। দু'পক্ষের প্রতিনিধি স্থানীয়রা বসুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি যতটা পারি সাহায্য করব।'

'এর আগেও তো কতবার হয়েছে।'

'আবার দেখুন।' সে উঠে দাঁড়াল। তারপর তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল। ততক্ষণে লোকটা ব্রীফ কেস হাতে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

গাড়িতে গা এলিয়ে দিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কেমন বললাম?'

'সেই পুরোণ কায়দাই নিতে হল।'

'কোনটা?'

'সেই দ্রুত ইংরাজীতে বলা।'

'নাহলে এখনো ওখান থেকে বেরুতে পারতাম না। যুক্তি তর্ক চলত।'

দু'জনে নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

গাড়ি ছুটছে। রাস্তা বেশ ফাঁকা। দূরে কুয়াশা বেশ ঘন দেখাচ্ছে—কেমন নীলচে সাদা।

'অনেকে বলছিল, তারা সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছে না কোথাও।' লোকটা ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'মনে হয় তাদের পেছনে নাকি সর্বক্ষণ গোয়েন্দা ঘুরছে।'

লোকটা ম্লান হাসল। সে-ও ওর দিকে একবার আড়চোখে তাকাল। পরে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। তার আবার সেই গল্পটার কথা মনে পড়ল: সেই গুণিন। না, সে কিছুতেই ওটা আর মনে করবে না। 'রাত অনেক হয়েছে। আমাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি তোমাকে পৌঁছে দেবে।'

শরীরটা এখন বেশ হাল্কা বোধ করছে সে। একটু গরম বোধ হচ্ছে। শালখানা খুলে ফেলল। আয়েশ করে যতটা সম্ভব পা শিথিল করে রিল্যাক্স

করতে লাগল। সারাদিনের ঘটনাগুলো পর পর মনে করবার চেষ্টা করল। না, ভাববার কথা ; কিন্তু ভয় পাওয়ার মত এখনো কিছু হয়নি বোধ হয়। অনেকবারই তো এ রকম পরিস্থিতি হয়েছে। এবার কি সত্যিই এ্যাকিউট্? ভাবতে ভাবতে সে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগল।······ছেলেবেলা কি ডানপিটেই না ছিল সে! বাড়ির কি কড়া শাসন! তবু তাকে দমাতে পারেনি। সে একা একা ঘুরে বেড়াত রাস্তাঘাটে, নদীর পারে পারে। একদিন ঐ নদীর পারেই দেখেছিল এক সাপে কাটা মানুষকে। একজন ওঝা মানুষটাকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কয়েকজন তাকে সাহায্য করছে। মানুষটার পায়ে—হাঁটুর ওপরে দুটো বাঁধন। ওঝা একখানা গামছা মোটা করে ভাঁজ করে মানুষটার মাথায় সমানে বাড়ি দিয়ে চলেছে আর মুখে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে এবং মাঝে মাঝে সর্বাঙ্গে ফুঁ দিচ্ছে। কতক্ষণ পরে কে জানে মানুষটা চোখ মেলল এক সময়। আরো কিছুক্ষণ পরিচর্যার পর মানুষটাকে এক বাটি গরম কি খাওয়ান হল। তারপর তার বাড়ির লোকজন মানুষটাকে নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে তারা ওঝাকে শ্রদ্ধা জানাল, তাঁর কিছু নির্দেশ নিল। সেই সময় ওঝাকে বড় সৌম দেখাচ্ছিল। উপস্থিত সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখছিল। নানা প্রশ্ন করছিল ওকে। ও সহাস্য মুখে জবাব দিচ্ছিল। এক সময় কি একটা প্রশ্নে ওঝা বলতে লাগল, 'সব সময় বেঁচেও বাঁচে না। আমি তা দেখেছি। আমার যে গুণিন, তিনি দেখিয়ে ছিলেন। একদিন ছইয়ের বাইরে রান্না করছি আর গুণিন গলুইয়ে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলাম একটা ভেলা মাঝ নদী দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। ভেলায় মশারী খাটানো। বুঝলাম, সাপে কাটা মড়া যাচ্ছে। আমি গুণিনকে বললাম, বাঁচান। গুণিন অনেকক্ষণ ভেলাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে বললেন, বাঁচবে নারে। আমি পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম, কত আশা করে ভেলা ভাসিয়েছে বাড়ির লোকজন। শেষে উনি রাজী হলেন।

আমি একটা ডিঙ্গি নিয়ে ভেলাটা নিয়ে এলাম। গুরু চেষ্টা শুরু করলেন। কয়েক ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রমের পর লোকটা চোখ মেলল। আমি আনন্দে ডগমগ ; কিন্তু গুণিন কোন কথা বললেন না। লোকটাকে যখন

পুরোপুরি সুস্থ মনে হল ; গুণিন তাকে একটা টাকা দিয়ে বললেন, যাও ঐ দোকান থেকে সওদা নিয়ে এস। লোকটা চলে যেতে আমি বললাম, ওকে পাঠালেন কেন ? আমি তো ছিলাম। বললেন, যাক না ও। খেতে তো হবে। এক সময় লোকটা নৌকায় ফিরে এল। গুণিন ওর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমার যেন মনে হল, লোকটা বেঁচে আছে বটে ; কিন্তু চোখ দুটো তো মড়ার।

কত খরচ করলা ? গুণিন জিজ্ঞাসা করলেন।

সব খরচ হয়ে গেল।

ষোল আনা ?

লোকটা মাথা নাড়ল।

আচ্ছা বিশ্রাম কর। বলতেই লোকটা গিয়ে ছইয়ের নিয়ে বসল। আমরা আমাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। পরে সন্ধ্যায় খাবার সময় তাকে ডাকতে গিয়ে দেখি, সে মরে পড়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি ডাকলাম, গুণিন !

কি ?

লোকটা মারা গেছে।

হুঁ।

মরল কেন ?

ওর ষোল আনাই খরচ হয়ে গেছিল। তোকে বললাম না, ও বাঁচবে না।'

...আচ্ছন্ন ভাবটা তার হঠাৎ কেটে গেল। বিষণ্ণভাবে কিছুক্ষণ বসে রইল। যে গল্পটা সে বারবার ভুলবার চেষ্টা করছে, সেইটাই যে কেন ঘুরে ফিরে মনে পড়ছে ; আশ্চর্য ! সে বড় বিষণ্ণ—বিপন্ন বোধ করল। উঠে দাঁড়াল। পায়চারি শুরু করল। প্রশস্ত ঘর। প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে অশান্তভাবে একটু দ্রুত। নাঃ, কিছুতে স্থির থাকতে পারছে না। সব কিছু গুছিয়ে এনেও গোছাতে পারছে না। ছিটিয়ে ছড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে যাবে সব। সে এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। ঘড়িটা একবার দেখল।

গভীর রাত। তবু একের পর এক ডায়েল করে যেতে লাগল। কথাবার্তা চলল। কখনো কখনো একটানা. কখনো বা খাপছাড়া ভাবে।

'আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।'

'......'

'তবে? আমি কাউকে রেয়াৎ করব না।'

'..... '

'যদি বল, ঠিক তাই। তোমরা যত সব নোংরামি করবে আর আমি—'

'......'

'কি বললে? আমি শিখিয়েছি?'

'......'

'এই স্পর্ধা পেলে কোথা থেকে?'

'......'

'ওটা আমাকে শিখিয়ো না। একটা মিনিমাম সততা সবার থাকা উচিত।'

'......'

'কি বললে, আমার?' সে রিসিভারটা সক্রোধে ক্রেডেলের উপর রাখল।

অসন্তোষ ক্রমশ বেড়ে চলল। সে আবার পায়চারি শুরু করল।

তারপর কিছুটা যেন ক্লান্তভাবে একখানা বিরাট ছবির সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। এই ছবিখানার কাছে এসে কখনো সখনো সে দাঁড়ায়। কশ্চিৎ কদাচিৎ। যদি অলস অবসর মেলে। তার কেন জানি ভাল লাগে। সে সাহস সঞ্চয় করতে, বল পেতে চায়।—রথের ওপর দাঁড়িয়ে অর্জুন শর যোজনা করছেন, আর কৃষ্ণ এক হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে তাঁর দিকে তাকিয়ে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। এই সেই অর্জুন—অক্লান্ত-কর্মা। মহাভারতের একমাত্র পুরুষ। লক্ষ, তাঁর এক। শুধু পাখির চোখই দেখেছিলেন। অর্থাৎ লক্ষ্যের মূল বিন্দু। যা করবেন স্থির করে ছিলেন, তাই করেছেন। কোন বাধা মানেন নি। 'তুমি আমার আরাধ্য দেবতা।'

সে ফিসফিস করে মন্ত্রোচ্চারের মত বলতে লাগল। স্থির দৃষ্টিতে ছবিখানা দেখতে লাগল।……তেজোদ্দীপ্ত ঘোড়াগুলো অসম্ভব চঞ্চল হয়ে উঠল। যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে না। কমলপত্রাক্ষ সহসা তার দিকে সহাস্য মুখে তাকাল। আয়তলোচনে কিছুক্ষণ চোখের ওপর চোখ রাখল। তৃতীয় পাণ্ডব এখনো স্থির অচঞ্চল দাঁড়িয়ে। 'ফাল্গুনি কেন তোমার আরাধ্য দেবতা ?'

'মহাভারতের অজেয় পুরুষ। অক্লান্ত-কর্মা। আদর্শ পুরুষ।'

'একনিষ্ঠ সাধনা, স্বার্থত্যাগই হেতু। তোমার ?'

'সম্ভবত আছে।'

'দ্বিধান্বিত হৃদয় কিছুই দেয় না। অথবা মিথ্যার অভিব্যক্তি মাত্র।'

'এর স্পষ্ট আর কিছু বলা যায় না।'

'অতএব প্রাকৃত জন মাত্র।'

'অবলম্বন চেয়েছি।'

'মননে আচরণে অভিন্ন ? সততা নিষ্ঠা স্বার্থশূন্যতা ?'

সে বিহ্বল চোখে তাকাল। উত্তর খুঁজতে লাগল। কোথাও সে উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না।

'তোমার নির্মোক দূর হোক। স্বধর্মে রূপান্তরিত হও।'

রথ দুরন্ত গতিতে দিগন্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। সে নিমেষনীহিতে দেখতে লাগল। রথ ক্রমশ ক্ষুদ্র হতে হতে একটি কৃষ্ণ বিন্দুতে পবিণত হয়ে ঈষৎ কাঁপতে লাগল। থরথর করে নিরন্তর কাঁপছে। এক সময় কম্পিত কৃষ্ণবিন্দু আবার বড় হতে লাগল। ক্রমশ বড় হচ্ছে এবং ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সে আগ্রহ বোধ করল। চারিদিকে একবার তাকাল। দেখল, সে এবার একা নয়। তার অনুগত লোকজন তাকে ঘিরে সশস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে। সে অবাক হল, আশ্বস্ত হল। বহু রথ আর শকট এগিয়ে আসতে লাগল, সে-সব রথ ও শকট অত্যুত্তমা সালঙ্কারা নারী আর শিশুতে পূর্ণ। অতএব সুদিন। সে এগিয়ে গেল।

'কি পরিচয় তোমাদের, দাঁড়াও।' একটি পুরুষের বজ্রকণ্ঠ।

'কি প্রয়োজন। তবু বলছি, আভীর। আমি আভীর প্রধান।'

'পথ রোধ করেছ কেন?'

'যুদ্ধ দাও।'

'জান আমি কে?' বজ্রকণ্ঠ ঈষৎ হাস্য করল।

'জানি, তুমি তৃতীয় পাণ্ডব।'

ততক্ষণে চারিদিকে কোলাহল শুরু হয়ে গেছে নারী শিশুর সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে। নারী রত্ন লুণ্ঠিত হতে লাগল দ্রুত গতিতে। কিছু নারী স্বেচ্ছায় এগিয়ে যেতে লাগল।

অর্জুনের গাণ্ডীবে জ্যা পরাতে বড় কষ্ট বোধ হতে লাগল। শর সন্ধান করতে গিয়ে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কোন দিব্যাস্ত্র তাঁর মনে পড়ল না! তবু নিরন্তর শর বর্ষণ করতে লাগলেন। এক সময় তূণও শূন্য হল। ততক্ষণে আভীররা অনেক বৃষ্ণি অন্ধক নারী নিয়ে চলে গেছে। তিনিও বাকী শিশু নারী নিয়ে গন্তব্য পথে চললেন।

'সে চীৎকার করে উঠল, 'দাঁড়াও সব।'

সবাই তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'তোমরা এইভাবে নারী আর ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করলে কেন?'

'আপনার সঙ্গের নারীরা আর ঐশ্বর্য এলো কোথা থেকে?'

'এরা স্বেচ্ছায় এসেছে। ঐশ্বর্য উপঢৌকন পেয়েছি।'

'আমাদের এ সবও তাই। কিছু সংখ্যক বা জোর করে। কেননা, নারী ঐশ্বর্য জমি বীর ভোগ্য।'

সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।···তার চোখ জ্বালা করছে। গলার ভেতরটা যেন ক্রমশ শুকিয়ে আসছে। ঈষৎ শরীর কাঁপছে। সে বিহ্বলের মত এখনো ছবির দিকে তাকিয়ে। কালের নিয়মে দিন-রাত্রির পরিণতি এক? তাহলে গুণনির ষোল আনাই খরচ হয়ে গেল!!

একে একে ওরা সবাই চলে গেল! সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসার পর যে শব্দ ও কোলাহল ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, এই একটু আগে তা চরমে উঠে হঠাৎ যেন সব স্তব্ধ হয়ে গেল। কোন কিছু স্থায়িত্ব পেল না। সেই তখন থেকে এই সম্মিলিত হাসি-ঠাট্টা কোলাহল একটা বহুব্যবহার-সিদ্ধ সুচতুর প্রয়োগ বলে মনে হচ্ছিল তার। যেগুলোর বহুদিন অব্যবহারের মরচে এই সুযোগে ঘষেমেজে নিল যে যার মত। কোথাও যেন প্রাণের স্পন্দন পেল না। অথচ এরজন্য কোনো বেদনা বোধ হচ্ছে না তার। শুধু একটা ভাবনা ঘুরেফিরে তাকে স্বস্তির আশ্বাস দিচ্ছিল: দায় শেষ হল!

তারা কলকাতা থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিল। তখন ভরা দুপুর। চারিদিকের উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। এত আলোয়, এত উত্তাপে দূরের কোন জিনিস তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না। চারিদিকে শুধু যেন লক্ষ লক্ষ স্বচ্ছ শিখা নাচতে নাচতে অনন্ত আলো-আতপের উৎসের দিকে উঠে যাচ্ছে। ঘাম আজ কম হচ্ছে। লোকাল ট্রেনটা যত ছুটছে, বাইরের হাওয়া তত তার চোখে মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। মনে হল তার, জানালার কাছে বসা ভুল হয়েছে।

স্টেশনে নেমে সে হাঁফ ছাড়ল। চারিদিকে একবার ভাল করে তাকাল। অনুরাধার চোখ মুখ ভাবলেশহীন। ধীরেসুস্থে ওভার ব্রীজ পেরিয়ে একটা রিক্শা নিল। সে ভাবতে লাগল, অমূল্য ইলা ইত্যাদি ওরা কেন আমাদের সঙ্গে এল না। ভাল হত এলে। অনুরাধা সেই যে কখন কি কথা বলেছে, তারপর থেকে একেবারে চুপ। ওরা থাকলে অন্তত এই অস্বস্তিকর নি-কথায় কাটত না। ঝাঁঝাঁ রোদ আর খাঁখাঁ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পড়ে থাকা সোজা রাস্তাটার মত তপ্ত নিরুপায় মনে হচ্ছিল। হাওয়ায় হাওয়ায়

রিক্‌শাওয়ালার ঘামের গন্ধ আরো বিরক্ত নির্জীব করে দিচ্ছিল তাকে। অনুরাধা নির্বিকার। সামনের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে। অথচ তার চোখ জ্বালা করছিল তাকিয়ে থাকতে। কি দরকার ছিল এমন তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসার। অনায়াসে সমস্ত পাট চুকিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে রাতে বাড়ি ফেরা যেত চমৎকার। তারপর, তারপর কত—কত সুন্দর হত!

বিকেল হতে একটা জোলো পুবেল হাওয়া দিচ্ছিল। বাতাসে ভিজে ভিজে বাদলার গন্ধ। কিন্তু ঘরের ভেতর ভ্যাপসা গরম। মনে হচ্ছে, বেশ বৃষ্টি হবে। দুপুরের আকাশ নির্মেঘ ছিল। বিকেল হতে ঈশান কোণে যেন একটু একটু কালো মেঘ জমতে শুরু করে দিয়েছিল। পড়ন্ত বিকেলে শেষ রোদের ছটায় রক্তিম হয়ে টানা পুব দিকের অনেকটা পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়ে যেন গুড়িগুড়ি এগিয়ে আসছিল মেঘ। পুবে বাগানের বিরাট আম-গাছটার শুধু পাতাগুলো থর থর করে কাঁপছিল। আর তার সামনে ন্যাড়া সজনে গাছটা গোটা কয়েক ফেটে-যাওয়া শুকনো সজনে ডাঁটা প্রেতের মত নাড়ছিল। অনেক অবকাশ থাকলেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার কোন ইচ্ছা হচ্ছিল না তার। অনুরাধা ঠায় ঠাকুরের কাছে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেক পদক্ষেপে নির্দেশ দিচ্ছে। সে এক মুহূর্ত দেখল ঐ ঋজু দেহখানা। খোঁপা ভেঙ্গে ঘাড় পর্যন্ত পড়ায় গ্রীবা সবল মনে হচ্ছিল। একটু ঝুঁকে থাকায় মুখ পুরো দেখা যাচ্ছিল না; কিন্তু নাক তির্যক তীক্ষ্ণভাবে কিছুটা এগিয়ে ছিল। মনে হল তার, অনুরাধা যেন বহুকাল ধরে এই সংসারের দায়দায়িত্ব নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। আজই যে সে প্রথম পাকা-পাকি এসেছে, দেখে যেন মনে হয় না। তার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অনুরাধাকে নিয়ে একটা কল্পনা তার মনে তোলপাড় করে আসতেই, তা জোর করে সরিয়ে দিল। পরে হাসল।

এক সঙ্গে গোটা কয়েক হাঁস তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। তার আবার হাঁস মুরগীগুলোর কথা মনে পড়ল। আজ আর ওদের দিকে তেমন নজর দিতে পারেনি। খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু হলেও তো কোন উপায় ছিল না। অবশ্য হরিকে বলে গিয়েছিল ওদের দেখাশুনো করবার জন্য। গমের গুঁড়ো, শুকনো মাছের বা শাঁখের গুঁড়ো কোথায় কি আছে, হরির তো সব জানা। এ সময় ম্যাশ থাকলে কোন ঝামেলা ছিল না। কতদূর কি

করেছে হরি কে জানে। মন থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিতে চাইল সে। কিন্তু ঘুরে ফিরে ওদের কথাই যেন চেপে মনের মধ্যে বসতে চাইল।

এই হাঁস মুরগী নিয়েই তার এতদিন কাটল। বেশ কাটছিল। তার শিক্ষকতার সঙ্গে এই প্রতিপালকতার কোন বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছিল না। শূন্য সময়ের পূর্ণতা এনে দিয়েছিল। এই পূর্ণতার আশায় সে হাঁস মুরগী প্রতিপালন করেনি, করেছিল ব্যবসার জন্য। কিন্তু কতদূর কি হল! এই এত বয়স অব্দি শুধু বৃত্তির ধাঁধায় ঘুরে মরল। শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষকতা আর পশুপালন। সাংসারিক জীবনের অন্য কোন কিছুতে ঢুকতে আর সাহস হল না। অর্থমনর্থম্! ভাবতে ভাবতে সে বাগানের দিকে পা বাড়াল।

"কোথায় যাচ্ছ?"

প্রশ্ন শুনে সে যেন চমকে উঠল। অনুরাধা হাসছে। দু'জনের চোখাচোখি তাকাতে কেমন যেন লজ্জা লাগল। বলল সে, "বাগানে যাচ্ছি। হাঁস মুরগীগুলোর—"

"হরি তো সব কিছু—"

"তবু একবার—; যা শেয়ালের উপদ্রব! একটু অসাবধান হলে আর—"

"বাকি কাজগুলো সেরে রাখলে ভাল হত না? ওরা তো একটু বাদে—"

"সন্ধ্যাও তো হয়নি।"

"সন্ধ্যা হয়েছে।"

"এই আলো থাকতে থাকতে—"

"আজ থাক। বরং তুমি তৈরী হয়ে নাও।"

সে একটু হেসে সরে এল সেখান থেকে। আজকার দিনে অন্য সব কাজ ফেলে রাখা ভাল বোধ হয়। ভাবতে চাইল অন্তত আর বছর কুড়ি আগে আজকার এই দিন যদি আসত, তবে মা বাবা আরো অনেকে থাকতেন। তখন সে এই দিনে কি করত এবং অনুরাধাই বা কি রকম থাকত—! হঠাৎ হাসি পেল তার। ভাবল, জ্যাঠাইমার যদি গোঁফ থাকত। কুড়ি বছর আগেই যদি সব কিছু হত আজকার ঘটনাই বা ঘটত কি করে। ঘরে এসে সে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। ঘরের কোণে কোণে অন্ধকার

ক্রমশ দানা বেঁধে উঠে সমস্ত ঘরখানার দিকে ময়ালের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। আলো জ্বালবে কিনা ভাবল। আলোটা জ্বালানো উচিত। কিন্তু তার আলো জ্বালতে ইচ্ছা করছিল না। এই সান্ধ্য-অন্ধকার তাকে একটা মোলায়েম স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ এনে দিচ্ছিল। এই অন্ধকারই ভাল লাগছে।

বড্ড গরম। পাখার হাওয়াতেও তেমন কাজ হচ্ছিল না। এই এক বস্তা জামাটামা খুলে বসতে পারলে ভাল হত। এই মুহূর্তে সে ভীষণ বিরক্ত বোধ করল অনুরাধার ওপর। বিরক্ত বোধ করল ওর এই অহেতুক ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নেওয়ার জন্য। তিনজন আর পাঁচজন—এই আট; আর তারা দু'জন এই তো ছিল সবসুদ্ধ। একটা ভাল রেস্তোরাঁয় ঢুকে এই আট-দশজন খেয়েদেয়ে হাসিঠাট্টা করে দায় চুকানো যেত অনায়াসে। আরে, আসল পাট চুকলো যখন ম্যারেজ অফিসারের কাছে বসেই, তখন আর নিমন্ত্রণ করে বাড়ি ডেকে এনে খাওয়ালে কি আশ মিটবে! কথাটা ভেবে হঠাৎ মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। ঘরের ঘোলাটে অন্ধকার আরো ঘোলাটে হয়ে এসেছে। সে অনেকটা নির্বোধের মত তাকিয়ে থেকে অন্ধকার সারাৎসার হওয়ার ক্রমপরিণতি দেখতে লাগল।

"একি, ঘর অন্ধকার করে বসে আছ?"

বলে সে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। কিছুটা বিরক্তি ও অনুসন্ধিৎসার চোখ নিয়ে অনুরাধা তার দিকে তাকাল। পরে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, "গুম্ হয়ে বসে অত কি ভাবছ? হাঁস মুরগীগুলোকে একবার দেখতে যাবে? মন খারাপ না করে বরং যাও একবার।"

"ঠাট্টা করছ। বহুদিন ওদের পুষছি। প্রতিপালক প্রায় পিতার মত।"

অনুরাধা এবার হেসে ফেলল। কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, "ওদের মা হওয়া আমার হয়তো নাও সহ্য হতে পারে। সে যাক, ওরা সবাই হয়তো এখুনি এসে যাবে। আলোটালো নিবিয়ে আবার চুপচাপ বসে থেকো না।" অনুরাধা বেরিয়ে গেল।

'মা হওয়া' কথাটা ভাবতে গিয়ে সে কৌতুক বোধ করল। ভাবল, সহ্য

না করতে পারারই কথা। অনেকদিন আগে থেকেই তো বলছিল, "ওগুলো ঘরবাড়ি তো ভীষণ নোংরা করে।" উত্তরে সে বলেছিল, "করে, তবে ওদের ব্যবস্থাও তো আলাদা।

"আপনার ঘেন্না করে না?"

"না।"

"প্রথম প্রথমও করত না?"

"না।"

উত্তর শুনে অনুরাধার মুখ প্রসন্ন হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল না। চুপ করে থেকে ও নোংরার পরিমাণ উপলব্ধি করছিল, না নীরব প্রতিবাদ করছিল, বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ পরে বলল, "আপনার খারাপ না লাগলে আর বলার কি আছে।" শুনে সে শুধু হেসেছিল।

সেদিন থেকে সে হাঁস-মুরগী সম্বন্ধে অনুরাধার মনোভাব বুঝতে পেরেছিল। যদিও অনুরাধা মুখে আর কিছু বলেনি। বরং কোন কোনদিন 'রানওয়ের' কাছে গিয়ে কোন মুরগী বা মোরগের প্রশংসা করেছে। বিস্ময় প্রকাশ করেছে। ওদের জাত কুল দেশ জানতে চেয়েছে :

"ঐ কালো কালো মুরগীগুলোর কি নাম? কি বিশ্রী দেখতে!"

"ব্লাক্ অস্টার্লো। অস্ট্রেলিয়া থেকে কথাটা এসেছে হয়তো।"

"আর লালগুলো?"

"রোড আইল্যাণ্ড। আর ঐ যে কোণের ঘরটায়, ওগুলো দেশীর সঙ্গে রোড আইল্যাণ্ডের ক্রস্ ব্রীড। আমার এখানেই তৈরী।"

"ঐ মুরগী ক'টাকে কি তেল মাখিয়েছেন? কি সাদা!"

"ওগুলো মোরগ। লেগ্‌হর্ন। ঐ রকমই চকচকে। ন' দশটা মুরগীর ওরা এক একজন গার্জিয়ান।" বলে সে হাসছিল।

"ওদের ছেড়ে দেন না কেন?"

"কতগুলো বিশেষ মেথডে পুষতে হয় ওদের। ছাড়লে কি করে হবে।"

"তাই নাকি? তা আপনার কি মেথড?"

"আপনিও পোলট্রি করবেন নাকি?" সে ঠাট্টা করেছিল।

"জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

"ও।" বলে হেসেছিল সে। পরে বলেছিল, "আমার মোটামুটি ডীপলিটার সিসটেম। তবে এই পদ্ধতিতে রানওয়ে থাকে না; আমার আছে।"

যদিও সে কখনও এই আগ্রহ অনুসন্ধিৎসার ঔচিত্য নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে উৎসাহভরে উত্তর দিয়ে গেছে, তবু কি সে ততদিনে জানতে পারেনি যে অনুরাধা বেশ কিছু পরিমাণে শুচিবাইগ্রস্ত? অনেক কিছুই সে ঘৃণার চোখে, বিতৃষ্ণার চোখে দেখে। যা একজন শিক্ষিতার সম্বন্ধে ভাবতে গেলে অস্বস্তি লাগে।

হঠাৎ এক দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে এসে ঢুকল। পাখা আরো জোরে শোঁ শাঁ করে উঠল। সে একটু আরাম বোধ করল। হয়ত আর কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি নামবে। সে একটা সিগারেট ধরাল। আয়েস করে টানতে লাগল। ভাবল, বৃষ্টি নামলে ভাল হয়। তা না হলে এই ভ্যাপসা গরম—অসহ্য!

মাসখানেক আগের কথা মনে পড়ল তার। ঝাঁঝাঁ রোদ মাথায় করে নিয়ে হাজির হয়েছিল অনুরাধার বাড়ি। ওর ছোট বোন দরজা খুলে তাকে দেখে সবিস্ময়ে হেসে বলল, "হঠাৎ এই সময় আপনি?"

"কেন, অসুবিধা আছে?"

"অন্তত আমার নেই।"

"তুমি সেজেগুজে এখন কোথায় চললে?"

"ডিউটিতে।"

"এই সময়?"

"হ্যাঁ।"

"আমার মনে ছিল না।" সে হাসবার ভান করল। "তোমার দিদি আছে?"

"কি জানি, আজ তো যায়নি স্কুলে।" বলে দুষ্টুর মত হাসল।

"ডেকে দাও।"

"একটু দেরী হবে।"

"কেন ?"

"বাথরুমে ঢুকেছে।" বলে হাসতে লাগল।

"তাতে দেরী হবে কেন ?"

"হবে। প্রথম দেখবে, জলে কোন ধুলো নোংরা পড়েছে কিনা। পড়ে থাকলে সেগুলো বাছবে, সম্ভব হলে ছেঁকে নেবে। তারপর বাথরুম ধুয়েটুয়ে নিয়ে তবে তো স্নান করবে।"

"ইয়ার্কি রেখে খবর দাও।"

ও ঘুরে এসে বলল, "দিদিকে বলেছি। আপনি বসুন। আমার সময় নেই—চললাম।" বলে না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

অদ্ভুত সংসার! সে ভাবল এক বোন শিক্ষিকা, আর একজন নার্স। মা নেই, বাবা নেই। এক ভাই নাকি আছে; বাংলার বাইরে কোথায় কি যেন চাকরি করে। বিশেষ সম্পর্ক আছে বলেও মনে হয় না। আর কোন আত্মীয়-স্বজন আছে কিনা কে জানে। তার এই সব ভাবতে ভাল লাগছিল না। আর তা ছাড়া তার অসহ্য লাগছিল এইভাবে চুপচাপ বসে থাকতে। অনুরাধা কি শুনেও একটু তাড়াতাড়ি করতে পারে না! বাইরের চৈত্রের অশান্ত হাওয়া মাঝে মাঝে খড়কুটো ধুলোবালি নিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে পরে ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ছে; আর জ্বরো রোগীর তপ্ত নিঃশ্বাসের মত তার গায়ে পড়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। এই সময় অনুরাধাকে মূর্খ বলে মনে হতে লাগল।

এক সময় অনুরাধা হাসি মুখে ঘরে ঢুকল। সদ্যস্নাত শরীর ও চুল থেকে তেল-সাবানের ঈষৎ মিষ্টি গন্ধ আসছিল। তার অশান্ত মনটা দপ করে শান্ত হয়ে গেল। সে অনুরাধার মুখের দিকে তাকাল। বড় ভাল লাগছিল তার।

"ওভাবে তাকাবার বয়স নেই আর।" অনুরাধা হাসতে লাগল।

"ভাল লাগাটা বয়সনিরপেক্ষ।"

"কি জন্য আজ থাকতে বললে।"

"এই ফর্মটার জন্য।" বলে সে পকেট থেকে একটা ছাপানো কাগজ বার করল।

"কিসের ফর্ম ?" জিজ্ঞাসা করে অনুরাধা হাত বাড়াল।

'মাসখানেক আগে ম্যারেজ অফিসারকে ইন্টিমেশান দিতে হয়। এটাই আইন।'

তার কথা শুনে অনুরাধার মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। একটু একটু সলজ্জ হাসতে লাগল। কেমন আড়ষ্ট কাঠ কাঠ দাঁড়িয়ে থাকল।

"ওটা ইনটেনডেড ম্যারেজ ফর্ম—অন্য কিছু নয়। সই কর।"

আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বলল, "ও-ঘরে এসো।"

পাশের ঘরের টেবিলের কাছে এসে কাগজখানা নিল অনুরাধা। চেয়ার টেনে নিয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় কি লিখব।"

সে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার জন্মের সন তারিখ লেখ।"

অনুরাধা তার মুখের দিকে তাকাল। চোখের দৃষ্টি কেমন অসহায়।

"সার্টিফিকেটে যে বয়স আছে, সেটা লেখ।"

অনুরাধা লিখতে শুরু করল। সে মনে মনে বয়সের হিসাব কষে ফেলল। একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস তার দুই ফুস্‌ফুসের মধ্য থেকে প্রবল বেগে বেরিয়ে আসতে চাইল। কেমন একটা হাঁপ বোধ করল সে। আটতিরিশ বছর দশ মাস।

অন্য সব সই শেষ করে অনুরাধা ওর দিকে তাকাল। সে হেসে বলল, "ঠিক আছে। আজই জমা দিয়ে আসব।" কথা বলতে বলতে হাত কাঁপছিল তার। অনুরাধা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে সে অনুরাধাকে সজোরে কোমর ধরে তার বুকের কাছে টেনে আনল।

"ছিঃ, এসব কি হচ্ছে!" অনুরাধা চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

সে কোন কথা না বলে নিজের বুকের ওপর অনুরাধাকে চেপে ধরে উত্তপ্ত ঠোঁট দুটো অনুরাধার ঠোঁটের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। অনুরাধা ঘাড় ঘোরাল। চুমুটা গিয়ে ঘাড়ে পড়ল। শেষে জোর করে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরল সে।

অনুরাধা কোনক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "দুটো দিন সবুর কর। কেউ তো এসেও পড়তে পারত।"

সে কোন কথা না বলে যুগপৎ অপ্রস্তুত ও বেহায়ার মত হাসতে হাসতে পাশের ঘরে চলে এল। তার পেছন পেছন অনুরাধা এল।

"এখন আসি।" সে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

"এসো।"

বাইরের প্রখর আলো ও তপ্ত হাওয়ায় এসেও সে বেশ স্বস্তি বোধ করল। মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছিল। সে হাঁটতে হাঁটতে একবার পেছন ফিরে তাকাল। তাকিয়ে তার ভীষণ খারাপ লাগল। দেখল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অনুরাধা ঘনঘন থুতু ছেটাচ্ছে, সাবধানে। দেখে তার দুঃখ হল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিল: একেবারে নতুন, তাই অস্বস্তি বোধ করছে।

এ সবের কি দরকার ছিল আর এই বয়সে এসে। বেশ তো কেটে যাচ্ছিল। বয়স পেরিয়ে অসময়ে এই ঝঞ্ঝাট। সময় থাকতে কিছু কিছু চুল-পাকা, জীবন সংগ্রামে জড়িয়ে পড়া।...আচ্ছা, ক' বছর আগেও কখনো কি ভাবতে পেরেছিল, সে বিয়ে করবে? অথবা অনুরাধার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরও কি ভাবতে পেরেছিল, এই কিছু কিছু চুল-পাকা জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত ঈষৎ রুক্ষ—শুকনো ভদ্রমহিলাকে ভালবাসবে, তাদের প্রেম হবে, বিয়ে করবে?

তাদের স্কুলে সকালে বসে মেয়েদের স্কুল। ওরা বেরিয়ে গেলে তারপর তারা ঢোকে। যাওয়া আসার পথে কতদিন ধরেই তো দেখাসাক্ষাৎ। সাধারণ আলাপ পরিচয় তো অনেকদিন ধরে। কিন্তু হঠাৎ কি করে তাদের মধ্যে প্রেম জন্ম নিল! অবাক লাগে।

অনুরাধা হঠাৎ ঘরে ঢুকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর চারিদিক একবার দেখে নিয়ে বলল, "তুমি আচ্ছা বিপদে পড়েছ দেখছি!"

সে চমকে উঠল। পরে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"আজ এখানে এসে অব্দি দেখছি, তুমি মুখ গোমড়া করে শুধু ভাবছ আর ভাবছ। কি ভাবছ অত?"

"না ঘুমোনো পর্যন্ত মন অলস থাকে না। ভাবছি যা তার না আছে মাথামুণ্ডু না আছে কিছু। তবে ভাবছি।"

"কাজ করলেই তো পার।"

"কি করব ?"

"সব প্রস্তুত। কোথায় বসে খাওয়ানো হবে তা দেখবে এসো।"

"তা তো তুমিই ঠিক করে রেখেছ। আমি আর গিয়ে কি করব ?"

"ওই ওরা আসছে মনে হয়, এসো।"

ওরা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

অমূল্য বলল, "আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও বসতে হবে। একলা ঘরে মুখোমুখি তুজনে বসে খাওয়া চলবে না। তাতে অস্বস্তিতেই পড়বে আদিত্য।"

"কেন ?" একজন জিজ্ঞেস করল।

"আরে, আগে থাকতে যতই জনপাচান থাক না কেন ; প্রথম দিন, আরে লজ্জা বলে তো একটা কথা আছে। আর একটা জিনিস : অনেক আদিমতার মধ্যে খাওয়াটাও একটা আদিম ব্যাপার। তুমি একটু লক্ষ করো সীতেশ ; খাওয়ার সময় মানুষের মুখের চেহারা কেমন হয় !"

"এ সময় এই কথা বলে ভাল করলে না অমূল্যদা।"

"তাতে কি হয়েছে। আমি তো বাবা মুখব্যাদান করে খাব।"

অনুরাধা বলল, "আমরা যদি বসি, আপনাদের পরিবেশন করবে কে ?"

"কেন আমরা তো খুব বেশী লোক নই। আপনার ঠাকুর আর ঐ লোকটি মিলে খুব পারবে।" অমূল্য বলল।

অন্য সবাই হই হই করে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানাল।

"বুঝলে আদিত্য, তুমি তো রেস্টুরেণ্টে সব কাজ সারতে চেয়েছিলে। তার চেয়ে এ ব্যবস্থা অনেক ভাল হয়েছে, যাই বল।"

"ভাল তো হল", একজন বলে উঠল, "কিন্তু খেয়াল করেছ, টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।"

"আহা জলে তো আর পড়িনি ! তবে, নামুক না বৃষ্টি মুষল ধারায়। ধরণীটা তবু শীতল হবে।"

"আর শেতল হলে জমবে ভাল।" বলে অর্থপূর্ণ চোখে সহাস্যে আদিত্যর দিকে তাকাল একজন। তাই দেখে অনুরাধা ঘাড় ঘুরিয়ে অন্য দিকে

তাকাল। না দেখবার ভান করল।

"আদিত্য. এত ভাল চাল কোত্থেকে পেলে—রেশনে?"

"না। খোলা বাজারে।"

"কত করে নিল?',

"তু' টাকা আশি।"

'বহু আয়োজন করেছেন তো অনুরাধা দেবী।'

উত্তরে অনুরাধা হাসল শুধু।

"আয়োজন যাই হোক, তুমি পেট ভরে খাও অমূল্য।" সে বলল।

"পেট আমার হলেও কি বেসামাল খাই দেখ না। বাব্বা জাতে মাস্টার। বামুন আর মাস্টার বুঝলে কিনা খাওয়ার ব্যাপারে এক।"

"ইলা দেবী আপনি কিন্তু খাওয়ার চেয়ে ভাত নাড়াচাড়া করছেন বেশী।" সীতেশ অনেকটা অনুজ্ঞার সুরে বলল।

"ওভাবে তাকিয়ে আছেন বলেই তো খেতে পারছি না।"

"অবশ্য একটু আড়াল আবডাল পেলে আপনারা বেশ সুবিধা করতে পারেন।"

"এটা কিন্তু অসভ্যতা হচ্ছে।"

"অনেক সত্যই অসভ্যতা। যাই হোক, আমি আর কিছু বলছি না। আপনি সুবিধা করুন।"

সবাই হাসতে লাগল।

এদিকে বৃষ্টি আস্তে আস্তে চেপে এল। বাইরে বেশ বিত্যুৎ চমকাচ্ছে। তু'একজন মেঘ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে বাইরে তাকাচ্ছে। সে খেতে খেতে হাঁসমুরগীগুলোর কথাই বার বার ভাবতে লাগল। ওদের একবার দেখে আসতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কি আর করা—উপায় নেই।

অমূল্য সীতেশ ও অন্যরা গাল-গল্প রসিকতার মধ্য দিয়ে খাওয়াদাওয়া এগিয়ে নিয়ে চলল।······

"ওহে আদিত্য যা খেলাম, তাতে ভবিষ্যৎ খেলাম কিনা বলতে পারছি না।···কি হল তোমাদের? অনুরাধা দেবী ইলা দেবীকে এবার তাড়াতাড়ি সারতে বলুন। আমরা আর ওঁর দিকে তাকাচ্ছি না।"

"আপনি কিন্তু বেহায়া।" হাসতে হাসতে বলল ইলা।

"কি করি বলুন। যেভাবে বৃষ্টিটা চেপে এসেছে তাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরাই সমীচীন।"

"এই বৃষ্টি মাথায় করেই কি যেতে চান?"

"আপনার মতবলটা কি? এমন সুন্দর রাত ওদের এখানে থেকে মাটি করবেন নাকি?"

"এটা ভালগার—"

"কোনটা ভালগার আর কোনটা না তা আমি বিলক্ষণ বুঝি। তবে বুঝলেন কিনা—হার্ট, এই বুড়ো বয়সেও হার্ট", বাঁ হাত দিয়ে নিজের বুক চেপে ধরে বলল, "এই হার্টটা শুকিয়ে যায়নি।"

"আপনি বুড়ো হয়েছেন অমূল্যদা?"

"এঁ্যা—না না, অন্তত আজকে নয়। কি বল আদিত্য? ওঠ ওঠ ওঠ সব।" বলে অমূল্য আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ওরা একে একে কলঘর থেকে ঘুরে আসতে লাগল। সে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে ধরল।

"এ তো তোমার ব্রেণ্ড নয়।" একজন বলল।

"না। আজ অন্তত একটু ভাল ব্রেণ্ড খাও।"

"বটেই তো। একি আর যে-সে দিন! এ হল তিন শ' পঁয়ষট্টি দিনের এক বিশেষ দিন। দাও দেখি একটা।"

অমূল্য একটা বিরাট প্যাকেট অনুরাধার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ধরুন এটা। আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।" তারপর আদিত্যর কাছে এসে ঘনিষ্ঠভাবে খুব নীচু গলায় বলল, "ওরা অনেকে ইয়ার্কি করে ই-য়ে দিতে চেয়েছিল কিছু। আমি বারণ করলাম। এখন আর কি ওর কিছু দরকার আছে!" বলে সে অশ্লীলভাবে হাসতে লাগল।

ওদিকে কি কথায় সকলে উচ্চকণ্ঠে হাসতে লাগল।

"খুব তো কথা হচ্ছে; এদিকে রাত যে অনেক হল!" বলল একজন।

"যাব কি করে? বাইরে যে অঝোরে ঝরছে!" ইলা বলল।

"এ বৃষ্টি তাড়াতাড়ি কমবার নয়। তবু এখন একটু কম কম বলে মনে হচ্ছে।"

"না না বেরিয়ে পড়া যাক।" অমূল্য বলল।

"জলে তো আর পড়নি।" সে বলল।

"ভদ্রতা করছ, কর। আমাদেরও তো ভদ্রতা দেখাতে হবে। চল সব চল। এ বৃষ্টিতে এমন কিছু হবে না। গায়ে লাগালে বরং ভাল লাগবে।"

ওরা একে একে কল কল করতে করতে বেরিয়ে গেল। ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখল। তার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে মনে বলে উঠল: দায় শেষ হল! বৃষ্টির ছাট অল্প অল্প ওদের গায়ে এসে পড়ছিল। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার বোন এল না?"

"না। ওর কাজ আছে। কাল আসবে।"

"খুব আনন্দ হল, না?"

অনুরাধা কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

বড় ক্লান্তি লাগছিল তার। কেমন একটা অবসাদ সমস্ত শরীরটাকে জড়িয়ে ধরেছে। ইজিচেয়ারে শুয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল। টানতে একটু হাঁপ মত লাগছিল। আর একবার স্নান করবে কিনা ভাবল। যদিও এখন আর কোন গরম বোধ হচ্ছিল না। পাখার হাওয়া বড় মোলায়েম লাগছে। সন্ধ্যার ঘাম এই গায়ে শুকিয়েছে ভেবে খারাপ লাগল। অনুরাধা বাইরের কি সব কাজ গুছোচ্ছে। ছেঁড়া ছেঁড়া অনেক ভাবনার মধ্যে অনুরাধার ভাবনা ঘুরে ঘুরে এসে জট পাকাচ্ছে। —অনুরাধার অন্তত আজ তাড়াতাড়ি আসা উচিত।

"তুমি আর ওই সিগারেট খেও না।" অনুরাধা ঘরে ঢুকে বলল, "এতদিনের নেশা তো আর ছাড়তে পারবে না; বলছিও না।"

"এটা ছাড়া আমার নেশা হয় না।"

"তুমি দেখ চেষ্টা করে। ওই সিগারেটের বিচ্ছিরী গন্ধ সহ্য করতে পারি না।"

"বাইরের কাজ মিটেছে ?"

"হ্যাঁ। ওরা খেয়ে দেয়ে গুছিয়ে রাখছে।"

"তা হলে দরজাটা বন্ধ করে দাও।"

অনুরাধা হাসল। ওর হাসিটা উজ্জ্বল আলোয় কেমন যেন ম্লান—ব্যথিত মনে হল। সে বুঝতে পারল না, কেন। হয়তো এমনি। জীবনের এতদূর এসে ও উজ্জ্বল ভাবে হাসতে ভুলে গেছে। "তুমি ইচ্ছা করলে পরে দরজা বন্ধ করতে পার।"

অনুরাধা তেমনি হাসতে হাসতে দরজার হুকটা তুলে দিল।

"আচ্ছা অনু, তুমি এতদিন বিয়ে করনি কেন ?"

"তুমি করনি বলে।"

সে হেসে ফেলল। বলল, "তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।"

"আজ এখন এই প্রশ্নের কোন অর্থ হয় ?"

"তা সত্যি।" বলে সে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

শুয়ে পড়ে সে বলল, "আর রাত করছ কেন। রাত অনেক হয়েছে।"

"আলো জ্বলবে ?"

"তোমার ইচ্ছা।"

অনুরাধা আলো নেভাল।

তার পাশে এসে অনুরাধা আস্তে আস্তে বলল, "তুমি এতদিন বিয়ে করনি কেন ?"

সহসা সে অনুরাধাকে সজোরে জড়িয়ে ধরে বলল, "তোমার জন্য, তোমার জন্য, তোমার—তোমার—"

রক্তের উচ্ছ্বাস অনিয়ন্ত্রিতভাবে শিরায় উপশিরায় আছড়ে পড়তে লাগল। ঢেউ-এর মত প্রবল বেগে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল—পড়তে লাগল। এক জোড়া অশক্ত ফুসফুসে অক্সিজেন বুঝি অনেক কমে গেছে। আস্তে আস্তে এক সময় শিরা উপশিরা শিথিল হয়ে এল। তার গাঢ় শ্বাস

নিতে নিতে মনে হল, সে যেন শূন্য নিরুচ্চার আকাশে ফসলশূন্য মাঠে রিক্তের মত দাঁড়িয়ে আছে। অনুরাধা নিষ্প্রাণ কাঠের মত শুয়ে আছে। একটা গভীর অবসাদ তাকে ক্রমে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ অনুরাধা উঠে বসল। তারপর বলল, "আমি আমি বাথরুম থেকে আসছি।" অনুরাধা খাট থেকে নেমে আলো জ্বালল। তারপর দরজা খুলে স্খলিত পায় বাইরে বেরিয়ে গেল।

সে কিছুক্ষণ পর বাথরুমে প্রবলভাবে জল ঢালার শব্দ শুনতে পেল। অনুরাধা স্নান করছে। সে নিশিপাওয়া মানুষের মত উঠে এসে জানালার শিক ধরে বাইরে—মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে তাকাল। এখনও বৃষ্টি পড়ছে। কয়েকটা মুরগী বুঝি কোঁকাচ্ছে! অনুরাধা এখনো স্নান কবছে। হয়তো সাবান মাখছে। থুতু ছেটাচ্ছে—ঘৃণা ভরে।

সে আকাশের দিকে তাকিয়ে, ঐ মেঘের জলের মধ্য দিয়ে অনন্ত তারা-ভরা আকাশের কাছে কি একটা কথা বলে পাঠাতে চাইল।